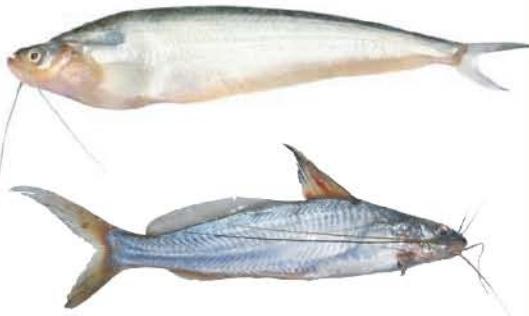


কৃষিশিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

কৃষিশিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণি

রচনা

প্রফেসর মুহাম্মদ আশুরাফ উজ্জামান
প্রফেসর মোহাম্মদ হোসেন ভূঞ্জা
প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ারুল হক বেগ
ড. কাজী আহসান হাবীব
আনোয়ারা খানম
খোল্দ, জুলফিকার হোসেন
এ. কে. এম. মিজানুর রহমান

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মোঃ সদরুল আমিন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : জুন, ২০১৬

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমৰ্থক

শাহীনুর বেগম

মোঃ দুলাল মির্শা ভূঁঝা

প্রচন্দ
সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

চিরাক্ষণ
স্নিফ শেখর চিন্তাপত্র

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

কম্পিউটার কম্পোজ
গ্রাফিক জোন

সরকারি কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অঙ্গনবিহীন মেধা ও সম্মাননার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিত্তির দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষান্বিত-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে তুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্জন-গোপন ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে স্বার প্রতি সমর্পণাদাবোধ জ্ঞানত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃকৃত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে ভর্তুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভাব বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে ভর্তুত দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের তুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচির কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মূলত কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর দেশ। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার, অধিক ফসল ফলানোর লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং কৃষি বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কৌশলের সাথে পরিচিত করার প্রয়াস নিয়ে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌগিক মূল্যায়ন ও ট্রাই আউট কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে জটিমুক্ত করা হয়েছে- যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দ পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	কৃষি প্রযুক্তি	১-৩৫
দ্বিতীয়	কৃষি উপকরণ	৩৬-৬৯
তৃতীয়	কৃষি ও জলবায়ু	৭০-৯৩
চতুর্থ	কৃষিজ উৎপাদন	৯৪-১৭৪
পঞ্চম	বনায়ন	১৭৫-২০১
ষষ্ঠ	কৃষি সমবায়	২০২-২০৯
সপ্তম	পারিবারিক খামার	২১০-২২৮

প্রথম অধ্যায়

কৃষি প্রযুক্তি

কৃষিকাজ এবং কৃষি প্রযুক্তি একে অপরের পরিপন্থক। মূলত যে প্রক্রিয়ায় কৃষি কাজ করা হয় তাই হচ্ছে কৃষি প্রযুক্তি। প্রতিটি কৃষিকাজের সাথে সুনির্দিষ্ট কৃষি প্রযুক্তির সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে কৃষি আর শুধু পারিবারিক খাদ্য সংস্থানের বিষয় নয়। এটা এখন ব্যবসায়িক পেশায় উন্নীত হয়েছে। আগে কৃষি বলতে জমি হাল-চাষ করে বীজ বুলে ঘরে ফসল তুলে বছরের খোরাক সংগ্রহ করাকেই বোঝাত। কিন্তু এখন কৃষির প্রতিটি কাজে প্রযুক্তি ব্যবহারের খরচাদি ও ফসলের বাজারমূল্যের মাপকাঠিতে আয়-ব্যয়ের হিসাবনিকাশ করে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষিকে মূল্যায়ন করা হয়। তাই এখন কৃষি সমস্যা যেমন জটিলতর হচ্ছে তেমনি কৃষি বিজ্ঞানীরাও উচ্চতর জ্ঞানসমৃদ্ধ কৃষি প্রযুক্তি উন্নোবন করছেন। পূর্বের শ্রেণিগুলোতে আমরা কৃষিকাজের নাম, সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির নাম, কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়াদি শিখেছি। নবম-দশম শ্রেণিতে আরও এক ধাপ এগিয়ে জমির প্রস্তুতি, উর্বরতা বৃক্ষ, ফসলভিত্তিক মাটির বৈশিষ্ট্য, ভূমিক্ষয়, ভূমিক্ষয়রোধ, বীজ সংরক্ষণ, রোগবালাই দমন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি সম্পর্কে জানব।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- মাটি ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করতে পারব।
- ধাপ উন্নোবনপূর্বক জমির প্রস্তুত পক্ষতি বর্ণনা করতে পারব।
- জমি প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- ভূমিক্ষয়, ভূমিক্ষয়ের কারণ ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব।

- ভূমিক্ষয়ের ক্ষতিকারক দিকগুলো বর্ণনা করতে পারব ।
- ভূমিক্ষয়ের কার্যকরী উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করতে পারব ।
- বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারব ।
- বীজ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- শস্যবীজ সংরক্ষণ করতে পারব ।
- মাছ ও পশুপাখির খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- মাছ ও পশুপাখির খাদ্য সংরক্ষণের ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারব ।
- সম্পূরক খাদ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- মাছের ও পশুপাখির সম্পূরক খাদ্য তালিকা তৈরি করতে পারব ।
- মাছ ও পশুপাখির সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব ।
- মাছ ও পশুপাখির দ্রুত বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারব ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফসল নির্বাচন

মাটি ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন

মাটি ফসল উৎপাদনের অন্যতম মাধ্যম । ফসল উৎপাদন মাটির বৈশিষ্ট্যের উপর পুরাপুরি নির্ভরশীল । মাটিই হচ্ছে পানি ও পুষ্টির প্রাকৃতিক উৎস । সব মাটিতে সব ফসল জন্মায় না । যেমন: ধানগাছ কাদা মাটি বা কাদা দোআঁশ মাটি পছন্দ করে । অপর দিকে বাদাম বেলে বা বেলে-দোআঁশ মাটি পছন্দ করে । তবে বাংলাদেশের মাটি গঙ্গা, ত্রিপুরা ও যেঘনার পলি দ্বারা সৃষ্টি হওয়ার কারণে সব ধরনের ফসলই কমবেশি জন্মায় । বাংলাদেশের অধিকাংশ মাটিই নরম, হালকা, ধূলিময় ও কর্ষণযোগ্য । মাটি বলতে তাকেই বোবায় যেখানে ফসল জন্মায়, বল সৃষ্টি হয় আর গবাদিপত্র বিচরণ করে । একজন কৃষককে যখন মাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি কটপট বলে থাকেন যে ভূ-ভূকের গভীরে যতটুকু লাঙলের ফলা পৌছে, তাই মাটি যা ফসল উৎপাদনের উপযোগী । অর্থাৎ কৃষকের ভাষায় ভূ-পৃষ্ঠের ১৫-১৮ সেমি. গভীর স্তরকে মাটি বলা হয় । অতএব, ফসল উপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য এ স্তরেই নিহিত ।

আগেই বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের মাটিতে অল্প বিস্তর সব ফসলই জন্মে । কিন্তু সব অঞ্চলের মাটির বৈশিষ্ট্য একরূপ নয় । তাই দেখা যায়, কোথাও ধান, কোথাও গম, কোথাও আলু আবার কোথাও পাট ভালো হয় । নিচে বিভিন্ন ফসল উপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো ।

ধান চাষেৰ উপযোগী মাটিৰ বৈশিষ্ট্য	গম চাষেৰ উপযোগী মাটিৰ বৈশিষ্ট্য
<p>১) কংকর ও বেলেমাটি ছাড়া সব মাটিই ধান চাষেৰ উপযোগী। এঁটেল ও এঁটেল দোআঁশ মাটি ধান চাষেৰ জন্য খুব ভালো। নদ-নদীৰ অববাহিকা ও হাওৰ-বাঁওড় এলাকা যেখানে পলি জমে সেখানেও ধান ভালো হয়।</p> <p>২) প্রকারভেদে উচু, মাঝারি, নিচু সব ধরনেৰ জমিতেই ধানেৰ চাষ কৰা যায়। যেহেন, নিচু জমিতে বোৱো ও জলি আমল চাষ কৰা হয়।</p> <p>৩) মাটিৰ অস্ত্রাঞ্চল থেকে নিৰপেক্ষ অবস্থা ধান চাষেৰ অনুকূল।</p> <p>৪) মাটিতে জৈব পদাৰ্থ কম হলে কমপোস্ট ব্যবহাৰ কৰে এৰ মাজা বাড়ানো যায়।</p> <p>৫) মাটিৰ নাইট্রোজেন, ফসফৱাস, পটাশ, জিঙ, সালফাৰ ইত্যাদিৰ মাজা নিৰ্ধাৰণ কৰে প্ৰয়োজনীয় সার ব্যবহাৰ কৰে মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰা যায়।</p>	<p>১) উচু ও মাঝারি উচু জমি গম চাষেৰ জন্য উপযোগী। মাঝারি নিচু জমিতেও গম চাষ কৰা হয়।</p> <p>২) দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি গম চাষেৰ জন্য ভালো। এঁটেল - দোআঁশ মাটিতেও গমেৰ চাষ হয়।</p> <p>৩) বাংলাদেশেৰ উত্তৰাঞ্চলেৰ জেলাগুলোতে গমেৰ চাষ ভালো হয়। এছাড়া ঢাকা, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, ফরিদপুরেও গমেৰ আবাদ হয়।</p> <p>৪) বাংলাদেশেৰ সব কৃষি অঞ্চলে গমেৰ চাষ হয় না। বিশেষ কৰে হাওৰ - বাঁওড় ও বিল অঞ্চলে গমেৰ আবাদ কৰা হয় না।</p> <p>৫) যে মাটিতে P^H (অস্ত্রাঞ্চক-স্কারতাক)। মাজা ৬.০ থেকে ৭.০ সেসব মাটিতে গম ভালো হয়।</p>
পাট চাষেৰ উপযোগী মাটিৰ বৈশিষ্ট্য	ডাল চাষেৰ উপযোগী মাটিৰ বৈশিষ্ট্য
<p>১) ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ঘৰুনা, যেখনা প্ৰত্যুতি নদ-নদীৰ পলিবাহিত উৰ্বৰ সমতল ভূমিতে পাট ভালো জন্মে।</p> <p>২) নদীবাহিত গভীৰ পলিমাটি পাট চাষেৰ জন্য বিশেষ উপযোগী।</p> <p>৩) দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতেও পাট ভালো জন্মে।</p>	<p>১) উচু ও মাঝারি জমিতে দোআঁশ, বেলে দোআঁশ, এঁটেল দোআঁশ এবং পলি দোআঁশ মাটিতে ডাল জাতীয় ফসল জন্মে। ডাল ফসল অতিৰিক্ত পানি সহ্য কৰতে পাৰেনা। তাই নিষ্কাশনযোগ্য মাটিই ডাল চাষেৰ জন্য উপযোগী।</p> <p>২) ডাল নিৰপেক্ষ বা ক্ষাৰীয় চুনযুক্ত মাটিতে ভালো হয়।</p> <p>৩) শক ও ঠাণ্ডা আবহণয়া এবং অল্প বৃষ্টিপাত ডাল ফসল চাষেৰ জন্য উপযোগী। যদি একপ আবহণয়া ও বৃষ্টিপাত থাকে তবে বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ প্ৰকৃতিৰ মাটিতে অবশ্যই ডাল ফসল ভালো ফলন দিবে।</p> <p>৪) বিনা চাষে ডাল ফসল আবাদেৰ জন্য নিচু ও মাঝারি জমি নিৰ্বাচন কৰতে হবে। জমি থেকে বৰ্ধাৰ পানি নেমে গেলে ভেজা মাটিতে ডাল ফসলেৰ বীজ বোনা হয়।</p>

কাঞ্জ : শিক্ষার্থীৰা মাটি উপযোগী ফসলগুলোৰ তালিকা তৈরি কৰবে এবং শ্ৰেণিতে উপস্থাপন কৰবে।

সবজিজাতীয় ফসলের মাটির বৈশিষ্ট্য

সবধরনের শাকসবজিই উচ্চ, সুনিষ্কাশিত দোআশ, বেলে দোআশ, পলি দোআশ মাটিতে ভালো জন্মে। নিচে আলু ও টমেটো চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো।

গোল আলু চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য	টমেটো চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য
১) দোআশ ও বেলে দোআশ মাটি আলু উৎপাদনের জন্য বেশ উপযোগী।	১) যে কোনো প্রকার মাটিতে টমেটোর চাষ করা যায়। তবে বেলে ও কংকরময় মাটিতে টমেটো চাষ করা যায় না।
২) আলুর জন্য বায়ু চলাচল করতে পারে একপ নরম ও ঝুরঝুরে মাটি দরকার। এতে আলু বড় হওয়ার সুযোগ পায়।	২) দোআশ ও বেলে দোআশ মাটি টমেটো চাষের উপযোগী।
৩) গোল আলুর মাটিতে প্রচুর জৈব পদার্থ থাকা দরকার।	৩) বেলে মাটিতে অধিক পরিমাণে জৈবসার প্রয়োগ করলে টমেটোর চাষ মোটামুটি করা যায়।
৪) মাটির P^H মাত্রা ৬-৭ এর মধ্যে থাকা ভালো।	৪) মাটির P^H মাত্রা নিরপেক্ষ মাত্রার কাছাকাছি হলে ভালো হয়।

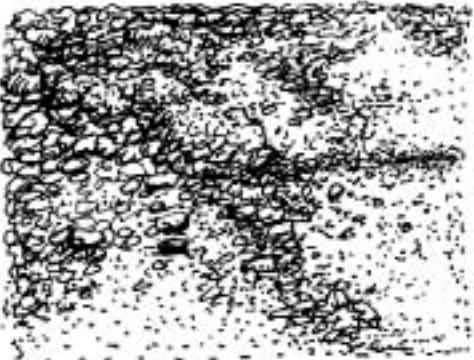
কাজ : শিক্ষার্থীরা সঙ্গতভাবে কোন ধরনের মাটিতে কোন ধরনের ফসল ভালো হয় তার একটি তালিকা তৈরি করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

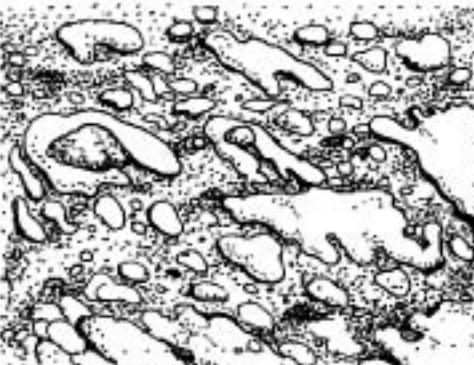
মৃত্তিকান্তিক পরিবেশ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন

আগের পাঠগুলোতে আমরা ফসলের শ্রেণি অনুযায়ী মাটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে শিখেছি। এই পাঠে আমরা মাটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করতে শিখব। মাটির বৈশিষ্ট্য বলতে মাটির শ্রেণি, জৈব পদার্থের মাত্রা, পটাশজাত খনিজের মাত্রা, P^H মাত্রা এবং মাটির বক্সুরতাকে বোঝায়। আমরা নিচয় জেনেছি যে মাটির প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশকে ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। কোনো একটি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে সে অঞ্চলের মাটির প্রতিনিধিত্ব করে। এক একটি কৃষি অঞ্চল এক একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে। কৃষি কর্মকাণ্ডের জন্য সবচেয়ে বড় কাজ হলো মাটির বৈশিষ্ট্য ও বক্সুরতা অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করা। মাটির বৈশিষ্ট্যভিত্তিক ফসল নির্বাচন কৃষি কর্মের একটি অত্যাবশ্যক প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি যত নির্ভুতভাবে ব্যবহার করা যাবে কৃষিকাজের ফলাফলও তত বেশি সান্ত্বনক হবে। মাটির গঠন ও প্রকৃতি অনুযায়ী ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলকে নিম্নোক্ত ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। এই অঞ্চলগুলোর মাটির বৈশিষ্ট্যভিত্তিক ফসল নির্বাচন দেখানো হলো।

- ১। দোআশ ও পলি দোআশ মাটি অঞ্চল
- ২। কাদা মাটি অঞ্চল
- ৩। বায়েন্স অঞ্চল ও মধুপুর অঞ্চল
- ৪। পাহাড়ি ও পাদভূমি অঞ্চল
- ৫। উপকূলীয় অঞ্চল

বৃষ্টিকা ভিত্তিক অঞ্চল	চাষ উপরোগী ফসল
<p>দোআশ ও পলি দোআশ মাটি অঞ্চল:</p> <p>এ অঞ্চলের ভূমির মাটি দোআশ থেকে পলি দোআশ প্রকৃতির। উচ্চ ভূমি থেকে মাঝারি নিচু ভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। দোআশ অঞ্চলের মাটিতে জৈব পদার্থের মাত্রা অল্প থেকে মাঝারি। এর P^H মাত্রা ৫.২ হতে ৬.২ পর্যন্ত। পলি দোআশ অঞ্চলের মাটিতে জৈব পদার্থের মাত্রা খুবই সামান্য। P^H মাত্রা ৪.৯ হতে ৬.১ পর্যন্ত।</p>	<p>দোআশ মাটিতে প্রায় সব রকমের ফসল ফলে। দোআশ ফসল উৎপাদনের আদর্শ মাটি। বৃষ্টির উপর নির্ভর করে কৃষকেরা ফসল উৎপাদন করেন। আবার সেচের উপর নির্ভর করেও কৃষকেরা ফসল উৎপাদন করেন। নিচে বৃষ্টি ও সেচ নির্ভর ফসলের নাম উল্লেখ করা হলো।</p> <p>বৃষ্টিনির্ভর ফসল নির্বাচন</p> <p>রবি মৌসুম : গম, মূলা, টমেটো, ফুলকপি, বাধাকপি, টেক্স, মরিচ, চিনা বাদাম ইত্যাদি</p> <p>খরিপ-১ : রোপা আউশ, বোনা আমন, পটি (সাদা), কাউন, বেঙ্গল, তিল, মুগ, বোনা আউশ, ভুট্টা, ধৈঘা ইত্যাদি</p> <p>খরিপ-২ : রোপা আমন (হ্রানীয় উল্লত জাত ও উফশী)</p> <p>সেচনির্ভর ফসল নির্বাচন</p> <p>রবি মৌসুম : বোরো, আখ, আখ+আলু, আখ+মুগ, পিংয়াজ, রসূন, গম, আলু, মুগ, সরিয়া ইত্যাদি</p> <p>খরিপ-১ : রোপা আউশ, পটি (তোষা), তিল, ভুট্টা</p> <p>খরিপ-২ : রোপা আমন (হ্রানীয় উল্লত জাত ও উফশী)</p>
<p>কাদা মাটি অঞ্চল</p> <p>মাঝারি উচ্চ ও মাঝারি নিচু এলাকার মাটি কর্দম বিশিষ্ট। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পলি কাদা বিশিষ্ট মাটি ও লক্ষ করা যায়। এই মাটিতে মাঝারি মাঝারি জৈব পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে উচ্চমাঝারি জৈব পদার্থও আছে। পটাশজাত ব্যনিজের মাত্রা মাঝারি।</p>	<p>মাঝারি নিচু ও নিচু অঞ্চলসমূহে কাদা মাটি বেশি দেখা যায়। কাদা মাটিতে ধানের উৎপাদন ভালো হয়। নিম্নে বৃষ্টিনির্ভর ও সেচ নির্ভর ফসলের নাম উল্লেখ করা হলো।</p> <p>বৃষ্টিনির্ভর বা সেচনির্ভর উভয় ক্ষেত্রেই এই অঞ্চলের ফসল প্রধানত ধান। রবি মৌসুমে সেচের ব্যবস্থা ধাকলে কিছু পরিমাণ অন্যান্য ফসলও জন্মে।</p>

বরেন্দ্র ও মধুপুর অঞ্চল	চায় উপযোগী ফসল
<p>উচু এবং মাঝারি উচু ভূমি বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মধুপুর অঞ্চল সমতল ও উচু ভূমি বিশিষ্ট। এর মাটি দোআশ। মাটিতে নিম্নমাত্রার জৈব পদার্থ ও পটাশজাত খনিজ পদার্থ রয়েছে। এর P^H মাত্রা ৫.৫-৬.৫।</p>  <p style="text-align: center;">চিত্র : দোআশ মাটি</p>	<p>এই অঞ্চলের মাটি দোআশ হওয়ার কারণে ঠিকমতো সেচ পেলে নানাবিধ ফসল উৎপন্ন করা যায়। নিচে বৃষ্টি ও সেচ নির্ভর ফসলের নামের তালিকা দেওয়া হলো।</p> <p>বৃষ্টি নির্ভর ফসল নির্বাচন</p> <p>রবি মৌসুম : বোরো, আখ, আলু, সরিষা, মসুর, ছোলা, বার্জিও শীতকালীন শাকসবজি।</p> <p>খরিপ-১ : বোনা আউশ, পাট, কাউন, শীতকালীন শাকসবজি</p> <p>খরিপ-২ : রোপা আমল (হানীয় উন্নত ও উফশী)।</p> <p>সেচ নির্ভর ফসল নির্বাচন</p> <p>রবি মৌসুম : আখ, আখ+আলু, গম, সরিষা, চিনাবাদাম, মসুর, টমেটো, বাঁধাকপি, ছোলা, শীতকালীন শাকসবজি।</p> <p>খরিপ-১ : রোপা আউশ, পাট, মুগ, চেড়স</p> <p>খরিপ-২ : রোপা আমল (হানীয় উন্নত ও উফশী)।</p>
<p>পাহাড়ি ও পাদভূমি অঞ্চল</p> <p>এ অঞ্চলের ৯০ শতাংশের বেশি ভূমি উচু। খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙামাটি, করুবাজার ও আখাউড়া এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই মাটি দোআশ। জৈব পদার্থ ও পটাশজাত খনিজের মাত্রা সামান্য। এখানকার মাটির P^H মাত্রা ৫-৫.৭।</p>	<p>পাহাড়ি ও পাদভূমি অঞ্চলের মাটি দোআশ হওয়াতে পাহাড়ি অঞ্চলেও নানাবিধ ফসল উৎপাদন হয়। নিচে এই মাটিতে উপযোগী বৃষ্টি নির্ভর ও সেচ নির্ভর ফসলের তালিকা দেওয়া হলো।</p> <p>বৃষ্টিনির্ভর ফসল নির্বাচন</p> <p>রবি মৌসুম : আখ, সরিষা, মসুর, ছোলা, গম ইত্যাদি</p> <p>খরিপ-১ : বোনা আউশ, পাট, বোনা আমল</p> <p>খরিপ-২ : রোপা আমল</p> <p>সেচনির্ভর ফসল নির্বাচন</p> <p>রবি মৌসুম : আখ, আখ+আলু, আখ+মসুর, বোরো, গম, সরিষা ইত্যাদি</p> <p>খরিপ-১ : ধৈঢ়া, বোনা আউশ, রোপা আউশ</p> <p>খরিপ-২ : রোপা আমল (হানীয় উন্নত ও উফশী)</p>

মুক্তিকা ভিত্তিক অঞ্চল	চাষ উপযোগী ফসল
<p>উপকূলীয় অঞ্চল</p> <p>সেটুমার্টিন ধীপ, চট্টগ্রাম, ফেনী, সোয়াখালী, বরিশাল ও ভোলাসহ বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে মাঝারি উচু ভূমির আধিক্য বেশি। এর মাটি দোআশ এবং বেলে ও পলি দোআশ প্রকৃতির। জৈব পদার্থ ও পটাশজাত খনিজের মাত্রা অল্প। এই অঞ্চলের মাটির P^H মাত্রা ৭.০ - ৮.৫।</p>  <p>চিত্র : পলিমাটি</p>	<p>যেহেতু এখানকার মাটি দোআশ, বেলে ও পলি দোআশ তাই বিভিন্ন প্রকার কৃষিপণ্য এই অঞ্চলে উৎপাদন হয়। নিচে এই অঞ্চলে মৃত্তিনির্ভর ও সেচনির্ভর ফসলের নাম উল্লেখ করা হলো।</p> <p>মৃত্তিনির্ভর ফসল নির্বাচন</p> <p>রবি মৌসুম : গম, সরিয়া, মুগ, মরিচ, পিয়াজ, রসুন, মুলা, বেগুন, শিম, টমেটো, চিনাবাদাম, ভূট্টা ইত্যাদি</p> <p>খরিপ-১ : বোনা আউশ, রোপা আউশ, পাট, কাঁকড়োল ইত্যাদি</p> <p>খরিপ-২ : রোপা আমন (ভানীয় উন্নত ও উফশী)</p> <p>সেচ নির্ভর ফসল নির্বাচন</p> <p>রবি মৌসুম : বোরো, টমেটো, আলু, সরিয়া, তরমুজ, মুগ, মরিচ ইত্যাদি।</p> <p>খরিপ-১ : রোপা আউশ</p> <p>খরিপ-২ : রোপা আমন (ভানীয় উন্নত ও উফশী)</p>

কাজ : শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ গ্রাম/উপজেলা কোন পরিবেশ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত তা শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নেবে। অতঃপর গ্রামের মাটির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে মাটির প্রকার উল্লেখ করে এ সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখে জমা দিবে।

বিভীয় পরিচেদ

ফসল উৎপাদনের জন্য জমি প্রস্তুতি

কৃষির যত কাজ আছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো জমি প্রস্তুতি। সব ফসলের জন্য জমি প্রস্তুতি এক রকম নয়। যেমন বোরো বা রোপা আমন ধানের ক্ষেত্রে আগে চারা উৎপাদন করতে হবে, তারপর মূল জমি প্রস্তুত করে চারা রোপণ করতে হবে। কিন্তু বোনা আউশ বা বোনা আমনের ক্ষেত্রে চারা উৎপাদন না করে সরাসরি প্রস্তুতকৃত মূল জমিতে বীজ ছিটিয়ে দিতে হয়। প্রায় একইরূপ গমের ক্ষেত্রেও ভালোভাবে জমি চাষ দিয়ে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হবে। জমি প্রস্তুতির সাথে বহুমুখী কাজ জড়িত। যথা জমি চাষ, মই দেওয়া, সার প্রয়োগ ইত্যাদি। নিচে ফসলভিত্তিক প্রত্যেকটি কাজ আলোচনা করা হলো।

ধান চাষের জন্য জমির প্রস্তুতি

ধান বাংলাদেশে সারা বছর চাষ করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বীজতলায় চারা উৎপাদন করতে হয়। ধানের বীজতলা তৈরি ও জমি প্রস্তুতি ৪ৰ্থ অধ্যায় এর ১ম পরিচেদ থেকে আমরা জানতে পারব।

গম চাষের জন্য জমি প্রস্তুতকরণ

গম রবি শস্য। বর্ষার মৌসুম শেষ হওয়ার পর মধ্য কার্তিক-মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত গম চাষের উপযুক্ত সময়। মাটির 'জো' দেখে জমিতে লাঙল চালনা করা হয়। গমের মাটি ঝুরবরা করে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এজন্য ৩ থেকে ৪ বার আড়াআড়ি জমি চাষ দিয়ে বার কয়েক মই দিয়ে মাটি ঝুরবুরা হয়। জমিতে যাতে কোনো বড় ঢেলা না থাকে সেনিকে লক্ষ রাখতে হবে। গমের জন্য দোআশ বা বেলে দোআশ মাটি উপযুক্ত। এ মাটি সহজেই ঝুরবুরা হয়। পাওয়ার টিলারের সাথে রটোন্টের সহযোগ করে জমি চাষ দিলে মাটি ভালো চাষ হয় এবং একই সাথে মইও দেওয়া হয়। ঝুরবুরা মাটি গমের অঙ্কুরোদগমের জন্য খুবই উপযোগী। অষ্টম শ্রেণিতে আমরা গম চাষে সার প্রয়োগ সম্পর্কে জেনেছি।

ডালজাতীয় শস্যের জন্য জমি প্রস্তুতি

বাংলাদেশে ডালজাতীয় শস্যের জন্য জমি চাষ করা হয় না। তবে অসুর ডালের জন্য জমিতে দুইএকটি চাষ দেওয়া হয়। বর্ষা শেষ হলে আশ্বিন-কার্তিকে যথন নদীর তর ও নিচু এলাকা হতে পানি সরে যায় তখন নরম পলি মাটিতে বিনা চাষে বীজ বপন করা হয়। চাষ দেওয়া সম্ভব হলে দুইএকটি চাষও দেওয়া হয়। চাষের পর পতিত জমিতে আবার অনেক সময় রোপা ও বোনা আমনের জমিতে ফসল ধাকা অবস্থায় ডালের বীজ ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

আলু চাষের জন্য জমি প্রস্তুতি

নিচু এলাকায় বর্ষার পানি নেমে গেলে বা উচু এলাকায় আশ্বিন মাস হতে আলু চাষের জন্য জমি প্রস্তুতির কাজ শুরু করা হয়। সাধারণত দোআশ ও বেলে দোআশ মাটিতে আলুর চাষ করা হয়। এই মাটি চাষ করা মোটামুটি সহজ। আলুর জমি ৫-৬ বার চাষ ও বার কয়েক মই দিয়ে মাটি ঝুরবুরা করে জমি প্রস্তুত করা হয়। আজকাল পাওয়ার টিলার দ্বারা চাষ করা হয় বলে ৩-৪ বার আড়াআড়ি চাষ দিলেই ঝুরবুরা হয় এবং সমান করা হয়।

নালা তৈরি ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি

জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দেওয়ার পর জমি সমান করে বীজ বপনের জন্য জমির এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত নালা করতে হবে। প্রত্যেকটি নালা প্রায় ১০-১২ সেমি. গভীর করতে হবে। একটি নালা থেকে আর একটি নালার দূরত্ব হবে ৬০ সেমি। অতঃপর নালার মধ্যে ১৫ সেমি. দূরে দূরে বীজ বুলে দিতে হয়। আলুচাষে সার প্রয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জমি প্রস্তুতির ক্রুতি

ভূমি কর্ষণ জমি প্রস্তুতির প্রথম ধাপ। ভূমি কর্ষণের সংকীর্ণ অর্থ হলো ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে জমির মাটি যান্ত্রের সাহায্যে খুঁড়ে আলগা করা। কিন্তু ভূমি কর্ষণের সাথে নামা প্রযুক্তি জড়িত। যেমন, বীজকে অঙ্কুরোদগমের জন্য উপযুক্ত স্থানে ও সঠিক গভীরতায় স্থাপন করা, মাটিতে বায়ু চলাচলের সুবিধা সৃষ্টি করা, উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে নিয়ে আসা, মাটিতে অণুজীবের কর্মক্ষমতা বৃক্ষি করা ইত্যাদি। এসব নিক বিবেচনা করে জমি প্রস্তুতির ক্রুতি উপলক্ষ্য করা যায়। আর এই ক্রুতি অনুধাবনের জন্য ভূমি কর্ষণকে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে “শস্যের বীজ মাটিতে সুস্থুভাবে বপন ও পরিবর্তী পর্যায়ে চারাগাছ বৃক্ষির জন্য মাটিকে যে প্রক্রিয়ায় খুঁড়ে বা আঁচড়ে আগাছামুক্ত, নরম, আলগা ও ঝুরঝুরা করা হয় তাকে ভূমিকর্ষণ বলে”। ভূমি কর্ষণ জমি প্রস্তুতির প্রাথমিক ধাপ। আদিকাল থেকেই মানুষ ভূমি কর্ষণ তথা জমি প্রস্তুতির ক্রুতি উপলক্ষ্য করতে পেরেছেন। তাই তারা কাঠের বা পাথরের তৈরি সুচালো যান্ত্রের সাহায্যে মাটি আলগা ও নরম করে ফসলের বীজ বুনতে বা চারা রোপণ করতেন। ফসলভেদে ভূমি কর্ষণের তারতম্য হতে পারে কিন্তু এর ক্রুতি কখনো খাটো করে দেখার বিষয় নয়।

জমি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ঘনার বচনে উল্লেখ আছে যে,

যোল চাষে মূলা

তার অর্ধেকে তুলা

তার অর্ধেকে ধান

বিনা চাষে পান

কাজ : শিক্ষার্থীরা মাঝে মাঝে ফসলের মাঠ পরিদর্শন করবে। কৃষকেরা গম চাষের জমি তৈরি করছেন তা দেখবে এবং জমি প্রস্তুতির কর্মকাণ্ডগুলো আভায় লিখবে। এভাবে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ফসলের বিভিন্ন রকমের জমি প্রস্তুতির নিয়ম খুঁজে বের করে লিখবে।

অর্ধাং মূলা চাষের জন্য যোলটি চাষ দিতে হবে যতক্ষণ না মাটি ঝুরঝুরা বা আলগা হয়। তুলা চাষের জন্য আট চাষ দিতে হবে আর ধানের জন্য চারটি চাষই যথেষ্ট। মজার ব্যাপার হলো পান উৎপাদনে কোনো চাষই লাগেনা। আর এই ধারণা থেকেই আজকাল বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে ‘বিনা চাষ’ প্রথা প্রচলন করা হয়েছে। এখন অনেক কৃষকই বিনা চাষে ভূট্টা, ডাল ইত্যাদি ফসল উৎপাদন করেন।

ভূমি কর্মণ তথা জমি প্রস্তুতকরণের উদ্দেশ্য

ভূমি কর্মণের উদ্দেশ্য থেকেই জমি প্রস্তুতকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। নিচে ভূমি কর্মণের উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হলো:

- ১। মাটি বীজের অঙ্কুরোদগম অবস্থায় আনয়ন :** যে প্রক্রিয়ায় মাটিকে ঝুরঝুরা করে বীজের অঙ্কুরোদগমের অবস্থায় আনা ও ফসল জন্মানোর উপযোগী করা হয় তাকে কর্মণ বলে। জমিতে বারবার চাষ দেওয়ার ফলে মাটি নরম হয়, দানাগুলো মিহি হয় আর তাতে বীজ গজানো ও ফসল জন্মানোর এক ভৌত অবস্থা সৃষ্টি হয়। জমি কীভাবে কভটুকু প্রস্তুত করা হবে তা নির্ভর করে মাটির প্রকারভেদ, মাটির জৈব পদার্থ ও রস এবং ফসলের প্রকারের উপর। দোআশ, বেলে বা বেলে দোআশ মাটির মধ্যে হালকা মাটিতে $3/4$ বার চাষ ও মই দিলে ভূমি কর্মণ ফসল উৎপাদন উপযোগী হয়। কিন্তু কাদামাটির মধ্যে ভারী মাটিতে $5/6$ বার চাষের প্রয়োজন পড়ে। মাটিতে রস থাকলে চাষের সময় মাটি সহজেই ঝুরঝুরা হয় আর রস না থাকলে বড় বড় ঢেলা হয়। মাটিতে জৈব পদার্থ থাকলে মাটির কণা দানাদার হয় ও সংযুক্ত থাকে। আর তাতে বীজের অবস্থান ভালো থাকে এবং সহজেই অঙ্কুরোদগম হয়।
- ২। মাটি সার ও জৈব পদার্থের মিশ্রণকরণ :** জমিতে সার দিতে হয় এবং জৈব পদার্থ প্রয়োগ করতে হয়। ভূমি কর্মণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মাটির সাথে সার ও জৈব পদার্থের মিশ্রণ ঘটানো। এ জন্যে জমি দুই একবার চাষ দেওয়া হলে গোবর বা কমপোস্ট জমিতে ছিটাতে হয়। পরবর্তী চাষের সময় এগুলো মাটিতে মিশে যায়। অনেক সময় ধৈঃঝার চাষ করেও সবুজ সার হিসাবে ফুল আসার আগে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মেশানো হয়। তাতে মাটির উর্বরতা বাঢ়ে।
- ৩। ভূ-অভ্যন্তরীকৃত-পতঙ্গ দমন :** মাটির অভ্যন্তরে অনেক পোকা আছে যেগুলো ফসলের অনেক ক্ষতি করে। ভূমি কর্মণের সময় এসব পোকা, পুতলি ও ডিম উন্মুক্ত হয় এবং পাখিরা এগুলো থেঁয়ে নিধন করে। আর সূর্যালোকও সেগুলো ধ্বংস করে। মাটির নিচের পোকাগুলোর মধ্যে উই, উচুচু ও পিপালিকা প্রধান।
- ৪। মাটির পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ :** ভূমি কর্মণ মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বাঢ়ায়। অকর্ষিত ভূমি থেকে পানি তাঢ়াতাঢ়ি বাস্প হয়ে যায় অথবা পানি গড়িয়ে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু কর্ষিত জমিতে সার বা সেচের পানি আটকা পড়ে যা পরে মাটি তখে নেয়। অর্থাৎ কর্ষিত জমির মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। এছাপে মাটিতে বীজ বুনলে ভালো অঙ্কুরোদগম হয় এবং ফসলের বৃক্ষ ঘটে।
- ৫। মাটিতে জীবাণুসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি :** মাটিতে অনেক জীবাণু আছে যা মাটিকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে তন্মধ্যে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া প্রধান। এসব জীবাণু মাটিতে থেকে মাটির জৈব পদার্থ পচানে সাহায্য করে। ভালোভাবে ভূমি কর্মণ করলে মাটিতে এই জীবাণুগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। গাছ সহজে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে এবং ফলন অনেক ভালো হয়।
- ৬। মাটির ক্ষয়রোধ :** ভূমি কর্মণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো উচু-নিচু জমিকে সমতল করা এবং আঁটসাট করা। তাতে বৃক্ষের বা সেচের পানি গড়িয়ে অন্যত্র যেতে পারে না। আর এতে একদিকে ভূমিক্ষয় নিরোধ হয় আর অন্যদিকে পানির সুরক্ষার হয়।

জমি চাষের বিবেচ্য বিষয়

জমি কীভাবে চাষ করতে হবে তা নির্ভর করে কতকগুলো বিষয়ের উপর। বিষয়গুলো হচ্ছে :

- ১। ফসলের প্রকার
- ২। মাটির প্রকার
- ৩। আবহাওয়া ও
- ৪। খামারের প্রকার ইত্যাদি।

- ১। **ফসলের প্রকার :** জমি চাষ কেমন হবে তা নির্ভর করে কৃষক কী কী ফসল ফলাবেন। যেমন ধান চাষের জন্য করেকৰার আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি কর্দমাঙ্গ করতে হয়। কিন্তু মূলা, মরিচ, ইত্যাদির জন্য মাটি যিহি ঝুরঝুরা করে চাষ করতে হয়। আখ ও আলু চাষের জন্য গভীরভাবে জমি চাষ করতে হয়।
- ২। **মাটির প্রকার :** জমি চাষ মাটির প্রকারের উপর নির্ভর করে। কানা মাটিতে বেশি অর্দ্ধতা বা তেজা থাকলে চাষ করা যায় না। মাটির “জো” আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। আবার হালকা মাটি যেমন দোআঁশ, পলি দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে অর্দ্ধতা একটু বেশি থাকলেও চাষ করা যায়। এই মাটিগুলো চাষের জন্য খুব ভালো।
- ৩। **আবহাওয়া :** আবহাওয়ার প্রভাবে মাটিতে অর্দ্ধতার ভারতম্য ঘটে। বৃষ্টি-বাদল কম হলে মাটিতে অর্দ্ধতার অভাব ঘটে। এই অবস্থায় জমিতে গভীর চাষ দেওয়া অনুচিত। মাটিতে গভীর চাষ দিলে অর্দ্ধতার অভাব দেখা দিবে। আবার বর্ষাকালে যখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তখন মাটিতে প্রচুর অর্দ্ধতা থাকে এবং রোপা আমন চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করা সহজ হয়।
- ৪। **খামারের প্রকার :** বাড়ির আশে পাশের জমিতে নিবিড় শস্য চাষ করা হয়। নিবিড় শস্য চাষে একটা ফসল তুলেই আর একটা ফসল লাগানো হয়। তখন জমিতে গভীর চাষের দরকার পড়ে না। জমির মাটি এমনিতেই আলগা থাকে। তবে অনিবিড় শস্য চাষে জমিতে গভীর চাষের দরকার পড়ে।

তৃতীয় পরিচেদ

ভূমিক্ষয় ও ক্ষয়রোধ

ভূমিক্ষয়

মুহূর্লধারায় বৃষ্টির সময় মাটির দিকে লক্ষ কর। দেখবে বড় বড় বৃষ্টির ফোটা যখন ভূগতিত হয়, তখন বৃষ্টির আঘাতে ছেট ছেট গর্জের সৃষ্টি হয় আর এতে পানি ঘোলা হয়। কাদামিশ্রিত ঘোলা পানি অপেক্ষাকৃত নিচের দিকে ধাবিত হয়। এভাবে বৃষ্টিপাতের সময় কাদামিশ্রিত ঘোলা পানির মাধ্যমে ভূমিক্ষয় হয়। আবার বাড়-বাতাস বা ঘূর্ণিকড়ের দিকে লক্ষ কর। দেখবে বাতাসের বেগের সাথে মাটির কণা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে উড়ে যায়। বাইরে ধাকলে তোমার চোখে মুখেও মাটির কণাগুলো আঘাত করে। অর্ধাং বাতাস ধারাও ভূমিক্ষয় হয়। এখন হয়ত বলতে পারবে যে বিভিন্ন কারণে জমির মাটির উপরিভাগ হতে মাটির কণা চলে যাওয়াকে ভূমিক্ষয় বলে।

ভূমিক্ষয় প্রক্রিয়ায় একস্থানের মাটির ক্ষয় হয় আর অপেক্ষাকৃত নিম্নতম স্থানে জমা হয়। ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে বৃষ্টিপাত, ঘূর্ণিবাত্যা, নদীর শ্রোত, বনজঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ, পাহাড়ের ঢালে চাষাবাদ ইত্যাদি। ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি যখন পানি শোষণক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন অতিরিক্ত পানি মাটির উপরের স্তরের কিছু মুক্তিকা কণা বহন করে নিম্ন দিকে প্রবাহিত হয়। পানি প্রবাহের সাথে ভূমির উপরি স্তরের মাটি আলগা হয় এবং নিম্নভূমিতে গিয়ে জমা হয়। তেমনি কর্তৃত জমি হতে বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমেও খুলার আকারে মাটি দূরদূরান্তে চলে যায়। নদীর শ্রোত নদী তীরের পাড় ভেঙে মাটি অন্যস্থানে বহন করে নিয়ে যায় ও চৰাঘল গড়ে তোলে। মানুষ যখন বন-জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে ফসলের আবাদ করে তখন ভূমি উন্মুক্ত হয়। আর গবাদিপশুও বিচরণ করে। এতে ভূমির ক্ষয় হয়। একইভাবে পাহাড়ের জঙ্গল কেটে পাহাড়ের ঢালে চাষাবাদ করে। বৃষ্টিপাতের জলশ্রোত উপরের স্তরের মাটি উপর্যুক্ত পরিমাণ হয়।

ভূমিক্ষয়ের প্রকার

ভূমিক্ষয় দুই প্রকার। যথা: (১) প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয় ও (২) মনুষ্য কর্তৃক ভূমিক্ষয়। নিচে এগুলোর আলোচনা করা হলো:

১। প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয় : প্রাকৃতিকে ব্যাপকভাবে ভূমিক্ষয় হয়। ভৃ-সৃষ্টির তরু থেকেই এর ক্ষয় তরু হয়েছে। দীর্ঘকালের এই ক্ষয়ের ফলেই নদীর মোহনায় বা সমুদ্রে চর সৃষ্টি হয়েছে বা দীপ গড়ে উঠেছে। এই ভূমিক্ষয়ের ফলে পৃথিবীর অনেক অঞ্চল উর্বর হয়েছে, আবার অনেক অঞ্চল অনুর্বর হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অনবরত ভূমিক্ষয় হচ্ছে অথচ আমরা তা উপলব্ধি করি না।



চিত্র: প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয়

বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। এগুলো চলার পথে কৃ-পৃষ্ঠের মাটির কণা বহন করে নিয়ে যায়। এ জন্য যে পরিমাণ মাটির ক্ষয় হয় তা খুবই নগণ্য এবং দৃষ্টিগোচর হয় না। হয়ত তাই ভূমির এই ক্ষয়কে বলা হয় স্বাভাবিক ক্ষয়। প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয় মাটি গঠন প্রক্রিয়ারই একটি অংশ বলে বিবেচিত হয়। মাটি গঠন ও ভূমিক্ষয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্য রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘকাল ভূমিক্ষয়ের ফলে কৃষিকাজ একটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে।

প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয়ের শ্রেণিবিভাগ

ভূমিক্ষয়কে প্রধানত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা:

ক. বৃষ্টিপাতজনিত ভূমিক্ষয় এবং

খ. বায়ুপ্রবাহজনিত ভূমিক্ষয়

ক. বৃষ্টিপাতজনিত ভূমিক্ষয় : বৃষ্টিপাতের কারণে বাংলাদেশে ব্যাপক ভূমিক্ষয় হয়। এই ভূমিক্ষয়কে নিচের চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়;

- আন্তরণ ভূমিক্ষয়
- রিল ভূমিক্ষয়
- নালা বা গালি ভূমিক্ষয়
- নদী ভাঙ্গন।

নিচে এই ভূমিক্ষয়গুলোর আলোচনা করা হলো

i) **আন্তরণ ভূমিক্ষয় :** যখন বৃষ্টির পানি বা সেচের পানি উচু ছান থেকে ঢাল বেয়ে জমির উপর দিয়ে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় তখন জমির উপরিভাগের নরম ও উর্বর মাটির কণা কেটে পাতলা আবরণের বা আন্তরণের মতো ঢাল যায়। একেই ঢাল হয় আন্তরণ ভূমিক্ষয়। বৃষ্টির ফলে যে ভূমিক্ষয় হয় তা সহজে চোখে পড়েন। কিন্তু কয়েক বৎসর পর বোঝা যায় যে জমির উর্বরতা ত্বাস পেয়েছে। আর এর কারণ হলো আন্তরণ ভূমিক্ষয়।

ii) **রিল ভূমিক্ষয় :** রিল ভূমিক্ষয় আন্তরণ ভূমিক্ষয়েরই তৃতীয় ধাপ। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে পানি বেশি হলে জমির ঢাল বরাবর স্থাক্তির রেখা সৃষ্টি হয়। যা অনেকটা হাতের রেখার মতো। এই ছোট ছোট রেখা কালক্রমে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বড় হতে থাকে। বৃষ্টির পানির স্তোত্তুরায় উর্বর মাটি জমি থেকে ছানচূত হয় ফলে জমি উর্বরতা হারায় এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারেও অসুবিধার সৃষ্টি করে।



চিত্র : রিল ভূমিক্ষয়

iii) **নালা বা গালি ভূমিক্ষয় :** এই ভূমিক্ষয় আন্তরণ ভূমিক্ষয়ের তৃতীয় ধাপ। অর্থাৎ রিল ভূমিক্ষয় থেকেই নালা বা গালি ভূমিক্ষয়ের উন্নতি। দীর্ঘকাল ধরে রিল ভূমিক্ষয়ের ফলে এর ছোট ছোট নালাগুলো দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর ফসলের মাটি ও বেশি ক্ষয় হতে থাকে। একসময় এগুলো নর্দমা বা ছোট নদীর মতো দেখায়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃত্ত বেশি হবে নালা বা গালি ভূমিক্ষয় ততই বেশি হবে। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে এক্ষেত্রে ভূমিক্ষয় দেখা যায়।

iv) নদীভাঙ্গন : নদীভাঙ্গন বাংলাদেশের ভূমিক্ষয়ের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ, গোয়ালপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রতি বছরই নদীভাঙ্গনে শত শত হেক্টের জমি নদী গর্তে বিলীন হচ্ছে। বর্ষার ক্ষয়তে কিংবা বর্ষার শেষে নদীতে প্রবল প্রোত সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে নদীতীরের কৃষিজমি নদীগর্তে বিলীন হয়ে যায়।



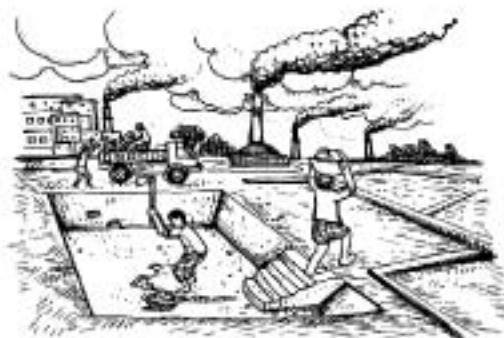
চিত্র : নদী ভাঙ্গন

৪. বায়ুপ্রবাহজনিত ভূমিক্ষয়

গতিশীল বায়ু প্রবাহ কর্তৃক এক স্থানের মাটি অন্যত্র বয়ে নেরার প্রক্রিয়াকে বাত্যাজনিত ভূমিক্ষয় বলে। যেসব এলাকা সমতল, তুলনামূলকভাবে গাছপালা কর এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কম, সেসব এলাকায় বাত্যাজনিত কারণে ভূমিক্ষয়ের প্রকোপ দেখা যায়। বেলে ও বেলে দোআশ মাটি আলগা ও হালকা। কাজেই প্রবল বেগে বায়ুবাহিত হলে এসব মাটি সহজেই উড়ে যায়। আর যে স্থানে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ একেবারেই কম সে স্থানের বাত্যাজনিত ভূমিক্ষয় আরও বেশি।

মরুভূমিতে বায়ুপ্রবাহ উর্বর অঞ্চলে বালি নিষ্কেপ করে অনুর্বর করে তোলে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে দিনাজপুর - রাজশাহী অঞ্চলে চৈত্র - বৈশাখ মাসে বায়ুজনিত ভূমিক্ষয়ের প্রকোপ সামান্য দেখা যায়। এর ফলে বায়ু প্রবাহে আবাসি জমির উর্বরতা কমে যায়।

২। মনুষ্য কর্তৃক ভূমিক্ষয় : মানুষের বাচার জন্যে ধান্যের প্রয়োজন। ধান্য উৎপাদনের জন্য মানুষ মাটিকে যথেষ্ট ব্যবহার করে আসছে কৃষি সম্প্রসারণ সূচনালগ্ন থেকে। ভূমিকর্ষণ, পানি সেচ, পানি নিকাশন ইত্যাদি কাজ কৃষিকাজের মূল অংশ। এ কাজগুলো ধারা মাটিকে প্রতিনিয়ত উৎপীড়ন করা হচ্ছে। ফলে ভূমিগুলো প্রাকৃতিক শক্তির তথা বৃষ্টি ও বাতাসের নিকট উন্মোচিত করছে এবং ক্ষয় হচ্ছে। মাটিকে যত ব্যবহার করা হবে ততই এর ক্ষয় হতে থাকবে। অনাঞ্চাদিত মাটি বৃষ্টি, বায়ু, বন্যা, এঙ্গলোর আক্রমণের শিকার। পাহাড়ি এলাকায় জুম চাষের ফলে



চিত্র : মনুষ্য কর্তৃক ভূমিক্ষয়

বা ধাপ করে চাষ করার ফলে মাটি আলগা হয়ে যায়। মূলধারায় বৃষ্টির ফলে সেখানকার মাটিতে পাহাড়ি ধস নামে। এতে বিপর্যয় আকারে ভূমিধস হয়। তখন তাই নয়- এতে জান মালেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। তাঁছাড়া গবাদিপশ্চ বিচরণকালে অনেক ধূলাবালি উড়ে যায়। মেঠোপথে চলার সময়ও ধূলাবালি উড়ে।

ভূমিক্ষয়ের ক্ষতির বিভিন্ন নিক

ভূমিক্ষয়ের ক্ষতিকারক দিকগুলো নিম্নরূপ:

- (১) ভূমিক্ষয়ের কারণে জমির পুষ্টিসমূক উপরের শ্রেণের মাটি অন্যত্র চলে যায়। ফলে মাটির উর্বরতার ব্যাপক অপচয় হয়।

- (২) ভূমিক্ষয়ের ফলে মাটিতে পৃষ্ঠির অভাব দেখা দেখে। ফসলের বৃক্ষিতে ফসলের বৃক্ষিতে ব্যাঘাত ঘটে।
- (৩) ক্রমাগত ভূমিক্ষয়ের কারণে নদী-নালা, হাউর-বিল ভরাটি হয়ে যায়। ফলে দেশে প্রায়ই বন্যার প্রাদুর্ভাব ঘটে। এতে ফসল, পত্তপাথি, বাঢ়িঘরের অনেক ক্ষতি হয়।
- (৪) ভূমিক্ষয়ের বিরাট অংশ নদীতে জমা হয়। এতে নদীর গভীরতা কমে যায় এবং সৌ চলাচলে বিছু ঘটে।
- (৫) প্রবাদ আছে যে উর্বর মাটির ক্ষয় মানে সম্ভ্যতার ক্ষয়।

ভূমিক্ষয়ের কারণ

অনেক কারণেই ভূমিক্ষয় হয়। উপরের ভূমিক্ষয়ের প্রকার থেকেও অনুধাবন করা যায় ভূমিক্ষয়ের কারণ কী কী। নিচে ভূমিক্ষয়ের কারণগুলো উল্লেখ করা হলো।

- | | |
|----------------------|------------------------|
| (১) বৃষ্টিপাত | (২) ভূমি ঢাল |
| (৩) মাটির প্রকৃতি | (৪) শস্যের প্রকৃতি |
| (৫) জমি চাষের পদ্ধতি | (৬) নিবিড় চাষ |
| (৭) বায়ু | (৮) মানুষের কার্যাবলি। |

বৃষ্টিপাত : বৃষ্টিপাত চাষাবাদের জন্য যেমন ভালো আবার ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ। বৃষ্টিপাতের ভিত্তিতা, সংখ্যা ও পরিমাণ ভূমিক্ষয়কে প্রভাবিত করে। মুখ্যধারায় বৃষ্টি হলে বৃষ্টির ফেঁটা বড় হয় এবং মাটিতে সজোরে আঘাত করে আর এতে মাটির কণা আলগা হয়। মাটি যখন পানি শোষণক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন অতিরিক্ত পানি একটি প্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে উপর থেকে অপেক্ষাকৃত নিচের দিকে ধাবিত হয়। যাওয়ার পথে পানির সঙ্গে আলগা ও নরম মাটি স্থানান্তরিত হয়। পানির বেগ যত বেশি হবে মাটির ক্ষয়ও তত বেশি হবে।

ভূমির ঢাল : অধিক ঢালু মাটিতে অধিক বেগে পানি নিচের দিকে ধাবিত হয়। এজন্য পার্বত্য এলাকায় সমতল এলাকার চেয়ে ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ বেশি। বাংলাদেশের বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি এলাকায় সাধারণত জুম চাষ করা হয়। ফলে জুম চাষ এলাকার মাটি আলগা হয় এবং বৃষ্টিপাতের ফলে এই মাটি বৃষ্টির পানির সাথে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে চলে যায়। কয়েক বছরের মধ্যে জুম চাষের স্থানটি অনুর্বর হয়ে পড়ে।

মাটির প্রকৃতি : ভূমিক্ষয় মাটির কাঠামো, বুনট ও জৈব পদার্থের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। বেলে-দোআংশ মাটি অধিক সঞ্চিত্বিত বলে সম্পূর্ণ বৃষ্টির পানি সহজেই তুষে নিতে পারে। তাই এই মাটির ভূমিক্ষয় কর। কিন্তু কাদা ও ভারী মাটি সঞ্চিত্বিত কর থাকায় এর শোষণক্ষমতাও কর। ফলে সামান্য বৃষ্টি হলেও মাটির উপরে পানি জমে যায় এবং ভূমির ক্ষয় করে মাটি নিচের দিকে ধাবিত হয়।

চাষ পদ্ধতি ও শস্যের প্রকৃতি : পাহাড়ি জমিতে ঢালের আড়াআড়ি চাষ না করে যদি ঢালের বরাবর চাষ করা হয়, তবে বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমিক্ষয় হয়। আড়া পাহাড়ের গায়ে ধাপ সৃষ্টি করে ফসলের চাষ করা হয়। কিন্তু যদি তা না করে সাধারণভাবে জমি চাষের চেটা করা হয় তবে পাহাড়ি ভূমিধস বা ভূমিক্ষয়ের শিকার হয়। জমি ঘন ঘন চাষ করলেও ভূমিক্ষয় হয়।

যেসব ফসল মাটি ঢেকে রাখে, সেগুলো মাটিকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। যেমন চিনাবাদাম, মাসকলাই, খেসারি ইত্যাদি। কিন্তু আখ, ছুটা, ধান, গম ইত্যাদি প্রাথমিক পর্যায়ে মাটিকে ঢেকে রাখেন। ফলে ভূমিক্ষয় হয়।

বায়ু প্রবাহ : যে অঞ্চলে গাছপালা কম সে অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ ঘারা ভূমিক্ষয় হয়। বাংলাদেশের রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চলে এক্সপ্রেস ভূমিক্ষয় হয়।

মানুষের কার্যাবলি : ভূমিক্ষয়ের প্রকৃত কারণ মানুষ নিজে। শুধুর অন্ত যোগাড় করতে মানুষ জঙ্গল পরিষ্কার করতে শুরু করে। তাতে মাটির উপরিভাগ উন্মুক্ত হয় এবং ভূমিক্ষয়েরও সূচনা হয়। তাছাড়া মানুষ ঘরবাড়ি, রাস্তাধাট ইত্যাদি নির্মাণ করেও কৃষিজমি বিনষ্ট করছে এবং ভূমিক্ষয় করছে।

ভূমিক্ষয়রোধের কার্যকরী উপায়সমূহ

কৃষিকাজের অন্যতম একটি প্রযুক্তি হলো ভূমিক্ষয়রোধ করা। এই প্রযুক্তি ভূমিক্ষয় রোধের ক্ষেত্রে পদ্ধতির সমষ্টি। পদ্ধতিগুলো হচ্ছে-

পানিপ্রবাহ ত্রাসকরণ

- ১) ভূমিক্ষয় করাতে পানি প্রবাহের বেগ কমানো জরুরি। বিভিন্নভাবে পানি প্রবাহের বেগ কমানো যায়। যথা, বৈধ বা আল দিলে পানির বেগ কমে আসে, মাটি পানি শোষনের সময় পার ও ভূমিক্ষয় রোধ হয়।
- ২) রিল ভূমিক্ষয়ের ফলে যে ছেট ছেট নালার সৃষ্টি হয় তা ভরাট করে সমান করে দিলে পানির বেগ কমে যাবে এবং ভূমিক্ষয়ও রোধ হবে।
- ৩) বড় নালার মধ্যে আগোছা জন্মাতে দেখয়া এবং শেষ প্রাপ্তে খুটি পুতে তারের জাল বাঁধলে পানির বেগ কমে যাবে।
- ৪) উপরন্ত তারের জালের মূলে খড়কুটা ফেললে পানির বেগ একেবারেই মন্ত্র হবে এবং ভূমিক্ষয় রোধ হবে।

পানি নিষ্কাশনের সুবচ্ছেদনকরণ

জমিতে পানি জমা থাকলে এর সাথে বৃষ্টির পানি যোগ হলে প্রথল স্তোত্রের সৃষ্টি হয় এবং জমির মাটি আলগা হয়ে সরে যায়। কাজেই কৃষিজমি কয়েক খণ্ডে ভাগ করে প্রতি খণ্ড হতে পানি সরালে ভূমির এক্সপ্রেস ক্ষয়রোধ করা সম্ভব হবে।

জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃক্ষিকরণ

জমিতে জৈব পদার্থ অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করলে মাটির দানাবদ্ধন ভালো হয়। বৃষ্টির পানি মাটিকে ঝয় না করে সহজেই নিচের দিকে চলে যেতে পারে। যে জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কম সে জমির মাটি সহজেই ঝয় হয়।

পাহাড়ে ধাপে ধাপে ফসল চাষ করা

জুম চাষের ফলে পাহাড়ের মাটি সহজেই আলগা হয় ও ভূমিক্ষয় হয়। জুম চাষ না করে যদি পাহাড়ের গায়ে চতুর্দিক ধীরে সমতল সিঁড়ি বা ধাপ করে চাষাবাদ করা হয় তা হলে বৃষ্টির পানি পাহাড়ের মাটির ঝয় করতে পারবে না।

কল্টোর পদ্ধতিতে চাষ করা

এই পদ্ধতিতে পাহাড়ের ঢালের আড়াআড়ি সমবিত লাইনে জমি চাষ করা হয়। ঢালের আড়াআড়ি জমি চাষ হয় বলে বৃষ্টির পানির গতি কম হয়। মাটি স্থানান্তরিত না হয়ে ফসলের গোড়ায় আটকে থাকে।

- | | |
|-------|--|
| কাজ : | ১. শিক্ষার্থীরা নিজ এলাকার কৃষিজমি ক্ষয়ের কারণ এবং প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখবে। |
| | ২. শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে ভূমিক্ষয় রোধে সচেতনতামূলক পোস্টার লিখবে এবং প্রদিতে উপস্থাপন করবে। |

চতুর্থ পরিচেদ

বীজ সংরক্ষণ

বীজ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া

বীজ উৎপাদন থেকেই বীজ সংরক্ষণের শুরু। জমিতে এর বপন বা রোপণের মাধ্যমে বীজ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া শেষ। তাহলে দেখা যাচ্ছে বীজ সংরক্ষণ বলতে বীজের উৎপাদন, শকানো, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নির্ণয়ণ, বিপণন যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাকেই বোঝায়।

বীজ সংরক্ষণের শর্তসমূহ

বীজ উৎপাদন

বীজ শস্য উৎপাদনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মনে রাখা দরকার:

- ১) কেবল বীজের জন্যই ফসলের চাষ করা;
- ২) নির্বাচিত জমির আশপাশের জমিতে ঐ নির্দিষ্ট বীজ ফসলের অন্য জাতের আবাদ না করা;
- ৩) বীজ উৎপাদনের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে বীজ সংগ্রহ করা;
- ৪) বীজের চারা বৃক্ষিকালে জমি থেকে ভিন্ন জাতের গাছ তুলে ফেলা;
- ৫) বীজের ক্ষেত ঘন ঘন পরিদর্শন করা যাতে (ক) আগাছা দমন (খ) ভিন্ন জাতের গাছ তোলা ও (গ) রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড়ের উপন্দুর ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া যায়;
- ৬) ফসলের পরিপন্থতার দিকে দৃষ্টি রাখা;
- ৭) পরিকার পরিচ্ছন্নভাবে ফসল কাটা, মাড়াই করা ও কাঢ়া।

বীজ শকানো

বীজকে দীর্ঘায় দান ও পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বীজকে শকানো প্রয়োজন। বীজের জীবনীশক্তি ও অঙ্গুরোদগম ক্ষমতা বাড়াতে বীজ শকানোর কোনো বিকল্প নেই। প্রকৃতপক্ষে বীজের অর্দ্রতা একটি স্ট্যান্ডার্ড মাত্রায় আনার জন্যই বীজ শকানো হয়। ক্ষেত থেকে যখন ফসল কাটা হয় তখন এর অর্দ্রতা থাকে ১৮% থেকে ৪০% পর্যন্ত। এই অর্দ্রতা বীজের জীবনীশক্তি নষ্ট করে ফেলে। তাই বীজকে পরবর্তী মৌসুমে ব্যবহারের নিমিত্তে বীজের অর্দ্রতাকে ১২% বা তার নিচে নামিয়ে আনা আবশ্যিক। আর এ জন্যই বীজ শকানোর প্রয়োজন হয়।

বীজ শকানোর পদ্ধতি

দুই প্রকারে বীজ শকানো যায়। যথা: (১) প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক বাতাসে শকানো এবং (২) উন্নত বাতাসে শকানো।

বীজের চারিপার্শ্ব বাতাসের অর্দ্রতা যদি বীজের অর্দ্রতা থেকে বেশি হয় তবে বাতাস থেকে অর্দ্রতা বীজের মধ্যে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত না বীজ ও বাতাসের অর্দ্রতা সমান হয়। বীজের অর্দ্রতা প্রয়োজনীয় মাত্রায় রাখতে হলে চারিপার্শ্ব বাতাসকে শকানো রাখা প্রয়োজন।

বীজ শকানোর সময় নির্ভর করে (১) বীজের অর্দ্রতার মাত্রা (২) বাতাসের তাপমাত্রা ও অর্দ্রতার মাত্রা (৩) বাতাসের গতি এবং (৪) বীজের পরিমাণের উপর।

মনে রাখতে হবে যে, (১) বেশি তাপমাত্রায় বীজ তকালে বীজের সমৃহ ক্ষতি হয়। ঘেমন- বীজের জীবনীশক্তি ও অঙ্গুরোদগম ক্ষমতা হ্রাস পায়। (২) অপর্যাণ তাপে বীজ তকালেও একই রকম ক্ষতি হয়। অর্থাৎ বীজের জীবনীশক্তি ও অঙ্গুরোদগম ক্ষমতা হ্রাস পায়।

পরিমিত তাপে দক্ষতার সাথে বীজ তকালে-

- সর্বোচ্চ মানের বীজ পাওয়া যায়।
- বীজ দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা যায়।
- বীজের ব্যবসায় আর্থিক সাড়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ

ফসল কাটার পর ফসলের দানাকে বীজে পরিণত করা এবং প্রতিবর্তী বগনের পূর্ব পর্যন্ত বীজের উন্নতমান ও অঙ্গুরোদগম ক্ষমতাকে বজায় রাখার জন্য বীজের সর্বশক্তকার পরিচর্যাকে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ বলে। বীজ শক্তিয়ে মান ও আকার অনুযায়ী ভাগ করা এবং সর্বশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণের গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ।

বীজকে সুস্থুভাবে প্রক্রিয়াজাত করলে যে সুফল পাওয়া যায়

- ১) বীজের বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি পায়;
- ২) বীজ দেখতে আকর্ষণীয় হয়;
- ৩) বীজের অঙ্গুরোদগম ক্ষমতা বাঢ়ে।

বীজের মান নিয়ন্ত্রণ

বীজের মান নিয়ন্ত্রণ বলতে কৃষিতাত্ত্বিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে বীজ উৎপাদন হয়েছে কি না, সঠিকভাবে ফসল কর্তৃন, মাড়াই ও ঝাড়াই হয়েছে কিনা, সঠিকভাবে বীজ শক্তিয়ে নির্দিষ্ট আর্দ্রতায় আনা হয়েছে কি না বোঝায়। প্রতিটি কাজেই বীজের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণের সুযোগ রয়েছে।

বীজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলো করা জরুরি:

একটি বীজের নমুনার মধ্যে (১) বিশুদ্ধ বীজ (২) ঘাসের বীজ (৩) অন্যান্য শস্যের বীজ ও (৪) পাথর থাকে। এই চারটি ভাগের মধ্যে বিশুদ্ধ বীজের শতকরা হার বের করাই বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা।

বীজের অঙ্গুরোদগম পরীক্ষা

নমুনা বীজের শতকরা কতটি বীজ গজায় তা বের করাই বীজের অঙ্গুরোদগম পরীক্ষা। যখন বীজের আর্দ্রতা ৩৫ - ৬০% বা তার উপর হয় তখন অঙ্গুরোদগম ত্বরু হয়। এর হার শতকরায় প্রকাশ করা হয়। ১০০ টি বীজ গুগে একটি বেলে মাটিপূর্ণ মাটির পাত্রে রেখে বা পানি দ্বারা ডিজিয়ে রাখতে হবে। প্রতিদিন দেখতে হবে পানি দেন শক্তিয়ে না যায়। নির্ধারিত সময় পরে বীজের অঙ্গুরোদগম ত্বরু হবে। যতটি বীজ গজাবে ততটি হবে বীজের অঙ্গুরোদগম হার।

বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা

বীজ থেকে আর্দ্রতা বের করে দিয়ে তাতে কতটুকু আর্দ্রতা আছে তা জানার পক্ষতিকে বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা বলা হয়। তা শতকরা হারে নিম্নোক্ত সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{সূত্র: } \text{আর্দ্রতার শতকরা হার} = \frac{\text{নমুনা বীজের ওজন} - \text{নমুনা বীজ তকানোর পর ওজন}}{\text{নমুনা বীজের ওজন}} \times 100$$

বীজের জীবনীশক্তি পরীক্ষা

এই পরীক্ষার জন্য বীজ গজানোর একটি প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। এই প্রতিকূল অবস্থায় যে বীজ বেশি গজাবে সে বীজেরই জীবনীশক্তি বেশি বলে প্রতীয়মান হবে।

বীজ বিপণন

বীজ বিপণন বীজ প্রযুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বীজ বিপণন বলতে বীজ সংরক্ষণ, প্যাকেজ করা, বিক্রিপূর্ব সংরক্ষণ, বিজ্ঞপ্তি, বিক্রি এসব কাজকে এক কথায় বিপণন বলে। বীজ বিপণনকালে ক্রেতাদের নির্মোক্ষ তথ্য প্রদান করতে হবে।

- বীজের জাত নির্ধারণ
- বীজের পরিমাণ নির্ধারণ
- বীজ অনুমোদনপ্রাপ্ত বা প্রত্যাশিত কি না
- বীজের অঙ্কুরোদগমের হার
- বীজের বিতর্কতার হার
- বীজের আর্দ্রতা
- বীজের জীবনকাল
- বীজ উৎপাদনকারী সংস্থার নাম
- বীজ অনুমোদন সংস্থার নাম
- বীজ বপনের পক্ষতি
- সংরক্ষণের নির্দেশ
- বীজের মূল্য

বীজ সংরক্ষণের ক্ষেত্র

বীজ জীবন অনুভূতিপ্রবণ। একটু অসর্কতার জন্য বিপুল পরিমাণে বীজ নষ্ট হয়। কৃষকেরা তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বীজ সংরক্ষণ করেন। একটাই উদ্দেশ্য সামনের মৌসুমে যাতে সুস্থিস্বল বীজ বাজারে বিক্রি করতে পারেন। কিন্তু তবুও কীভাবে বীজের জীবনীশক্তি যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বীজ সংরক্ষণের পক্ষতির উদ্বাবন হয়েছে। ফসল বাছাই মাড়াই ও পরিবহনকালেই বীজ নষ্ট হয় বেশি। ইনুর, পাথি, ছাক, আর্দ্রতা ইত্যাদির কারণে প্রায় দশ ভাগ ফসল নষ্ট হয়। এতদ্বারা বীজের সাথে ধূলাবালি, নুড়ি পাথরও বীজের গুণাগুণ নষ্ট করে।

বীজ সংরক্ষণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো বীজের গুণগতমান রক্ষা করা এবং যেসব বিষয় বীজকে ক্ষতি করতে পারে সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক হওয়া ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।

বীজ সংরক্ষণের পক্ষতি

বাংলাদেশে বীজ সংরক্ষণের অনেক পক্ষতি আছে। এক এক ফসলের বীজের জন্য এক এক রকম পক্ষতি ব্যবহার করা হয়। যেমন দানাজাতীয় শস্য- ধান, গম, কুটা, বীজের জন্য ধানগোলা, ডোল মাটির পাতা, চট্টের বন্ডা, পলিব্যাগ ও বেড ব্যবহার করা হয়। নিম্নে ফসল সংরক্ষণের পক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বীজ শকানো ও চট্টের বন্ডায় সংরক্ষণ

বীজ শকানো অর্থ হচ্ছে বীজ থেকে অতিরিক্ত আর্দ্রতা সরানো এবং পরিমিত মাত্রায় আনা। আর্দ্রতার মাত্রা ১২ - ১৩% হলে ভালো হয়। বাংলাদেশে বীজ শকানো হয় রোদে বা সূর্যতাপে। এই আর্দ্রতা ১২-১৩ শতাংশ নামাতে বীজগুলোকে প্রায় তিনিলিঙ প্রথর রোদে শকাতে হয়। ঠিকমতো শকিয়েছে কিনা তা বীজে কার্বড দিয়ে পরৱর্ত করতে হবে। বীজে কার্বড দেওয়ার পর যদি 'কট' করে আওয়াজ হয় তবে মনে করতে হবে বীজ ভালোমতো শকিয়েছে। অতঃপর বীজগুলোকে চট্টের বন্ডায় নিম্নে গোলা ঘরে রাখা হয়। বীজ পোকার উপর্যুক্ত থেকে রক্ষার জন্য বীজের বন্ডায় নিম্নের পাতা, নিম্নের শিকড়, আপেল বীজের গুঁড়া, বিশকাটালি ইত্যাদি যোগানো হয়।

ধানগোলার সংরক্ষণ

ধান সংরক্ষণের জন্য ধানের গোলা ব্যবহার হয়ে থাকে। ধান গোলার আয়তন বীজের পরিমাণের উপর নির্ভর করে নির্মাণ করা হয়। বীজ রাখার আগে ধান গোলার ভিতরে ও বাইরে গোবর ও মাটির মিশ্রণের প্রলেপ দিয়ে বীজ রাখার উপযুক্ত করতে হবে। বীজগুলো এমনভাবে ভরতে হবে যেন এর ভিতর কোনো বাতাস না থাকে। সেই জন্য ধানগোলার মুখ বন্ধ করে এর উপর গোবর ও মাটির মিশ্রণের প্রলেপ দিতে হবে।

ডোলে সংরক্ষণ

ডোল আকারে ধান গোলার চেয়ে ছোট। ডোল ধানগোলার চেয়ে কম ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে বীজ পাও। এটি বাঁশ বা কাঠ দিয়ে গোলাকার করে তৈরি করা হয়। ধানগোলার মতোই ডোলের বাইরে ও ভিতরে গোবর ও মাটির মিশ্রণের প্রলেপ দিয়ে ভালোভাবে ভরিয়ে বীজ রাখার উপযুক্ত করা হয়।



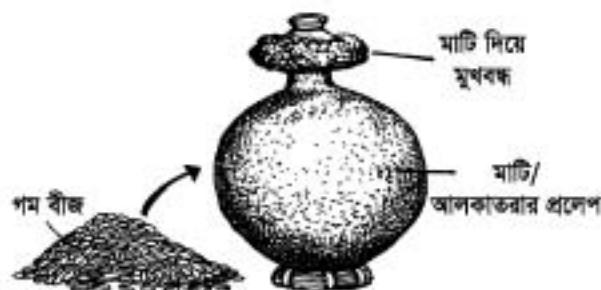
চিত্র : ডোলে বীজ সংরক্ষণ

পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষণ

আজকাল পাঁচ কেজি ধারণক্ষমতা সম্পর্কে পলিথিন ব্যাগে বীজ সংরক্ষণ করা হয়। এই ব্যাগ আরডিআরএস কর্তৃক উন্নীত। সাধারণ পলিথিনের চেয়ে বীজ রাখার পলিথিন অপেক্ষাকৃত মোটা হয়। তৎক্ষেত্রে বীজ এমনভাবে পলিথিন ব্যাগে রাখতে হবে যাতে কোনো ফাঁক না থাকে এবং ব্যাগ থেকে সম্পূর্ণ বাতাস বেরিয়ে আসে। অতঃপর ব্যাগের মুখ তাপের সাহায্যে এমনভাবে বন্ধ করতে হবে যেন বাইরে থেকে ভিতরে বাতাস প্রবেশের সুযোগ না থাকে।

মটকায় সংরক্ষণ

মটকা মাটি নির্মিত একটি গোলাকার পাত্র। গ্রাম বালোয় এটি বহুল পরিচিত। এটি বেশ পুরু এবং মজবুত। মটকার বাইরে মাটি বা আলকাতরার প্রলেপ দেওয়া হয়। গোলা থারের মাচার নির্দিষ্ট স্থানে মটকা রেখে এর ভিতর তকনো বীজ পুরোপুরি ভর্তি করা হয়। অতঃপর ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে উপরে মাটির প্রলেপ দিয়ে বায়ুরোধক করা হয়।



চিত্র : মাটির কলসে বীজ সংরক্ষণ

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থীরা মাটির কলসে কীভাবে বীজ সংরক্ষণ করে সে পদ্ধতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণিতে জমা দিবে এবং উপস্থাপন করবে।

পঞ্চম পরিচেছন

খাদ্য সংরক্ষণ

মাছের খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

মাছ চাষকে লাভজনক করতে হলে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি মাছকে বাইরে থেকে দেওয়া সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষে যা খরচ হয় তার প্রায় শতকরা ৬০ ভাগই খরচ হয় খাদ্য ক্রয় করতে। সম্পূরক খাদ্য হিসাবে আমাদের দেশে সচরাচর যে উপাদানগুলো ব্যবহার করা হয় তা হলো- চালের কুঁড়া, গমের ভূসি, সরিষার খৈল, তিলের খৈল, ফিশমিল, গরু-ছাগলের রক্ত ও নাড়ি-ভূঁড়ি, জলজ উদ্বিদ যেমন-কচুরিপানা, খুদিপানা ইত্যাদি। এসব উপাদান প্রয়োজনমতো যিন্তিত করে চাষিরা মৎস্য খাদ্য তৈরি করে। কারখানার তৈরি বাণিজ্যিক খাদ্যও মৎস্য খামারে ব্যবহার করা যায়। যে ধরনের খাদ্যই মাছ চাষের পুরুরে ব্যবহার করা হোক না কেন তার গুণগতমান ভালো হওয়া আবশ্যিক। খাবারের গুণগতমান ভালো না হলে সুস্বল্প পোনা ও মাছ হবে না, মাছ সহজেই রোগাক্রান্ত হবে এবং মাছের মৃত্যুহার অনেক বেড়ে যাবে। আবার মাছের বৃক্ষিক আশানুরূপ হবে না। খাদ্যের গুণগতমান ভালো রাখার জন্য যথাব্ধি নিয়মে খাদ্য উপকরণ বা তৈরি খাদ্য সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিম্নলিখিত নিয়মকসমূহ খাদ্য সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণের সময় খাদ্যের গুণগতমান এবং ওজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে-

- ১। **খাদ্যের অর্দ্ধতা:** খাদ্যে অর্দ্ধতার পরিমাণ ১০% এর বেশি থাকলে ছাত্রাক বা পোকা-মাকড় জন্মাতে পারে।
- ২। **বাতাসের আপেক্ষিক অর্দ্ধতা:** বাতাসে আপেক্ষিক অর্দ্ধতা ৬৫% এর বেশি থাকলে খাদ্যে ছাত্রাক বা পোকা-মাকড় জন্মাতে পারে।
৩. **তাপমাত্রা:** অতিক্রিক তাপমাত্রায় খাদ্যের পুষ্টিমান নষ্ট হয়। পোকা-মাকড়সমূহ ২৬-৩০° সে: তাপমাত্রায় শুরু ভালো জন্মাতে পারে এবং এরা খাদ্য থেরে ফেলে ও তাদের মলমৃত্ত ধারা ব্যাকটেরিয়া ছড়াতে পারে।
- ৪। **সূর্যালোক:** সূর্যালোকে খোলা অবস্থায় খাদ্য রাখলে সূর্যের অতিবেগনি রশ্মির প্রভাবে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে কিছু কিছু ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়।
- ৫। **অক্সিজেন:** খোলা অবস্থায় খাদ্য রাখলে বাতাসের অক্সিজেন খাদ্যের রেপিডিটি (চর্বির জারণ ক্রিয়া) ঘটাতে পারে যা খাদ্যের গুণগতমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অক্সিজেন ছাত্রাক ও পোকা-মাকড় জন্মাতেও সহায়তা করে।

সঠিক খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি

ক) শকনো খাদ্য ও খাদ্য উপাদান

- ১) খাদ্য বায়ুরোধী পলিথিনের বা চটের অথবা কোনো মুখ বন্ধ পাত্রে ঠাণ্ডা ও শক জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। মাঝে মাঝে এই খাদ্য পুনরায় রোদে শকিয়ে নিলে ভালো হয়।
- ২) খাদ্য পরিষ্কার, শকনো, নিরাপদ এবং পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ঘরে রাখতে হবে।

- ৩) গুদাম ঘরে সংরক্ষিত খাদ্য মেঝেতে না রেখে ১২ থেকে ১৫ সেমি. উপরে কাঠের পাটাতলে রাখতে হবে।
 - ৪) পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্যের বন্দার নিচে এবং আশপাশে ছাই ছিটিয়ে দেওয়া হবে।
 - ৫) খাদ্য তিন মাসের বেশি গুদামে রাখা যাবে না। এর মধ্যেই এটি ব্যবহার করে ফেলা উচিত।
 - ৬) ইন্দুর বা অন্যান্য প্রাণীর উপর ব্যবহৃত হালে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
 - ৭) খাদ্য কাটনাশক ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থের সাথে রাখা যাবে না।
- ৮) **আর্দ্র/ভেজা খাদ্য উপাদান**
- ১) খাদ্য তৈরির জন্য ভাজা ছেট মাছ হলে তাংকশিক খাওয়াতে হবে, অন্যথায় রেফ্রিজারেটরে রেখে দিতে হবে।
 - ২) তেলাঙ্গ/চর্বিশূক্র খাদ্য কালো রঞ্জের বা অস্তচ পাত্রে নির্ধারিত তাপমাত্রায় রেখে দিতে হবে।
 - ৩) ভিটামিন ও খনিজ লবণসমূহ বাতাস এবং আলোকবিহীন পাত্রে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিতে হবে।

কাজ :শিক্ষার্থীরা খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করবে এবং পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ: রেফ্রিজিটর

পশ্চাত্যির খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

কোনো খাদ্যের গুণাগুণ ও পুষ্টিমান ঠিক রেখে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য খাদ্যকে প্রতিম্রাজাত করে রেখে দেওয়াকে খাদ্য সংরক্ষণ বলে। আবার তৈরি করা পশ্চখাদ্যের গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্যও গুদামজাত করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়।

খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

বাহ্লাদেশে প্রাণ্ত গবাদিপত্র খাদ্যের বেশির ভাগ কৃষি শস্যের উপজাত। এসব উপজাত শস্য মাড়ই বা শস্যদানা প্রতিম্রাজাত করার পর পাওয়া যায়। বর্ষা মৌসুমে অনেক ঘাস উৎপাদিত হওয়ায় তা গবাদিপত্রকে খাওয়ানোর প্রয়োজন থেকে যায়। আবার শীতকালেও অতিরিক্ত শিম গোত্রীয় ঘাস উৎপাদন হয়। তাই এই অতিরিক্ত ঘাস সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। যখন ঘাসের অভাব হয় তখন এই সংরক্ষিত ঘাস গবাদিপত্রকে সরবরাহ করা হয়। খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্যকে রোগজীবাণ ও পচনের হাত থেকে রক্ষা করা। পশ্চাত্যির দানাদার খাদ্যকে আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সংরক্ষণ করে বেশি দিন গুণাগুণ ঠিক রেখে সংরক্ষণ করা যায়। খাদ্যের আর্দ্রতা বেশি হলে এতে ছাঁজাক জন্মায়। ছাঁজাক জন্মানো খাদ্য খেলে পশ্চাত্যির দেহে বিষত্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে অনেক সময় পশ্চ অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

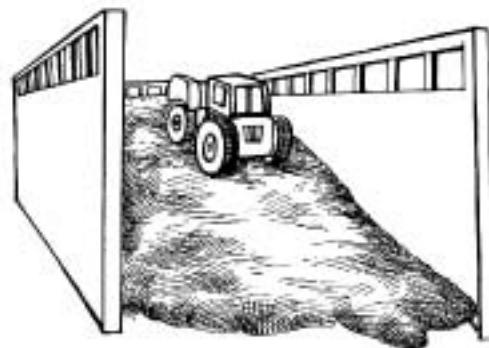
খাদ্য সংরক্ষণের উপায়ের বিভিন্ন ধাপসমূহ

ক) হে তৈরির মাধ্যমে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হে তৈরি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবুও নিম্নে হে তৈরির বিভিন্ন ধাপগুলো দেওয়া হলো-

- ১। হে তৈরির জন্য শিম গোত্রীয় ঘাস যেমন, সবুজ খেসারি, মাসকলাই বেশি উপযোগী।

- ২। ফুল আসার সময় ঘাস কাটতে হয়।
- ৩। ঘাস রোদে শকিয়ে আর্দ্রতা ১৫-২০% এর মধ্যে রাখা হয়।
- ৪। ঘাস শকিয়ে মাচার উপর স্পৃশ্পাকারে বা চালাযুক্ত ঘরে সংরক্ষণ করা হয়। খ) সাইলেজ তৈরির মাধ্যমে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা হয়। হিতীয় অধ্যায়ে সাইলেজ তৈরি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবুও নিম্নে সাইলেজ তৈরির ধাপগুলো দেওয়া হলো-

 - ১। সাইলেজ তৈরির জন্য ভূট্টা, নেপিয়ার, গিনি ঘাস বেশি উপযোগী।
 - ২। ফুল আসার সময় রসাল অবস্থায় ঘাস কাটতে হয়।
 - ৩। ঘাস কেটে বায়ুনিরোধক স্থানে বা সাইলো পিটে রাখা হয়।
 - ৪। সাইলো পিটে ঘাস রাখার সময় বোলাঙ্গড়ের দ্রবণ ছিটিয়ে দিতে হয়।
 - ৫। তারপর বায়ু চলাচল বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।



চিত্র : সাইলেজ তৈরির জন্য ভূট্টা কাটার উপযুক্ত অবস্থা চিত্র : সাইলো পিটে সবুজ ঘাস পরিপূর্ণ করা হচ্ছে

- গ) খড় তৈরির মাধ্যমে ফসলের বর্জ্য সংরক্ষণ করা হয়। আমাদের দেশে বেশিরভাগ কৃষক পরিবারে গরুর জন্য খাদ্য হিসাবে খড় ব্যবহার করা হয়। গরুকে দৈনিক ৩-৪ কেজি শক্তনো খড় দেওয়া হয়। এটি অংশজাতীয় খাদ্য। নিম্নে খড় তৈরির ধাপগুলো দেওয়া হলো-

 - ১। শস্যগাছ (ধান, ভূট্টা, খেসারি ইত্যাদি গাছ) ক্ষেত্র থেকে কাটার পর সেগুলো মাড়াই করে শস্যদানা আলাদা করে ফেলা হয়।
 - ২। বর্জ্য গাছগুলো রোদে শকিয়ে আর্দ্রতা ১৫-২০% এর মধ্যে এনে খড় তৈরি করা হয়।
 - ৩। খড় সাধারণত গাদা করে রাখা হয়।
 - ৪) দানাশস্য ও তেলবীজের উপজাত সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়। ধান, গম, ভূট্টা, খেসারি, কলাই ইত্যাদি দানাশস্যের উপজাতসমূহ যেমন, চালের কুঁড়া, গমের ভূসি, ডালের খোসা, বৈল ইত্যাদি সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়।
 - ৫) কারখানায় প্রক্রিয়াজাত করে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়। যেমন, পোল্ট্রির জন্য দানাদার খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করে মেশ, পিলেট ও ক্রাবল ফিল্ট তৈরি করা হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাছের সম্পূরক খাদ্য

মাছের সম্পূরক খাদ্যের পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা

দেহের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য মাছ পুরুরের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে ফাইটোপ্রাইকটন (উদ্ভিদকণা), অু-প্রাইকটন (প্রাণীকণা) খুদিপানা, ছেঁট জলজ পতঙ্গ, পুরুরের তলদেশের কীট, লার্ভা, কেঁচো, ছেঁট ছেঁট শামুক, কিনুক, মৃত জৈব পদার্থ ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে প্রয়োজন করে। কিন্তু মাছ চাষের ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদন পাওয়ার জন্য পুরুরে অধিক ঘনত্বে পোনা ছাড়া হয়। এ অবস্থায় শুধু প্রাকৃতিক খাদ্য মাছের দ্রুত বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক উৎপাদন পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। এমনকি সার প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক খাদ্য বৃক্ষ করলেও তা যথেষ্ট হয় না। এজন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি মাছকে বাহির থেকে অতিরিক্ত খাদ্য দিতে হয়। একে সম্পূরক খাদ্য বলে। যেমন-চালের কুঁড়া, সরিষার বৈল, ফিশ মিল ইত্যাদি। গ্রাসকার্প ও সরপুটি মাছ উদ্ভিদভোজী বলে এদের জন্য খুদিপানা, কুটি পানা, শাকসবজির নরম পাতা, ঘাস কেটে সম্পূরক খাবার হিসাবে পুরুরে দেওয়া যায়। মাছকে সরবরাহকৃত সম্পূরক খাদ্যে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যেমন-আমিষ, রেহ বা তেল, শর্করা, খনিজ লবণ ও ভিটামিনের মাত্রা যেন চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মাত্রায় থাকে সেনিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। যে সম্পূরক খাবার এ সকল পুষ্টি উপাদান যথাস্থ মাত্রায় রেখে তৈরি করা হয় তাকে সুবর্ণ সম্পূরক খাদ্য বলে।

মাছের সম্পূরক খাদ্যের উৎস

মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান ব্যবহার করা হয়। উৎসের উপর ভিত্তি করে এসব উপাদানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ক) উদ্ভিদজাত খাদ্য প্রাণিজাত। নিচে এদের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো-

ক) **উদ্ভিদজাত:** উদ্ভিদজাত খাদ্য উপাদানের মধ্যে কিছু উদ্ভেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে- চালের কুঁড়া, গম ও ডালের মিহিজুসি, সরিষার বৈল, তিলের বৈল, আটা, চিটাঙ্গড়, খুদিপানা, রাঙা ঘরের উচ্চিষ্ঠ, বিভিন্ন নরম পাতা যেমন- মিষ্টিকুমড়া, কলাপাতা, বাঁধা কপি ইত্যাদি।

খ) **প্রাণিজাত:** প্রাণিজাত কয়েকটি খাদ্য উপাদান হচ্ছে শুটকি মাছের কুঁড়া বা ফিশমিল, রেশম কীট মিল, চিৎড়ির কুঁড়া (স্রিস্প মিল), কাঁকড়ার কুঁড়া, হাঁড়ের চূর্ণ (বোন মিল), শামুকের মাংস, গবাদিপশুর রক্ত (ব্রাড মিল) ইত্যাদি।

সম্পূরক খাদ্যের উপকারিতা

- ১। মাছকে নিয়মিত সম্পূরক খাবার সরবরাহ করলে অধিক ঘনত্বে পোনা ও বড় মাছ করা যায়।
- ২। অল্প সময়ে বড় আকারের সুস্থসবল পোনা উৎপাদন করা যায়।

- ৩। পোনার বাঁচার হার বেড়ে যায়।
- ৪। মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- ৫। মাছের দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে।
- ৬। মাছ পুষ্টির অভাবজনিত রোগ থেকে মুক্ত থাকে।
- ৭। সর্বোপরি কম সময়ে জলাশয় থেকে অধিক মাছ ও আর্থিক মূল্যায় পাওয়া সম্ভব হয়।

কাঞ্জ : শিক্ষার্থীরা সহজলভ্য করেকটি খাদ্য উপাদান সহজেই করবে এবং উপাদানের নাম খাতার লিখবে।

মাছের পুষ্টি চাহিদা ও সম্পূরক খাদ্য তালিকা

মাছের প্রজাতি, বয়স ও আকারের উপর ভিত্তি করে খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা বিভিন্ন হয়। প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন মাছের রেনু পোনার জন্য দেহের ওজনের ১০-২০%, আঙুলে পোনার জন্য ৫-১০% এবং বড় মাছের জন্য ৩-৫% হারে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। সুস্থ-সুবল মাছ ও এর দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধির জন্য মাছের খাবারে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান থাকা আবশ্যিক। এসব উপাদানের মধ্যে আমিষ বা প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যবহৃত। এটি খাবারে বেশি মাত্রায় প্রয়োজন। এজন্য মাছের পুষ্টি চাহিদা বলতে প্রধানত আমিষের চাহিদাকে বোঝায়। মাছের খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদান যেমন-শর্করা, তেল ও খনিজ লবণ কম-বেশি বিদ্যমান থাকে। এসব খাদ্যে আমিষের চাহিদা পূরণ হলে অন্যান্য পুষ্টি উপাদানগুলোর খুব একটা অভাব হয় না। খাদ্যে আমিষের এই চাহিদা প্রজাতি ও জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তর ভেদে কার্প বা রুই জাতীয় মাছের জন্য ২০-৩০%, চিংড়ির জন্য ৩০-৪৫% ও ক্যাটফিশ (অঁশ বিহীন লবণ তেজস্বু মাছ) বা মাঙ্গর জাতীয় মাছের জন্য ৩৫-৪৫% থাকে।

একটি পুরুরে সম্পূরক খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে যখন মাছ উৎপাদন করা হয় তখন এই খাদ্য কী পরিমাণ মাছ ধারা ব্যবহৃত হচ্ছে (মাছ ধারে) এবং তা থেকে কি পরিমাণ মাছ উৎপাদন হচ্ছে তা খাদ্য কৃপান্তর হার বা এফসিআর (Food conversion ratio, FCR) নির্ণয়ের মাধ্যমে হিসাব করা যায়। এভাবে একাধিক খাদ্যের FCR নির্ণয় করে তুলনা করলে কোন খাদ্য অধিক ভালো তা বোঝা যায়। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে খাদ্য কৃপান্তর হার বা এফসিআর হচ্ছে খাদ্য প্রয়োগ ও খাদ্য গ্রহণের ফলে জীবের দৈহিক বৃদ্ধির অনুপাত। অর্থাৎ ১ কেজি মাছ পেতে যত কেজি খাবার খাওয়াতে হয়, তাই খাদ্য কৃপান্তর হার।

$$FCR = \frac{\text{মাছকে প্রদানকৃত খাদ্য}}{\text{দৈহিক বৃদ্ধি}}$$

দৈহিক বৃদ্ধি = আহরণকালীন মোট ওজন - মুজুদকালীন মোট ওজন

ধরা যাক, একটি পুরুরে কিছু মাছের পোনা ছাড়া হলো যার মোট ওজন ১ কেজি। নিয়মিত খাদ্য প্রয়োগ করে ৬ মাস পর আহরণের সময় মোট ১৫ কেজি মাছ পাওয়া গেল। এ ৬ মাসে মোট ২১ কেজি খাদ্য প্রয়োগ করা হলো।

$$\text{সূত্রাং, FCR} = \frac{২১}{১৫ - ১} = ১.৫$$

FCR-এর মান সবসময় ১ এর চেয়ে বড় হয়। যে খাদ্যের FCR এর মান যত কম সে খাদ্যের গুণগত মান তত ভালো অর্থাৎ সে খাদ্য ব্যবহার করে অধিক মাছ উৎপাদন করা যায়।

কার্প বা কুই জাতীয় মাছ চাষের ক্ষেত্রে নিম্নের উপাদানগুলোর মিশ্রনে সুষম সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা যায়-

উপকরণের নাম	শতকরা হার (%)
ফিসমিল	১০-২১
সরিষার খৈল	৪৫-৫৩
চালের কুঁড়া	২৮-৩০
ভিটামিন ও খনিজ লবণ	০.৫-১.০
চিটাঙ্গড় ও আটা	৫
মোট	১০০

মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে ভালো মান সম্পর্ক নির্ধারিত খাদ্য উপাদানসমূহ সংগ্রহ করতে হবে। উপাদানসমূহ প্রয়োজনে আটা পেষা মেশিনে বা টেকিতে ভালো করে চূর্ণ বা কুঁড়া করে নিতে হবে এবং চালনি দিয়ে চেলে নিতে হবে। সূজ অনুষার্ধী খাদ্য উপাদানসমূহ একটি একটি করে মেশে নিয়ে মিঞ্জার মেশিনে বা একটি বড় পান্নো ভালোভাবে মেশাতে হবে। মেশানো উপাদানগুলোতে পানি দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে মণ তৈরি করতে হবে। এখন মণ ছোট ছোট বলের মতো তৈরি করে ভেজা বা আর্দ্র খাদ্য হিসাবে মাছকে দিতে হবে। মাছকে সরবরাহকৃত খাবার পানিতে বেশি স্থিতিশীল রাখার জন্য বাইভার হিসাবে আটা বা ময়দা বা চিটাঙ্গড় ব্যবহার করা যায়। ভেজা বা আর্দ্র খাবার প্রতিদিন প্রয়োগের পূর্বে পরিমাণমতো তৈরি করতে হবে।

আবার এই মণ দিয়ে সহজ পদ্ধতিতে বল্ল মূল্যে দেশীয় পিলেট মেশিনের সাহায্যে পিলেট বা দানাদার খাবার তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পিলেট বা দানাদার খাবার রোদে শকিয়ে নিতে হবে এবং পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য বায়ুরোধী প্রাণিক ব্যাগে সংরক্ষণ করতে হবে। খৈলে কিছু বিষাক্ত উপাদান থাকে, যা মাছের জন্য ক্ষতিকর। তাই খৈল একদিন পানিতে ভিজিয়ে রেখে ব্যবহার করতে হবে। খৈল ভেজানো পানি মাছের খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করা যাবে না। সুষম খাদ্য তৈরির জন্য নিবাচিত খাদ্য

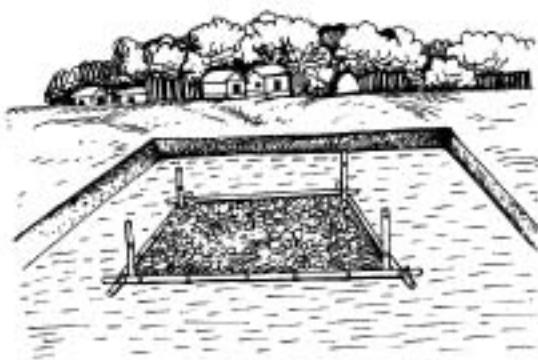
উপাদানের সাথে ০.৫-১% ডিটামিন ও খনিজ লবণের মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে। ডিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ কিনতে পাওয়া যায়।

মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি

- ১। মাছ দিনের বেলায় খাবার গ্রহণ করে। এজন্য চাষের পুরুরে দিনের প্রয়োজনীয় খাবার সমান দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগ সকালে এবং অন্য ভাগ বিকালে দিতে হবে। অন্যদিকে ঢিঁড়ি নৈশভোজী বলে এদেরকে সক্ষ্যায় বা রাতে খাবার দিতে হয়।
- ২। প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন মাছের রেশ পোনার জন্য দেহের ওজনের ১০-২০%, আঙুলে পোনার জন্য ৫-১০% এবং বড় মাছের জন্য ৩-৫% হারে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। পোনা মাছ চাষের ক্ষেত্রে স্থানে ১ বার এবং মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে ১৫ দিন বা মাসে ১ বার জাল টেনে কয়েকটি মাছের গড় ওজন নিয়ে পুরুরে সর্বমোট যতটি মাছ ছাড়া হয়েছিল তা দিয়ে তগ করলে পুরুরে ঘোট মাছের ওজন পাওয়া যাবে। এভাবে দৈহিক বৃক্ষির সাথে সমন্বয় করে খাবারের পরিমাণ ঠিক করে নিতে হবে।
- ৩। পুরুরে গ্রাসকার্প ও সরপুটি চাষ করা হলে এদেরকে খুদিপানা, কুটিপানা, সরুজ ঘাস, হেলেঝা, কচুরিপানার নরম অংশ ও বিভিন্ন উদ্ভিদের পাতা যেমন-বাঁধাকপি, পুইশাক, কলাপাতা কেটে পুরুরে সরবরাহ করতে হবে। এ উদ্ভিদে বাঁশের টুকরা বা গাছের ভালদিয়ে বর্গাকারের একটি ক্রেম তৈরি করতে হবে। ক্রেমটি একটি খুঁটির সাহায্যে পুরুরের পানিতে স্থাপন করতে হবে যেন এটি সবসময় একই স্থানে থাকে। এই ফিঙিং ক্রেম বা রিং-এ উপরোক্ত খাদ্য দিতে হবে। মাঝে মাঝে এটি পরিষ্কার করতে হবে।
- ৪। অকলো খাবার পানির উপরে ছিটিয়ে এবং আর্দ্র বা ভেজা খাবার পানির ৩০-৬০ সেমি. নিচে স্থাপিত খাদ্য দানি, ট্রে বা মাচায় প্রয়োগ করতে হবে। এতে খাদ্যের অপচয় কম হবে।
- ৫। প্রতিদিন নিমিট্ট সময়ে পুরুরের চারপাশে ৩-৪ টি নিমিট্ট স্থানে খাবার দিতে হবে। এতে করে খাদ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।
- ৬। শীতকালে মাছের বৃক্ষি কম হয় বলে খাদ্য প্রয়োগের হার স্বাভাবিকের চেয়ে অর্ধেক বা তিনভাগের একভাগ কমিয়ে আনতে হয়।
- ৭। পুরুর অত্যধিক সরুজ হয়ে গেলে খাবার প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।
- ৮। খাদ্য প্রয়োগের যথেষ্ট সময় পর খাবার থেকে গেলে বুঝতে হবে খাদ্যের পরিমাণ বেশি হয়েছে। সেক্ষেত্রে খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে।



চিত্র: খাদ্যদানি বা ট্রে



চিত্র: ফিডিং ক্রম/ রিং

কাজ : শিক্ষার্থীরা নিকটস্থ যে কোনো অঙ্গ খাবারে গিয়ে মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা এবং প্রয়োগ পদ্ধতি দেখবে। এর উপর প্রতিবেদন লিখে জয়া দিবে।

নতুন শব্দ : ব্লাট মিল, বোন মিল, স্রিস্প মিল, ফিডিং ক্রম/রিং, খাদ্যদানি, খাদ্যক্রপান্তর হার (FCR)

পশ্চপান্তির সম্পূরক খাদ্য

পশ্চপান্তির উৎপাদন দক্ষতা বৃক্ষের জন্য এদেরকে প্রচলিত খাবারের সাথে বিশেষ খাদ্য সরবরাহ করা হয়। এতে পশ্চপান্তির দ্রুত বৃক্ষ ঘটে এবং পশ্চ পরিপূর্ণ লাভ করে। পশ্চপান্তির মাস, ডিম ও দুধ উৎপাদন বৃক্ষ পায়। তাই পশ্চপান্তি পালনে সম্পূরক খাদ্যের অধিক গুরুত্ব রয়েছে।



চিত্র : ইউরিয়া মিশ্রিত পানি দ্বারা তেজা খড়



চিত্র : ইউরিয়া মিশ্রিত পানি খড়ে মেশানো হচ্ছে

বিভিন্ন সম্পূরক খাদ্য তৈরি ও প্রয়োগ পদ্ধতি-

ক) ইউরিয়া মোলাসেস খড় : ইউরিয়ার সাহায্যে খড় প্রক্রিয়াজাতকরণ-

উপকরণ

খড় : ২০ কেজি,
 ইউরিয়া : ১ কেজি,
 পানি : ২০ লিটার,
 একটি মাঝারি আকারের পাত্র, বস্তা ও মোটা পলিথিন।

তৈরির পদ্ধতি

- ১। প্রথমে একটি বালতিতে ১ কেজি ইউরিয়া ২০ লিটার পানিতে মিশিয়ে নিতে হবে।
- ২। ডোলের চারদিকে গোবর ও কাদা মিশিয়ে লেপে শকিয়ে নিতে হবে।
- ৩। এবার ডোলের মধ্যে অঙ্গ অঙ্গ খড় দিয়ে ইউরিয়া মেশানো পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।
- ৪। সমস্ত খড় সম্পূর্ণ পানি দ্বারা মিশিয়ে ডোলের মুখ বস্তা ও মোটা পলিথিন দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।
- ৫। দশ দিন পর খড় বের করে রোদে শকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি

- ১। একটি গুরুকে দৈনিক ২-৩ কেজি ইউরিয়া মেশানো খড় খাওয়াতে হবে।
- ২। খড়ের সাথে দৈনিক ৩০০ গ্রাম বোলাগুড় মিশিয়ে দিতে হবে।

খ) ইউরিয়া মোলাসেস ত্রুক : দানাদার খাদ্যের সাহায্যে ইউরিয়া মোলাসেস ত্রুক তৈরিকরণ-

উপকরণ

গমের ভূসি : ৩ কেজি
 বোলাগুড় : ৬ কেজি
 ইউরিয়া : ৯০ গ্রাম
 লবণ : ৩৫ গ্রাম
 খাবার চুল : ৫০০ গ্রাম
 ভিটামিন মিনারেল প্রিমিজ্ঞ : ৫০ গ্রাম এবং
 কাঠের ছাঁচ (১ কেজি ত্রুক তৈরির জন্য)



চিত্র : ইউরিয়া মোলাসেস ত্রুক তৈরির উপকরণ

তৈরির পদ্ধতি

- ১। প্রথমে একটি লোহার কড়াইতে সামান্য ভিটামিন মিনারেল মিশ্রণ বোলাগুড়সহ জ্বাল দিয়ে সামান্য ঘন করতে হবে।
- ২। কড়াই চুলা থেকে নামিয়ে এর মধ্যে ইউরিয়া, চুল, লবণ, গমের ভূসি যোগ করে ভালোভাবে মিশাতে হবে।

৩। এরপর ছাচের মধ্যে কিছু ভূসি ছিটিয়ে মিশ্রিত দ্রব্যগুলো তরে ব্লক তৈরি করতে হবে ।

৪। ব্লকগুলো শুকনো আলো বাতাসযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে ।

প্রয়োগ পদ্ধতি

১। একটি গরুকে দৈনিক ৩০০ শাম ব্লক জিহ্বা দিয়ে চেটে খেতে দিতে হবে ।

২। প্রথমে ব্লক জিহ্বা দিয়ে চেটে খেতে না চাইলে ব্লকের উপর কিছু ভূসি ও লবণ ছিটিয়ে দিতে হবে ।



চিত্র : ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক

গ) গবাদিপত্রকে অ্যালজি বা শেওলা খাওয়ানো

অ্যালজি: অ্যালজি বা শেওলা এক ধরনের উদ্ভিদ যা আকারে এককোষী থেকে বহুকোষী হতে পারে । তবে এখানে দুটি বিশেষ প্রজাতির এক কোষী অ্যালজির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে । এদের মধ্যে প্রধান হলো ক্লোরেলা । এরা সূর্যালোক, পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জৈব নাইট্রোজেন আহরণ করে সালোকসংশ্রেণ প্রক্রিয়ায় বেঁচে থাকে । এরা বাংলাদেশের মতো উষ্ণ জলবায়ুতে দ্রুত বর্ধনশীল ।

অ্যালজির পুষ্টিমান

অ্যালজি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পুষ্টিকর খাদ্য যা বিভিন্ন ধরনের আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন-খৈল, শুটকি মাছের হাঁড়া ইত্যাদির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হতে পারে । তৎক্ষণ অ্যালজিতে শতকরা ৫০-৭০ ভাগ আমিষ, ২০-২২ ভাগ চর্বি এবং ৮-২৬ ভাগ শর্করা থাকে । এছাড়াও অ্যালজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং বিভিন্ন ধরনের বি ভিটামিন থাকে । অ্যালজি পানি ব্যবহার করে কম খরচে গুরুর মাস এবং দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব ।

অ্যালজি চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ

অ্যালজির বীজ, কৃতিম অগভীর পুরু বা জলাধার, পরিষ্কার স্বচ্ছ পানি, মাসকলাই বা অন্যান্য ভালের ভূসি ও ইউরিয়া ।

অ্যালজির উৎপাদন পদ্ধতি

১। প্রথমে সমতল ও ছায়াযুক্ত জায়গায় একটি কৃতিম জলাধার তৈরি করতে হবে । জলাধারটি লম্বায় ৩ মিটার, চওড়ায় ১.২ মিটার এবং গভীরতায় ০.১৫ মিটার হতে পারে । এর পাড় ইট বা মাটির তৈরি হতে পারে । এবার ৩.৩৫ মিটার, ১.৫২ মিটার চওড়া একটি স্বচ্ছ পলিথিন বিছিয়ে কৃতিম জলাধারটির তলা ও পাড় ঢেকে দিতে হবে । তবে জলাধারটির আয়তন প্রয়োজন অনুসারে ছোট বা বড় হতে পারে । তাছাড়া মাটির বা সিমেন্টের চাঁড়িতে অ্যালজি চাষ করা যায় ।

- ২। এরপর ১০০ গ্রাম মাসকালাই বা অন্য ভালের ভূসিকে ১ লিটার পানিতে সারা রাত ভিজিয়ে কাপড় দিয়ে ছেকে পানিটুকু সংগ্রহ করতে হবে ।
- এভাবে একই ভূসিকে অন্তত তিনবার ব্যবহার করে পরবর্তীতে গরুকে খাওয়ানো যায় ।
- ৩। এবার কৃতিম পুরুরে ২০০ লিটার পরিমাণ কলের পরিষ্কার পানি, ১৫-২০ লিটার পরিমাণ অ্যালজির বীজ এবং মাসকালাই ভূসি ভেজানো পানি ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে । এরপর ২-৩ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া নিয়ে উক্ত পুরুরের পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে ।
- ৪। এরপর প্রতিদিন সকাল, দুপুর, বিকালে কমপক্ষে তিনবার উক্ত অ্যালজির পানিকে নেড়ে দিতে হবে । পানির পরিমাণ কমে গেলে নতুন করে পরিমাণ মতো পরিষ্কার পানি যোগ করতে হবে । প্রতি ৩/৪ দিন পর পর পুরুরে ১-২ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া ছিটালে ফলন ভালো হয় ।
- ৫। এভাবে উৎপাদনের ১২-১৫ দিনের মধ্যে অ্যালজির পানি গরুকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয় । এসময় অ্যালজির পানির রং গাঢ় সবুজ বর্ণের হয় । অ্যালজির পানিকে পুরুর থেকে সংগ্রহ করে সরাসরি গরুকে খাওয়ানো যায় । প্রতি ১০ বগ্রহিটার পুরুর থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫০ লিটার অ্যালজির পানি উৎপাদন করা সম্ভব ।
- ৬। একটি পুরুরের অ্যালজির পানি খাওয়ানোর পর উক্ত পুরুরে আগের নিয়ম অনুযায়ী পরিমাণ মতো পানি, সার এবং মাসকালাই ভূসি ভেজানো পানি দিয়ে নতুন করে অ্যালজি চাষ করু করা যায়, এ সময় নতুন করে অ্যালজি বীজ নিতে হয় না ।
- ৭। যখন অ্যালজি পুরুরে পানির রং স্বাভাবিক গাঢ় সবুজ রং থেকে বাদামি রং হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে যে উক্ত কালচারাটি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেছে । এ ক্ষেত্রে নতুন করে কালচার করু করতে হবে ।

খাওয়ানো পক্ষতি

- ১। সব বহুসের গরুকে অর্থাৎ বাচুর, বাড়ত গরু, দুধের বা গর্ভবতী গাড়ী, হালের বলদ সবাইকে সাধারণ পানির পরিবর্তে অ্যালজির পানি খাওয়ানো যায় ।
- ২। এ ক্ষেত্রে গরুকে আলাদা করে পানি খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই ।
- ৩। অ্যালজি পানি দানাদার খাদ্য অথবা খড়ের সাথে মিশিয়েও খাওয়ানো যায় ।
- ৪। অ্যালজির পানিকে গরম করে খাওয়ানো উচিত নয়, এতে অ্যালজির খাদ্যমান নষ্ট হতে পারে ।
- ৫। খামারের ৫টি গরুর জন্য ৫টি কৃতিম পুরুরে অ্যালজি চাষ করতে হয় যাতে একটির অ্যালজির পানি শেষ হলে পরবর্তীটি খাওয়ানোর উপযুক্ত হয় ।

ঘ) বাজারে তৈরি সম্পূরক খাদ্য : পশ্চপাখির উৎপাদন চলমান রাখার জন্য এদেরকে বাজারে তৈরি বিভিন্ন সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে ।

১. আমিষ সম্পূরক খাদ্য - যেমন, প্রোটিন কলসেলট্রেট
২. খনিজ সম্পূরক - ভিটামিন ও খনিজ প্রিমিক্স
৩. খাদ্যপ্রাণ সম্পূরক - ভিটামিন ও খনিজ প্রিমিক্স ।

৬) বাচ্চরের সম্পূরক খাদ্য তালিকা-

মিল্ক রিপ্লেসার (Milk Replacer) : বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি এক ধরনের ভরল পদ্ধতিয়ে ঘাতে দুধের উপাদান থাকে এবং বাচ্চরের জন্য দুধের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। এতে ২০% আমিষ ও ১০% এর অধিক চর্বি থাকে। এর উপাদানসমূহকে গরম ক্রিম মিল্কে বা পানিতে মিশ্রিত করা হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি : বাচ্চরের বয়স অনুসারে দৈনিক ০.৫ থেকে ৩ লিটার পর্যন্ত খাওয়ানো যায়।

মিল্ক রিপ্লেসার (Milk Replacer) তৈরির একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো-

ক্রমিক	উপকরণ	রেশন-১ (%)	রেশন-২ (%)
১	ক্রিম মিল্ক	৬৫	-
২	ক্রিম মিল্ক পাউডার	-	৬
৩	পানি	-	৬০
৪	ড্রিঙ্ক তেল	২০	২০
৫	ছানার দূধ	১০	৯
৬	ভিটামিন ও খনিজ প্রিমিয়া	০৫	০৫
	মোট	১০০	১০০

কাফ স্টার্টার (Calf Starter) : বাচ্চরের খাবার উপযোগী বিশেষ দানাদার খাদ্য মিশ্রণ ঘাতে ২০% এর অধিক পরিপাচ্য আমিষ ও ১০% এর কম আঁশমুক্ত খাদ্য থাকে। কাফ স্টার্টারের একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো-

ক্রমিক	উপকরণ	পরিমাণ (%)
১	তুলাৰ্বীজ	৩৮
২	ভূট্টা	৩০
৩	মুখ	১০
৪	ছানার ঝঁঢ়া	১০
৫	গমের ভূসি	১০
৬	হাড়ের ঝঁঢ়া	১
৭	খাদ্য লবণ	১
	মোট	১০০

কাজ : শিক্ষার্থীরা গবাদিপত্র বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের তালিকা তৈরি করবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি : বাচ্চরের বয়স অনুসারে দৈনিক ০.৫ থেকে ৩ কেজি পর্যন্ত খাওয়ানো যায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন ধরণের মাটিতে আলু উৎপাদন বেশি হয় ?

- | | |
|----------------|----------------------------|
| ক. দোআশ মাটিতে | খ. বেলে দোআশ মাটিতে |
| গ. পলি মাটিতে | ঘ. দোআশ ও বেলে দোআশ মাটিতে |

২. উদ্ভিদভোজী মাছ কোনটি ?

- | | |
|--------------|-----------|
| ক. বুই | খ. মৃগেল |
| গ. তেলাপিয়া | ঘ. সরপুটি |

৩. বীজের বন্ধায় পোকার উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য মেশানো হয় -

- নিম্নের পাতার গঁড়া
- আপেলের বীজের গঁড়া
- কমলার বীজের গঁড়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উচ্চীপক্ষটি পড় ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

তাসফি নদীর ধারের একটি জমিতে আলুর চাষ করে আসছিলেন। প্রথম দিকে তার জমি থেকে আশানুরূপ ফলন পেলেও বর্তমানে তার জমির ফলন কমে যাচ্ছে। তিনি এ বিষয়ে কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করেন। কৃষি কর্মকর্তা তাকে জমির ঢালু অংশে ভালোভাবে আইল তৈরির পরামর্শ দেন।

৪. তাসফির জমির ফলন কমে যাওয়ার কারণ -

- i. জমির উর্বরতা হ্রাস
- ii. জৈব পদার্থের অভাব
- iii. মাটির অনুমত গঠন।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৫. কৃষি কর্মকর্তা তাসফিকে জমিতে আল তৈরির পরামর্শ দেওয়ার কারণ কোনটি ?

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| ক. জমির উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ | খ. জমির ভূমিক্ষয় রোধ |
| গ. ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি | ঘ. মাটির গঠনের উন্নয়ন। |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. সফিক সাহেব তার বহু রফিকের জমিতে উন্নত জাতের নতুন গম দেখে চাষ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরবর্তী মৌসুমে চাষের জন্য তিনি তার বহুর নিকট থেকে বীজ সংগ্রহ করলেন। বীজগুলোর আর্দ্রতা পরীক্ষা করার জন্য ১০০ গ্রাম বীজ নিয়ে বীজের সম্পূর্ণ আর্দ্রতা বের করে ওজন নিয়ে ৯০ গ্রাম ওজন পেলেন। এরপর অঙ্কুরোদগম ও সতেজতা পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট চিঠি গমের আবাদ করে কাঞ্চিত ফলন পান।

- ক. মাটি কাকে বলে?
- খ. FCR এর মান যত কম খাদ্যের গুণগত মান তত ভালো ব্যাখ্যা কর।
- গ. সফিক সাহেবের পরীক্ষিত বীজের আর্দ্রতার হার নির্ণয় কর।
- ঘ. সফিক সাহেব এর বীজ পরীক্ষার কার্যক্রমটি মূল্যায়ন কর।

২. রিতা পাল মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হয়ে নিজ পুরুরে মাছ চাষ শুরু করলেন। তিনি সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত করে পুরুরে যথোন্নতভাবে প্রয়োগ করেন এবং মাছের উৎপাদন বাড়াতে সফল হন। তার সফলতা দেখে এলাকার অন্য চাষিদ্বা নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করলেন।

ক. সম্পূরক খাদ্য কাকে বলে?

খ. মাছ চাষে প্রাকৃতিক খাদ্য যথেষ্ট নয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. রিতা পালের সফলতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. এলাকার অন্য মাছ চাষিদের গৃহীত কার্যক্রম মূল্যায়ন কর।

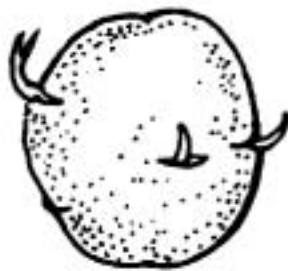
ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

କୃଷି ଉପକରଣ

ଫସଳ ଫଳାନୋର ଜନ୍ୟ ପ୍ରୋଜନ୍ନୀୟ ମୌଳିକ ଉପାଦାନଙ୍ଗଲୋର ମଧ୍ୟେ ସବଚେଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଲୋ ଫସଳ ବୀଜ ଓ ବଂଶବିନ୍ଦୁରକ ଉପକରଣ । ଏଦେର ବ୍ୟବହାରେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଆମରା ସେମନ ବଜରେର ପର ବହର ଫସଳ ଉଥପାଦନ କରାତେ ପାରି, ତେମନି ଏକଟି ଦେଶେ ନତୁନ ଫସଳ ଆନ୍ତିକରଣ ଓ ସଂଯୋଜନ କରାତେ ପାରି, ଏକଟି ଫସଳେର ଜୀବତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ଥରେ ବାଖତେ ପାରି ଏବଂ ନାନା ଜୀବ କୌଶଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଉପରିତତର କରେ ତୁଳାତେ ପାରି ।



ଚିତ୍ର : ଧନ ବୀଜ



ଚିତ୍ର : ଆଲୁ ବୀଜ

ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ ଶେଷେ ଆମରା—

- ଫସଳ ବୀଜ ଓ ବଂଶବିନ୍ଦୁରକ ଉପକରଣ ଓ ଧାପଙ୍ଗଲୋ ସମ୍ପର୍କେ ବର୍ଣନା କରାତେ ପାରିବ ।
- ଫସଳ ବୀଜ ଓ ବଂଶବିନ୍ଦୁରକ ଉପକରଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାତେ ପାରିବ ।
- ମାଛେର ପୁକୁରେର ସର୍ଜପ ଓ ପୁକୁର ପ୍ରକଟିତର ଧାପଙ୍ଗଲୋ ବର୍ଣନା କରାତେ ପାରିବ ।
- ମାଛେର ପୁକୁର ପ୍ରକଟିତର ପ୍ରୋଜନ୍ନୀୟତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାତେ ପାରିବ ।
- ପୁକୁରେର ବିଭିନ୍ନ ତରେର ବର୍ଣନା ଓ ବାନ୍ଧସଂହାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାତେ ପାରିବ ।
- ଛାଯා ମୌସୁମୀ ଓ ଆନ୍ତର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୁକୁର ବର୍ଣନା ଏବଂ ଏର ପ୍ରୋଜନ୍ନୀୟତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାତେ ପାରିବ ।
- ମାଛେର ଅଭ୍ୟାଶମେର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାତେ ପାରିବ ।
- ମାଛେର ଆବାସଙ୍କଳ ରକ୍ଷାଯ ମଧ୍ୟେ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନେର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାତେ ପାରିବ ।
- ଗୃହପାଲିତ ପାଖିର ଆବାସନ ସର୍ଜପ ଏବଂ ଆବାସନ ତୈରିର ଧାପଙ୍ଗଲୋ ବର୍ଣନା କରାତେ ପାରିବ ।
- ଗୃହପାଲିତ ପାଖିର ଆବାସନ ତୈରିର ପ୍ରୋଜନ୍ନୀୟତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାତେ ପାରିବ ।
- ଗୃହପାଲିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାତେ ପାରିବ ।
- ଗ୍ରାନିପତ୍ର ଖାଦ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାତେ ପାରିବ ।

প্রথম পরিচেদ

ফসল বীজ ও বৎশ বিস্তারক উপকরণ

বীজ উত্তিদের বৎশবিস্তারের প্রধান মাধ্যম। সাধারণভাবে উত্তিদ জন্মানোর জন্য যে অংশ ব্যবহার করা হয় তাকে বীজ বলে। বীজ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে আমরা বীজকে দুইভাবে বুঝতে পারি। যথা-

ক) উত্তিদত্ত্ব অনুসারে, উত্তিদের নিষিক ও পরিপন্থ ভিত্তিকে বীজ বলে। এ ধরনের বীজকে ফসল বীজ বা প্রকৃত বীজ বা উত্তিদত্ত্বিক বীজও বলে। যেমন:- ধান, গম, সরিষা, তিল, শিম, বরবটি, টমেটো, ফুলকপি, মরিচ, জিরা, ধৈঢ়া, জাম, কঁঠাল ইত্যাদি।

খ) কৃষিতত্ত্ব অনুসারে উত্তিদের যে কোনো অংশ (মূল, পাতা, কাণ, কুঁড়ি, শাখা) যা উপযুক্ত পরিবেশে একই জাতের নতুন উত্তিদের জন্ম দিতে পারে, তাকে বৎশবিস্তারক উপকরণ বলে। এ ধরনের উপকরণকে কৃষিতাত্ত্বিক বীজ বা অঙ্গ বীজও বলা হয়। যেমন : আমের কলম, আলুর কন্দ, মিষ্টি আলুর লতা, আখের কাণ, পাথরকুচি পাছের পাতা, কাকরোলের মূল, গোলাপের ডাল ও কুঁড়ি, আনারসের মুকুট, কলাগাছের সাকার, আদা, হলুদ, রসুন, কচু ও সকল উত্তিদত্ত্বিক বীজ।

কাজেই দেখা যায় সকল উত্তিদত্ত্বিক বীজ কৃষিতাত্ত্বিক বীজের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সকল কৃষিতাত্ত্বিক বীজ উত্তিদত্ত্বিক বীজের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ধান, গম, মূলা, মরিচ ফসলের এবং আলু, আদা, গাঁদা ফুল ও মেহেন্দীর কাণ
ইত্যাদি সংগ্রহ করবে এবং শ্রেণিকক্ষে দলীয়ভাবে জমা দিবে।

ফসল বীজ উৎপাদনের ধাপসমূহ

বীজ উৎপাদন একটি জটিল প্রক্রিয়া। উন্নতমানের বীজ পেতে হলে যথাযথ নিরাম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে বীজ উৎপাদন করতে হবে। ফসল উৎপাদনের জন্য যে সব ধাপ অতিক্রম করা হয় বীজ উৎপাদনের জন্যও সেভাবেই অগ্রসর হতে হবে। পার্থক্য হলো এই যে, বিভিন্ন ফসলের বীজ যেমন- ধান, পাট, গম, মূলা, মরিচ ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপসমূহের বিশেষ যত্নবান হতে হয় :

- ১। **বীজ জমি নির্বাচন :** বীজ উৎপাদনের জন্য উর্বর জমি নির্বাচন করা উচিত। জমি অবশ্যই আগাছামুক্ত ও আলোবাতাসযুক্ত হতে হবে। নির্বাচিত জমিতে পূর্ববর্তী বছরে একই জাতের বীজের চাষ না হয়ে থাকলে আরও ভালো। নির্বাচিত জমিতে অন্তত ২% জৈব পদার্থ থাকা উচিত।
- ২। **বীজ জমি পৃথক্কীকরণ :** বীজ উৎপাদনের জন্য নির্বাচিত জমি ও পার্ববর্তী একই ফসলের জমির মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধান থাকতে হবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কাঞ্চিত শস্য বীজের সাথে যেন অন্য জাতের বীজের সংমিশ্রণ না ঘটে।
- ৩। **বীজ সংগ্রহ :** বীজ সংগ্রহ বীজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। বীজ উৎপাদনের জন্য অবশ্যই প্রত্যায়িত বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বীজ সংগ্রহের সময় নিরোক্ত তথ্য জেনে নিতে হবে।

- ক) জাতের নাম
গ) অন্য জাতের বীজের শতকরা হার
ঙ) বীজের আর্দ্রতা
- খ) বীজ উৎপাদনকারীর নাম ও নথর
ঘ) বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা
চ) বীজ পরীক্ষার তারিখ।

উল্লিখিত তথ্যগুলো একটি গ্যারান্টি পত্রে ট্যাগ লিখে বীজের বস্তায় বা প্যাকেটে রাখা হয়।

- ৪। **বীজের হার নির্ধারণ :** বীজের বিত্তকতা, সজীবতা, অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, আকার, বপনের সময়, মাটির উর্বরতা শক্তি এসব বিবেচনা করে হেঁটের প্রতি বীজের হার নির্ধারণ করা হয়।
- ৫। **নির্বাচিত জমি প্রস্তুতকরণ :** এক এক জাতের বীজের জন্য জমির প্রস্তুতি এক এক রকম হয়ে থাকে। যেমন, রোপা ধানের বীজ উৎপাদন করতে জমি ভালোভাবে কর্দমাঙ্গ করে চাষ করতে হবে। আবার গমের বেলায় জমি শুকনো অবস্থায় ৪-৫ বার চাষ করে পরিপাণি করতে হবে। সার প্রয়োগের মাঝাও এক এক বীজের জন্য এক এক রকম হবে।
- ৬। **বীজ বপন :** নির্বাচিত ফসলের বীজ উপযুক্ত সারিতে বপন করতে হবে। বীজতলায় প্রতিটি বীজ সমান গভীরতায় বপন করা উচিত। কোন বীজ কত গভীরতায় বপন করতে হবে তা বীজের আকার, আর্দ্রতা ও মাটির উপর নির্ভর করে।
- ৭। **রোগিং বা বাছাইকরণ :** বীজ বপনের সময় যতই বিত্তক বীজ ব্যবহার করা হোক না কেন জমিতে কিছু কিছু অন্য জাতের উদ্ভিদ ও আগাছা দেখা যাবে। অনাকাঙ্ক্ষিক উদ্ভিদ তুলে ফেলতে হবে। তিনি পর্যায়ে রোগিং বা বাছাই করা হয়।
- ৮। **ক**। ফুল আসার আগে খ। ফুল আসার সময় গ। পরিপন্থ পর্যায়ে।
- ৯। **পরিচর্যা :** বীজের উৎপাদনের জন্য খুব বেশি পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। নিচে কয়েকটি পরিচর্যার ধরন উল্লেখ করা হলো।
- ক) সুষম মাঝায় সার প্রয়োগ করা খ) জৈব সার প্রয়োগ
গ) প্রয়োজনমতো সেচ দেওয়া ঘ) বৃষ্টির পানি বা সেচের পানি জমলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা
ঙ) আগাছা পরিষ্কার করা চ) রোগ ও পোকা দমন করা
ছ) সারের উপরি প্রয়োগ করা।
- ১০। **বীজ সঞ্চাহ :** বীজ পরিপন্থ হওয়ার পর পরই কাটতে হবে। তারপর মাড়াই করে ঘেড়ে পরিষ্কার করতে হবে।

বংশবিস্তারক উপকরণ উৎপাদনের ধাপসমূহ

বাল্মীদেশে ফুল ও ফলের চারা অঙ্গ পক্ষতিতে উৎপাদনের প্রচলন খুব বেশি। কারণ এসব গাছের বংশবিস্তার প্রকৃত বীজের মাধ্যমে হলে ফুল ফল পেতে সময় বেশি লাগে ও মাতৃগাছের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। এ ছাড়া অনেক ফসলের প্রকৃত বীজ দ্বারা বংশবিস্তার ঘটানোও সম্ভব নয়। অঙ্গ পক্ষতিতে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, শাখা প্রভৃতি দ্বারা দ্রুত ও অঙ্গসময়ে চারা উৎপাদন সম্ভব। তাই এগুলো হলো ফসলের বংশবিস্তারক উপকরণ। কিছু কিছু ফসল যেমন- আলারস, কলা, আলু, আদা, হলুদ প্রভৃতির বংশবিস্তারক উৎপাদন সরাসরি রোগণ করা যায়। আবার কিছু ফসল যেমন- আম, লেবু, লিচু, জামুরুল, গোলাপ ইত্যাদির বংশবিস্তারক উৎপাদন বিভিন্ন ধরনের কলম তৈরির মাধ্যমে প্রস্তুত করে ব্যবহার করা হয়। নিম্নে

বৎসরিক উপকরণ তথা কৃষিতাত্ত্বিক বীজ হিসাবে বীজ আলু উৎপাদনের ধাপসমূহ উল্লেখ করা হলো:

বীজ আলু উৎপাদন পদ্ধতি

জমি নির্বাচন ও তৈরি: বীজ আলুর ভালো ফলন পাওয়ার জন্য সুনিকাশিত বেলে দোআশ মাটি সর্বোত্তম। নির্বাচিত জমি অন্যান্য ফসল যেমন- মরিচ, টমেটো, তামাক ইত্যাদি সোলানেসি গোত্রভূক্ত ক্ষেত্র থেকে অন্তত ৩০ মিটার দূরে থাকতে হয়। ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরা করে আগাছা মুক্ত করতে হবে। চাষ অন্তত ১৫ সেমি. গভীর হতে হবে। মাটি বেশি শকনো হলে প্লাবন সেচ দিয়ে মাটিতে 'জো' আসার পর আলু লাগাতে হবে।

বীজ শোধন : হিমাগরে রাখার আগে বীজ শোধন না হয়ে থাকলে অঙ্কুর গজানোর পূর্বে বীজ আলু বরিক এসিড দিয়ে শোধন করে নিতে হবে (১ লি. পানি + ৩০ গ্রাম বরিক পাউডার মিশিয়ে বীজ আলু ১৫-২০ মিনিট ডুরিয়ে পরে ছায়ায় শকাতে হবে)।

বীজ অঙ্কুর : বীজ আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রে আন্ত আলু বপন করা ভালো, কারণ আন্ত বীজ রোপনের পর এন্ডোর রোগান্ত হওয়ার আশঙ্কা কম। আলু কেটে লাগালে প্রতি কর্তৃত অংশে অন্তত ২ টি চোখ অবশ্যই রাখতে হবে। আলু কাটার সময় বারবার সাবান পানি দ্বারা ছুরি বা বটি পরিষ্কার করা উচিত যাতে রোগ জীবাণু এক বীজ থেকে অন্য বীজে না ছড়ায়। বীজ আলু আড়াআড়িভাবে না কেটে লধালভিভাবে কাটতে হবে।

মাটিতে উষ্ণ প্রয়োগ : ব্যাকটেরিয়া জনিত চলে পড়া রোগ প্রতিরোধের জন্য শেষ চাষের পূর্বে প্রতি শতাংশ জমিতে ৮০ গ্রাম স্টেবল রিচিং পাউডার বা ক্লোরোপিস্কিন মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া উত্তম।

সার প্রয়োগ : দুটি কারণে আলুতে সুষম সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যিক। প্রথমত: সুষম সার প্রয়োগ করলে আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদিত বীজ আলুর গুণগত মান ভালো হয়। দ্বিতীয়ত: গাছে কোনো ঘাদেয়ৎপাদনের অভাবজনিত লক্ষণ সৃষ্টি হলে ভাইরাস রোগের উপস্থিতি নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে আলু চাষের জন্য নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। শেষ চাষের সময় অর্ধেক ইউরিয়া এবং সবৃকু গোবর, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, জিঙ্ক সালফেট, বরিক পাউডার জমিতে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকি ইউরিয়া রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়ার সময় প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে।

সারের নাম	প্রতি শতাংশে
পচা গোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১৪০০ গ্রাম
টিএসপি	৯০০ গ্রাম
এমওপি	১০৬০ গ্রাম
বরিক পাউডার/ বোরন সার	২৫ গ্রাম
জিঙ্কসালফেট	৫০ গ্রাম
জিপসাম	৫০০ গ্রাম
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	-

বীজ হার ও রোপণ সময় : বীজহার নির্ভর করে রোপণ দূরত্ব ও বীজের আকারের উপর। সাধারণত প্রতি হেক্টেরে ১.৫ থেকে ২ টন বীজ আলুর প্রয়োজন (একরে ৬০০-৮০০ কেজি)।

রোপণ দূরত্ব

দূরত্ব	আন্ত আলুর ক্ষেত্রে	কাটা আলুর ক্ষেত্রে
লাইন থেকে লাইন দূরত্ব	৬০ সেমি	৬০ সেমি
বীজ থেকে বীজ দূরত্ব	২৫ সেমি	১০-১৫ সেমি

সেচ ব্যবস্থাপনা : মাটির অর্দ্ধতার উপর ভিত্তি করে ২-৪ টি সেচ প্রদান করা উচিত। জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে বীজ আলুর অঙ্গুরোদগমের জন্য হালকা সেচ দেওয়া যেতে পারে, তবে সেচ বেশি হলে বীজ পচে যাবে। রোপনের ৩০-৩৫ দিন পর ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে কারণ ৩০ দিনের মধ্যে স্টোলন বের হতে শুরু করে। সাধারণত কেইলের ২/৩ ভাগ পানি ঘারা ভিজিয়ে দিতে হবে।

আগাছা দমন : রোপনের পর থেকে ৬০ দিন পর্যন্ত আগাছা পরিকার রাখতে হবে। সাধারণত গাছ ছেট অবস্থায় থাকাকালীন আগাছা যথাসম্ভব দমন করে রাখতে হবে। এছাড়া বস্তুয়া জাতের আগাছা যা ভাইরাস রোগের বিকল্প বাহক হিসাবে কাজ করে তা অবশ্যই নির্মূল করে ফেলতে হবে।

মাটি উঠিয়ে দেওয়া : ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করে সেচ দেওয়ার পর মাটিতে 'জো' আসলে ভেলি বরাবর মাটি উঠিয়ে দিতে হবে। পরবর্তীকালে প্রয়োজনবোধে আরও এক বার এমনভাবে ভেলি বরাবর মাটি উঠিয়ে দিতে হবে যাতে আলু বাহিরে না যায় এবং স্টোলন ও আলু মাটির ভিতরে থাকে।

রোগিং : চারা গজানোর পর থেকে রোগিং শুরু করতে হবে। রোগাক্ষত গাছ শিকড়সহ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

রোগবালাই ও পোকা দমন

(ক) আলুর রোগ : আলুর রোগসমূহের মধ্যে মড়ক রোগ, ব্যাটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ, দাঁদ রোগ, কাও পচা রোগ, ভাইরাসজনিত রোগ অন্যতম। নিম্ন তাপমাত্রা, কুয়াশাজন্ম আবহাওয়া ও মেঘলা আকাশ আলুর জন্য ক্ষতিকর। এতে আলুর মড়ক রোগ (লেইট ব্রাইট) আক্রমণ বেশি দেখা যায়। আলু ফসলকে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য স্পর্শক (কন্টাক্ট) জাতীয় ছারাকনাশক নিয়মানুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে।

(খ) কাটাই পোকা : এ পোকার কীড়া আলুর প্রধান ক্ষতিকর পোকা। এরা গাছ কেটে দেয় এবং আলু আক্রমণ করে।

- ◆ শুরু সকালে যে সব গাছ কাটা পাওয়া যায় সেগুলোর গোড়ার মাটি সরিয়ে পোকার কীড়া বের করে মারতে হবে।
- ◆ আক্রমণ তীব্র হলে অনুযোদিত মাঝায় কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

(গ) জাব পোকা : জাব পোকা গাছের রস থায় এবং ভাইরাস রোগ ছড়ায়। বীজ আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রে জাব পোকা দমন অত্যন্ত জরুরি। এজন্য গাছের পাতা গজানোর পর থেকে ৭-১০ দিন পর পর জাব পোকা দমনের জন্য অনুযোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। জাব পোকার আক্রমণ এভাবে ৭০-৮০ দিনের মধ্যেই আলু সঞ্চাহ করা উচ্চ।

ফসল সঞ্চাহ এবং পরিচর্যা : আধুনিক জাতে পরিপূর্ণ আসতে ৮৫-৯০ দিন সময় লাগে। তবে বীজ আলুতে সঞ্চাহের অন্তত ১০ দিন আগে সেচ দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

(ক) হাম পুলিং : মাটির উপরের গাছের সম্পূর্ণ অংশকে উপরে ফেলাকে হাম পুলিং বলে। আলু সঞ্চাহের ৭-১০ দিন পূর্বে হাম পুলিং করতে হবে। এতে সম্পূর্ণ শিকড়সহ গাছ উপরে আসবে কিন্তু আলু মাটির নিচের থেকে যাবে। হাম পুলিং এর ফলে আলুর তুক শক্ত হয়, রোগাত্মক গাছ থেকে রোগ বিন্দুর কম হয় ও আলুর সংরক্ষণ বৃদ্ধি পায়। বীজ আলুতে অবশ্যাই হাম পুলিং করতে হবে, তবে খাবার আলুর বেলায় হাম পুলিং জরুরি নয়।

(খ) আলু উত্তোলন : আলু উত্তোলনের পর পরই বাড়িতে নিয়ে আসা উক্তম। আলু তোলার পর কোনো অবস্থাতেই ক্ষেত্রে ত্বকপাকারে রাখা যাবে না, কারণ ক্ষেত্রে আলু খোলা রাখলে তা বিভিন্ন প্রকার রোগ ও পোকা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে (যেমন-সুতলি পোকা ডিম পাঢ়তে পারে)।

(গ) আলু সংরক্ষণ : আলু উত্তোলনের পর বাড়িতে এনে সাথে সাথে কাটা, দাগি ও পচা আলু আলাদা করে বেছে ফেলতে হবে। তারপর ৭-১০ দিন মেরেতে আলু বিছিয়ে রাখতে হবে। অতঃপর আবারও দাগি ও পচা আলু বেছে বাদ দিয়ে ভালো আলু বস্তার ভরে হিমাগারে পাঠাতে হবে।

এছাড়া বীজ আলু উৎপাদনের আরও কয়েকটি পদ্ধতি আছে। যেমন-

- (ক) টিস্যু কালচার পদ্ধতি
- (খ) স্প্রাউট ও টপ শট কাটিং পদ্ধতি
- (গ) বিনাচারে বীজ আলু উৎপাদন
- (ঘ) আলুর প্রকৃত বীজ উৎপাদন।

ফসল বীজের ক্ষুব্ধ : ফসল উৎপাদনে ফসল বীজ ক্ষুব্ধ ক্ষুব্ধপূর্ণ। যে সব ফসল কেবল বীজের মাধ্যমেই ফসলে সম্ভব সে ক্ষেত্রে উত্তিদের বংশরক্ষার্থে ফসল বীজের বিকল্প নেই। এছাড়াও-

- ১। ফসল বীজ ফসল উৎপাদনের মৌলিক উপকরণ।
- ২। ফসল বীজ মানুষসহ পত পাথির খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- ৩। বিশুদ্ধ ফসল বীজ রোগ, পোকামাকড় ও আগাছা বিন্দুর রোধ করে।
- ৪। ফসল বীজের মাধ্যমে উন্নত জাতের ফসল উৎপাদন সম্ভব।
- ৫। ফসল বীজের মাধ্যমে উত্তিদের বংশধারা টিকে থাকে।
- ৬। কোনো কোনো বীজ শৈথিল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- ৭। ফসল বীজ অনেক শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বংশবিন্দুর উপকরণের ক্ষুব্ধ : অধিকাংশ ফসলের বংশবিন্দুর বীজ দ্বারা সম্ভব হয় না বা সম্ভব হলেও দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে ফলন পাওয়া যায়। কাজেই জনবহুল কোনো দেশের জন্য ফসল দ্রুত পাওয়ার জন্য বংশবিন্দুর উপকরণ তথা কৃষিতাত্ত্বিক বীজের বিকল্প নেই। এতে উত্তিদের মূল, কাঞ্চ, শাখা, পাতা, শিকড়, কুঁড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে বংশবিন্দুর করা হয় বলে মাত্রণাশণ বজায় থাকে। একই গাছে একাধিক জাতের সংযোজন ঘটানো যায়। যেমন : মিষ্টি ও টক কুল একই গাছে এবং লাল, হলুদ, কালো ও সাদা ফুল একই গোলাপ গাছে ফোটানো সম্ভব। এছাড়াও এ উপকরণ ব্যবহার করে বীজবাহিত রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অঙ্গ সময়ে ও কম ধরচে সহজে ফুল, ফল পাওয়া যায়। কাজেই এটি ক্ষুব্ধ ক্ষুব্ধপূর্ণ।

কাঞ্চ : শিক্ষার্থীরা কৃষি উৎপাদনে ফসল বীজ সঞ্চাহ করবে এবং বীজের বর্ণনা খাতায় লিখবে।

দ্বিতীয় পরিচেহন

মাছের পুরুর

পুরুর হচ্ছে ছোট ও অগভীর বক্ষ জলাশয়, যেখানে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে মাছ চাষ করা যায় এবং প্রয়োজনে এটিকে সহজেই সম্পূর্ণভাবে তুকিয়ে ফেলা যায়। এক কথায় পুরুর হচ্ছে চাষযোগ্য মাছের বাসস্থান। পুরুরে পানি স্থির অবস্থায় থাকে। তবে বাতাসের প্রভাবে এতে অল্প ঢেউ সৃষ্টি হতে পারে। পুরুরের আয়তন কয়েক শতাংশ থেকে কয়েক একর হতে পারে। তবে ছোট ও মাঝারি আকারের পুরুর ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুবিধাজনক এবং এই ধরনের পুরুর অধিকতর উৎপাদনশীল হয়।

আদর্শ পুরুরের বৈশিষ্ট্য

মাছ চাষের পুরুরের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার যা চাষ প্রতিক্রিয়াকে লাভজনক করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। একটি আদর্শ মাছ চাষের পুরুরের নিয়মিতিশীল বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা প্রয়োজন-

- ১। পুরুরটি বন্যামুক্ত হবে। এজন্য পুরুরের পাড় যথেষ্ট উঁচু হতে হবে।
- ২। পুরুরের মাটি দোআশ, পলি- দোআশ বা এঁটেল- দোআশ হলে সবচেয়ে ভালো।
- ৩। সারা বছর পানি থাকে এমন পুরুর চাষের জন্য অধিক উপযুক্ত।
- ৪। পুরুরের পানির গভীরতা ০.৭৫-২ মিটার সুবিধাজনক।
- ৫। পুরুরটি খোলামেলা স্থানে হলে ভালো হয় এবং পাড়ে কোনো বড় গাছপালা না লাগালে ভালো হয়। এতে পুরুর প্রচুর আলো-বাতাস পাবে। ফলে পুরুরে সালোকসংশ্রেণ বেশি হবে ও মাছের খাদ্য বেশি তৈরি হবে। পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন মিশবে। উত্তর-দক্ষিণমুখী পুরুর সূর্যালোক বেশি পাবে।
- ৬। পুরুরের তলায় অতিরিক্ত কাদা থাকা উচিত নয়। তলার কাদার পুরুত্ব ২০-২৫ সেমি. এর বেশি ইওয়া ঠিক নয়।
- ৭। চাষের পুরুরের আয়তন ২০-২৫ শতক হলে ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। পুরুরের আকৃতি আয়তাকার হলে ভালো। এতে করে জাল টেনে মাছ আহরণ করা সহজ হয়।
- ৮। পুরুরের পাড়গুলো ১:২ হারে ঢালু হলে সবচেয়ে ভালো। অর্ধাংশ পুরুরের তলা হতে পুরুরের পাড় যতটুকু উঁচু হবে পাড় ঢালু হয়ে পুরুরের তলার দিকে বিগুণ দূরত্বে পিঙে মিশবে।

মাছ চাষের পুরুরের পানির গুণাগুণ

মাছের বেঁচে থাকা, খাদ্যগ্রহণ ও আশানুরূপ বৃক্ষির জন্য পুরুরের পানির গুণাগুণ অনুকূল মাঝায় থাকা দরকার। পুরুরে পানির গুণাগুণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১) ভৌত গুণাগুণ ২) রাসায়নিক গুণাগুণ। মাছ চাষে এদের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

১। জৌত ক্ষণান্তর

- ক) গভীরতা: পুরুর বেশি গভীর হলে সূর্যের আলো পুরুরের অধিক গভীরতা পর্যন্ত পৌছাতে পারে না। ফলে অধিক গভীর অঞ্চলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্রাইটেন তৈরি হয় না। আবার সেখানে অঙ্গীজেনের অভাব হতে পারে। অন্যদিকে পুরুর অগভীর হলে শীতকালে পুরুরের পানি অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়। এসব কারণে মাছের ক্ষতি হতে পারে ও উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।
- খ) তাপমাত্রা: তাপমাত্রার বৃদ্ধির উপর মাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে। ঘেরন- শীতকালে আছ খাদ্য গ্রহণ করিয়ে দেয় ফলে মাছের বৃদ্ধি কমে যায়। একারণে শীতকালে পুরুরে সার ও খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয়। বুই জাতীয় মাছের বৃদ্ধি $25-30^{\circ}$ সে. তাপমাত্রা সবচেয়ে ভালো হয়।
- গ) ঘোলাঙ্ক: কাদা কণার কারণে পুরুরের পানি ঘোলা হলে পানিতে সুর্যালোক প্রবেশে বাধা পায়। এতে করে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়।
- ঘ) সুর্যালোক: যে পুরুরে সুর্যালোক বেশি পড়ে সেখানে সালোকসংশ্রেষণ ভালো হয়। ফলে সেখানে ফাইটোপ্রাইটেন বেশি উৎপাদিত হয় ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

২। রাসায়নিক ক্ষণান্তর

- ক) দ্রব্যাভূত অঙ্গীজেন: পুরুরের পানিতে দ্রব্যাভূত অঙ্গীজেন মাছ চাষের জন্য অভ্যন্ত ক্ষমতাপূর্ণ। প্রধানত ফাইটোপ্রাইটেন ও জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্রেষণ প্রতিয়ায় অঙ্গীজেন তৈরি করে পুরুরের পানিতে দ্রব্যাভূত হয়। বাহুমণ্ডল হতে সরাসরি পানির উপরিভাগেও কিছু অঙ্গীজেন মিশ্রিত হয়। পুরুরে বসবাসকারী মাছ, জলজ উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণী এ অঙ্গীজেন দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। রাতে সুর্যালোকের অভাবে সালোকসংশ্রেষণ হয় না বলে পানিতে কোনো অঙ্গীজেন তৈরি হয় না। এজন্য সকালে পুরুরে অঙ্গীজেনের পরিমাণ কমে যায় ও বিকেলে বেশি থাকে। মাছ চাষের জন্য পুরুরের পানিতে অঙ্গীজেনের পরিমাণ কমপক্ষে ৫ মিলি গ্রাম/লিটার (৫ পিপিএম বা ১ মিলিয়ন ভাগের পাঁচ ভাগ) থাকা প্রয়োজন।
- খ) দ্রব্যাভূত কার্বনডাই অক্সাইড: পুরুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য ফাইটোপ্রাইটেনের উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত দ্রব্যাভূত কার্বন ডাই অক্সাইড থাকা প্রয়োজন। তবে মাত্রাভিপ্রিক কার্বন ডাই অক্সাইড মাছের জন্য ক্ষতিকর। পানিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা ১২ মিলি গ্রাম/লিটারের (১২ পিপিএম) নিচে থাকলে তা মাছ ও চিপ্তির জন্য বিষাক্ত নয়। মাছের ভালো উৎপাদন পাওয়ার জন্য পুরুরের পানিতে ১-২ পিপিএম কার্বন ডাই অক্সাইড থাকা প্রয়োজন।
- গ) পিএইচ (P^H): পুরুরের পানির P^H মান নির্ধয় করে অন্তর্ভুক্ত বা ক্ষারভুক্ত মাত্রা বোঝা যায়। মাছ চাষের জন্য পুরুরের পানির P^H ৬.৫ হতে ৮.৫ এর মধ্যে হলে ভালো হয়। P^H ৪ এর নিচে বা ১১ এর উপরে হলে মাছ মারা যায়। পানির P^H কমে অস্ত্রীয় হয়ে গেলে পুরুরে চুল (১-২ কেজি/শতক) প্রয়োগ করতে হবে। পুরুরে P^H বেড়ে ক্ষারীয় অবস্থা বেশি বেড়ে গেলে এমেনিয়াম সালফেট বা তেতুল পানিতে গুলে পুরুরে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- ঘ) ফসফরাস: প্রাকৃতিক পানিতে অতি অল্প পরিমাণ ফসফরাস থাকে। এই ফসফরাস ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। পরিমিত ফসফেটের উপরিভিত্তে প্রচুর পরিমাণ ফাইটোপ্রাইটেন জন্মায়।

পুরুরের প্রকারভেদ ও এর বিভিন্ন স্তর

পুরুরের প্রকারভেদ

পানি ধারণক্ষমতা, পুরুরে মাছের ধরন, পুরুরের আয়তন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পুরুরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে পুরুরের প্রধান প্রধান শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো-

১। পানির স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে পুরুরের শ্রেণিবিভাগ

- ক) স্থায়ী বা বার্ষিক পুরুর: এসব পুরুরে সারা বছর পানি থাকে। এ ধরনের পুরুর অধিক গভীর হয়। এদের মাটি সবসময় পানি ধরে রাখতে পারে। যেমন- এঁটেল ও দোআশ মাটির পুরুর। এসব পুরুরে দেশীয় কার্প জাতীয় মাছ, যেমন- বুই, কাতলা, মৃগেল, কার্পিণ ইত্যাদির মিশ্র চাষ, গলদা চিংড়ি ও কার্পের মিশ্র চাষ করা যায়।
- খ) অস্থায়ী বা মৌসুমি পুরুর: এসব পুরুরে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় (৩-৮মাস) পানি থাকে। এগুলো বেশি গভীর হয় না। এদের মাটি বেশি সময় পানি ধরে রাখতে পারে না। যেমন- বেলে মাটির পুরুর। এসব পুরুরে দ্রুত বর্ধনশীল মাছ যেগুলো এক বছরের কম সময়ে বাজারজাত করার উপযোগী হয় সেসব মাছ চাষ করা যায়। যেমন- সিলভার কার্প, তেলাপিয়া, সরপুটি, শিং, মাঙ্গর ইত্যাদি।

২। চাষকৃত মাছের বয়সের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ

মাছের পোনাকে বয়স ও দৈর্ঘ্য অনুপাতে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা- ডিম পোনা, রেঁশু পোনা, ধানী পোনা ও আঙুলে বা চারা পোনা। ডিম ফুটার পরের অবস্থাকে ডিম পোনা বলে। এদের পেটের নিচে একটি থলি থাকে। থলি থাকা অবস্থায় (২-৩দিন) এরা বাইরে থেকে কোনো খাদ্য গ্রহণ করে না। কুসুম থলি শেষ হয়ে শাওয়ার পরবর্তী অবস্থাকে রেঁশু পোনা বলে। রেঁশু পোনা আরও বড় হয়ে ধানের মতো আকার (যেমন- ২ বা ২ সেমি এর উপর বড়) হলে একে ধানী পোনা এবং আঙুলের মতো লম্বা (৭ সেমি এর উপর) হলে একে আঙুলে বা চারা পোনা বলে। এ বিভিন্ন আকারের পোনার প্রতিপালনের জন্য বিভিন্ন পরিবেশের পুরুর প্রয়োজন। নিম্নে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো-

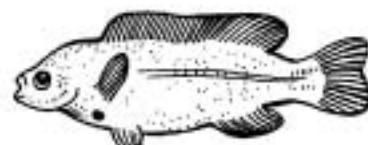
- ক) আঁতুড় বা নার্সারি পুরুর: যে পুরুরে রেঁশু পোনা ছেড়ে ধানী পোনা পর্যন্ত বড় করা হয় তাকে আঁতুড় বা নার্সারি পুরুর বলে। এখানে শতক প্রতি ৫০-১০০ গ্রাম রেঁশু পোনা ছেড়ে ১৫-৩০ দিন চাষ করা হয়।
- খ) লালন পুরুর: যে পুরুরে ধানী পোনা ছেড়ে চারা বা আঙুলে পোনা পর্যন্ত বড় করা হয় তাকে লালন পুরুর বলে। লালন পুরুরের আয়তন ২০ থেকে ১০০ শতক ও গভীরতা ১.৫-২ মিটার হতে পারে। এ পুরুরে শতক প্রতি ২৫০০-৮০০০ টি ধানী পোনা ছেড়ে ২-৩ মাস চাষ করা হয়।



ডিম পোনা



রেঁশু পোনা / ধানী পোনা



চারা পোনা / আঙুলে পোনা

চিত্র : মাছের পোনার বিভিন্ন পর্যায়

গ) মজুদ পুকুর: এটিই মাছ চাষের প্রধান পুকুর। যে পুকুরে ধানী বা আঙুলে পোনা হচ্ছে বড় মাছে পরিণত করা হয় তাকে মজুদ পুকুর বলে। এর আয়তন ৩০ শতকরে উপরে এবং গভীরতা ২-৩ মিটার হয়। এখানে সাধারণত ১ বছরের উপরে মাছ লালন না করাই ভালো। কারণ খাদ্য দিলেও এ সময়ের পর মাছের বৃদ্ধির হার কম হয়।

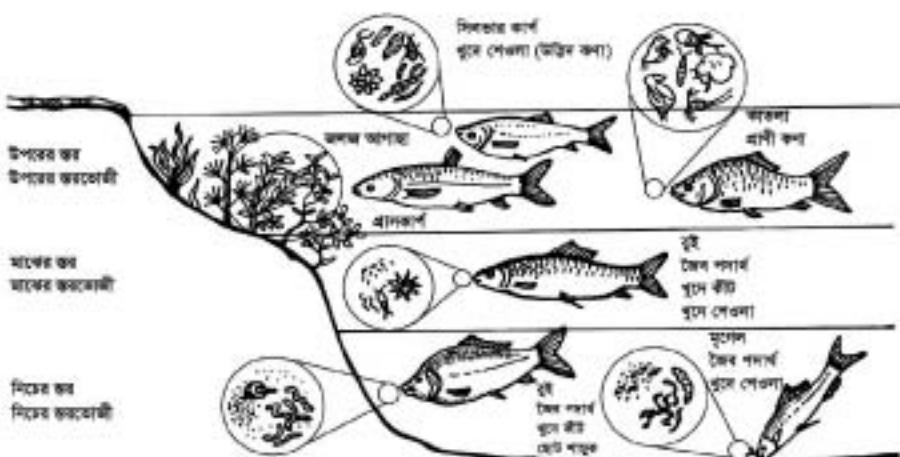
এছাড়া আয়তনের উপর ভিত্তি করেও পুকুরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- মিনি পুকুর বা ছোট পুকুর (১-৫ শতক), মাঝারি পুকুর (১০-৩০ শতক) এবং বড় পুকুর (৩০ শতকের উপর)।

পুকুরের বিভিন্ন ভর

পুকুরের পানির বিভিন্ন গভীরতা ভেদে তাপমাত্রা, অক্সিজেন, ও প্রাঙ্কটনের তারতম্য ঘটে। পুকুরে বিচরণকারী বিভিন্ন মাছও বিভিন্ন গভীরতায় থাকে ও খাদ্য গ্রহণ করে। এই সব তারতম্য অনুযায়ী পুকুরকে গুটি ভরে ভাগ করা যায়। যথা- (১) উপরের ভর (২) মধ্যস্তর এবং (৩) নিচের ভর

- ১) উপরের ভর বা উপরিভাগ: পুকুরের উপরের ভর যেহেতু বাতাসের সম্পর্কে থাকে তাই এই ভরে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে। পুকুরের উপরের ভরে ফাইটোপ্রাঙ্কটন বেশি থাকে যা মাছের খাদ্য। এই ভরে সরপুটি, কাতলা, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প থাকে ও খাদ্য গ্রহণ করে।
- ২) মধ্যস্তর বা মধ্যভাগ: এই ভরে পানির তাপমাত্রা ও দ্রব্যীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ উপরের ভরের চেয়ে কম থাকে। এই ভরে জু-প্রাঙ্কটন থাকে তবে ফাইটোপ্রাঙ্কটনও থাকতে পারে। বুই মাছ এই ভরে থাকে ও খাদ্য গ্রহণ করে।
- ৩) নিচের ভর বা তলদেশ: এই ভরে দ্রব্যীভূত অক্সিজেন ও তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। পুকুরের তলদেশে জু-প্রাঙ্কটন, কীটপতঙ্গের লার্ভা, জৈব-আবর্জনা, কেঁচো, শামুক-বিনুক পাওয়া যায়। মৃগেল, কালবাটুশ, কার্পিং বা কমন কার্প, চিৎড়ি, পাঞ্জাশ, শিং, মাঙুর এই ভরে বাস করে ও খাদ্য গ্রহণ করে।

কিছু মাছ আছে যারা পুকুরের সকল ভরেই বিচরণ করে যেমন- তেলাপিয়া। অন্যদিকে গ্রাস কার্প পুকুরের উপরে, পাড়ে বা তলদেশে জন্মানো বিভিন্ন সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।



চিত্র: পুকুরের বিভিন্ন ভর

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পুরুরে স্তর ভিত্তিক মাছের অবস্থান ও তাদের খাদ্যাভ্যাসের উপর ভিত্তি করে পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : নার্সারি বা আঁচুর পুরুর, লালন পুরুর, অজুদ পুরুর, বার্ষিক ও মৌসুমি পুরুর।

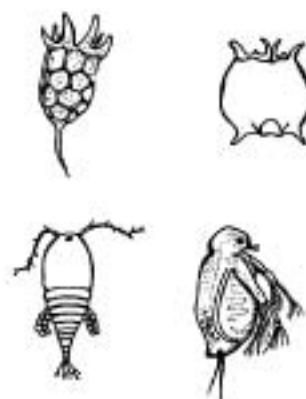
পুরুরের বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়

অবস্থান বা বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে পুরুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় বা জীবকূলকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- ১) **প্রাঙ্কটন:** প্রাঙ্কটন হচ্ছে পানিতে মুক্তভাবে ভাসমান অণুবীক্ষণিক জীব। এরা দুই প্রকার যথা-ফাইটোপ্রাঙ্কটন বা উদ্ভিদকণা ও জু-প্রাঙ্কটন বা প্রাণীকণা। পুরুরের পানির রং সবুজ বা সবুজাভ থাকলে বুঝতে হবে পানিতে ফাইটোপ্রাঙ্কটন আছে। ফাইটোপ্রাঙ্কটনকে এককোষী শেওলাও বলে। কয়েকটি ফাইটোপ্রাঙ্কটনের উদাহরণ হচ্ছে- ক্লোরেলা, এনাবেনা, মাইক্রোসিস্টিস ইত্যাদি। আর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জু-প্রাঙ্কটন হচ্ছে ড্যাফিনিয়া, কপিপোড, রচিফার। পানির রং বাদামি সবুজ, লালচে-সবুজ বা হলদেটে সবুজ থাকলে বুঝতে হবে ফাইটোপ্রাঙ্কটনের পাশাপাশি পুরুরে জু-প্রাঙ্কটনের উপাদানও ভালো। পুরুরে প্রাঙ্কটনের উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবহার করে নিয়মিত সার ব্যবহার করতে হয়। সার হিসাবে জৈব ও অজৈব এ দুধরনের সারই ব্যবহার করা যায়।



চিত্র: কয়েকটি ফাইটোপ্রাঙ্কটন



চিত্র: কয়েকটি জু-প্রাঙ্কটন

- ২) **সাতারু বা নেকটন:** এরা মুক্তভাবে সাতার কাটিতে পারে। এরা সমস্ত পানিতে চরে বেড়ায় এবং খাদ্য খুঁজে খায় হেমল- মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি। অবশ্য এদের ডিম ও লার্ভার বৈশিষ্ট্য প্রাঙ্কটনের মতো।
- ৩) **তলবাসী বা বেলথোস:** পুরুরের তলদেশে কাদার উপরে বা ভিতরে যে সব জীব থাকে তাদেরকে তলবাসী বা বেলথোস বলে। হেমল- পচনকারী ব্যাকটেরিয়া, শামুক, কিনুক ইত্যাদি। তলবাসী প্রাণী পুরুরের তলা থেকে প্রাঙ্কটনের পৃষ্ঠি উপাদান নাইট্রোজেন ও ফসফরাস মুক্ত করতে সাহায্য করে। ফলে পানিতে প্রাঙ্কটনের পৃষ্ঠি উপাদান বাড়ে যা মাছ চাষের জন্য ভালো।

৮) জলজ উদ্ভিদ: পুকুরে বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ জন্মায়। যেমন-

ক) শেওলা: অগভীর পুকুরের তলদেশে বা পুকুর পাড়ে বিভিন্ন ধরনের শেওলা জন্মে। যেমন—
স্পাইরোগাইরা।

খ) ভাসমান উদ্ভিদ: এ সকল উদ্ভিদ
পানিতে ভেসে থাকে। এদের মূল
মাটিতে আটকানো থাকে না।
যেমন— কচুরিপানা, টোপাপানা,
খুলিপানা ইত্যাদি।



গ) নির্গমশীল উদ্ভিদ: এ সব উদ্ভিদের
শিকড় পানির নিচে মাটিতে থাকে
কিন্তু পাতা ও কাণ্ডের উপরের
অংশ বা তথ্য পাতা পানির উপর
দাঁড়িয়ে থাকে বা ভেসে থাকে।
যেমন— শাপলা, পানিফল, শসনি
শাক, আড়াইল।



ঘ) নিমজ্জিত বা ভূবন্ধ উদ্ভিদ: এ ধরনের জলজ উদ্ভিদ পানির তলদেশে থাকে। এদের শিকড় মাটিতে
থাকে। এদের পাতা ও ডাল কখনো পানির উপরে আসে না। যেমন— কঁটা ঝৌঁকি, পাতাঝৌঁকি, কঁটা
শেওলা, নাজাস।



ঙ) লতানো উদ্ভিদ: এদের শিকড় পুকুরের পাড়ে
আটকানো থাকে এবং কাণ্ড, পাতা পানিতে ছড়িয়ে
থাকে। যেমন— হেলেঘো, কলমিলতা, মালঞ্চ।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাছ চাষের জন্য পুকুর খনন এবং প্রস্তুতকরণ

মাছ চাষের জন্য সর্বপ্রথম যেটি প্রয়োজন তা হচ্ছে নতুন পুকুর খনন অথবা বিদ্যমান পুকুরকে চাষের জন্য প্রস্তুতকরণ বা উপযোগীকরণ। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

ক. নতুন পুকুর খনন

কোনো স্থানে পুকুর খনন করতে হলে একটি আদর্শ পুকুরের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার যথাসম্ভব সেগুলো বজায় রেখে পুকুর খনন করতে হবে। পুকুর খননের সময় পুকুরটি যথাসম্ভব আয়তকার রাখার চেষ্টা করতে হবে। পুকুরের গভীরতা এমন ভাবে করা প্রয়োজন যেন সারা বছর ১.৫ থেকে ২ মিটার পানি থাকে। খননের সময় পুকুরের পাড়ের ঢাল ন্যূনতম ১.৫:২ রাখা উচিত। তবে মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি হলে ১:৩ করা নিরাপদ। অন্যথায় পুকুরের পাড় ভেঙে পিঘে অল্প দিনে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়বে। পুকুর খননের স্থানে যদি উপরের মাটি ভালো ও উর্বর হয় তবে পুকুর খননের সময় আলাদা করে সরিয়ে রাখতে হবে। পুকুর খনন শেষ হলে পুকুরের তলায় বালু মাটির উপরে তা বিছিয়ে দিতে হবে। এতে পুকুরের পানি ধারণ ক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। পুকুরের পাড়ের উপরিভাগে ২.৫ মিটার চওড়া হলে ভালো। পুকুরের উপরিভাগের ধার ও পাড়ের মধ্যবর্তী কিছু স্থান ফাঁকা রাখা হয়। ঐ জায়গাটুকুকে বকচর বলে। পুকুরে তলা সমান অর্থে একদিকে কিছুটা ঢাল করতে হবে। এতে পানি সেচ ও মাছ আহরণে সুবিধা হবে। নতুন পুকুর খননের পর দরমুজ দিয়ে পিটিয়ে পাড়ের মাটি শক্ত করে দিতে হবে এবং পাড়ে ঘাস জাগিয়ে দিতে হবে। এতে করে পাড় ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা কমে যাবে ও বর্ষায় পাড়ের মাটি ক্ষয়ে যাবে না।



চিত্র: পুকুরের প্রস্তুতি

খ. পুকুর প্রস্তুতকরণ বা মাছ চাষের উপযোগীকরণ

পুকুর প্রস্তুতি মাছ চাষের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাছ পালনের পূর্বে বিদ্যমান পুকুর সংক্রান্তের মাধ্যমে ভালোভাবে প্রস্তুত করে নিলে মাছ স্বাস্থ্যসম্মত বসবাসের অনুকূল পরিবেশ পায়। এতে মাছের দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে ও রোগ বালাই কম হয়। ফলে মাছ উৎপাদন লাভজনক হয়। পুকুর প্রস্তুতির প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধারাবাহিক ধাপে সম্পন্ন করতে হয়। ধাপ গুলো নিম্নরূপ-

১. পুরুরের পাড় ও তলদেশ মেরামত

পুরুরের পাড় ভাঙ্গা থাকলে অতিরিক্ত বৃষ্টিতে বা বর্ষাকালে বন্যায় মাছ ভেসে যেতে পারে বা রাঙ্কুসে মাছ ঢুকতে পারে। তাই পাড় ভাঙ্গা থাকলে মেরামত করতে হবে ও পাড় উঁচু করে বাঁধতে হবে। পাড়ে বড় গাছপালা থাকা উচিত নয় বা থাকলেও তা ছেটে দিতে হবে। এতে করে পুরুরে সূর্যের আলো পড়তে পারবে এবং পুরুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হবে। পুরুর পুরানো হলে তলায় অতিরিক্ত কাঁদা জমা হয়। এ অবস্থায় ২০-২৫ সেমি. কাঁদা রেখে অতিরিক্ত কাঁদা তুলে ফেলতে হবে। পুরুর শুকিয়ে সহজেই তা করা যায়। মাছ চাষের পুরুরে ৩-৪ বছর পর পর একবার তকানো উচিত। পুরুর তকানোর পর কড়া রোদে তলায় ফাটল ধরাতে হবে। সম্ভব হলে পুরুরের তলায় চাষ দিয়ে নিতে হবে। এতে করে পুরুরে তলা থেকে বিষাক্ত গ্যাস, ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও পোকামাকড় দূর হবে এবং পুরুরের পরিবেশ ভালো থাকবে। এরপর পুরুরে তলদেশ সমান করে নিতে হবে। পুরুরের তলায় একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভালো হয়। এতে মাছ ধরতে ও জাল টানতে সুবিধা হবে।

২. জলজ আগাছা দমন

পুরুর পাড়ে ও ভিতরে বিভিন্ন আগাছা যেমন-কচুরিপানা, খুদিপানা, হেলেঝা, কলমি লতা, শেওলা ইত্যাদি থাকলে তা ভালোভাবে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। আগাছা পুরুরে দেওয়া সার শোষণ করে নেয়, সূর্যের আলো পড়তে বাধা দেয় এবং মাছের স্বাভাবিক চলাচলে বাধা দেয়। আগাছার মধ্যে মাছের শত্রু যেমন-রাঙ্কুসে মাছ, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি লুকিয়ে থাকে ও মাছ ধরে থায়। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য যেমন-কপার সালফেট বা তুঁতে, সিমাজিন ইত্যাদি ব্যবহার করেও জলজ আগাছা দমন করা যায়। তবে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা কঞ্চিত নয়। প্রাসকার্প, সরপুটি উত্তিসঙ্গী মাছ। চাষকালীন সময়ে পুরুরে এসব মাছ ছেড়ে জৈবিক পদ্ধতিতেও আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. রাঙ্কুসে ও অচাষযোগ্য মাছ দূরীকরণ

বিভিন্ন রাঙ্কুসে মাছ যেমন-শোল, বোঝাল, চিতল, ফলি, টাকি, গজার ইত্যাদি সরাসরি চাষের মাছ খেয়ে ফেলে। এছাড়া পুটি, চাপিলা, চান্দা ইত্যাদি অচাষযোগ্য মাছ। এরা চাষযোগ্য মাছের জায়গা, খাদ্য, অঙ্গিজেন সবকিছুতেই ভাগ বসায়। এর ফলে চাষকৃত মাছের উৎপাদন কমে যায়। নিচের যে কোনো পদ্ধতিতে রাঙ্কুসে ও আবাদেঘোগ্য নয় এমন মাছ দূর করা যায়।

- পুরুর শুকিয়ে: পুরুরের পানি শুকিয়ে সব মাছ ধরে ফেলা যায়। অনেক মাছ পুরুরের তলায় কাঁদায় লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই কড়া রোদে পুরুর শুকিয়ে ফেলতে হবে।
- জাল টেনে: পুরুরে পানি কম থাকলে বার বার জাল টেনে মাছ ধরে ফেলা যায়।
- মাছ মারার বিষ ব্যবহার করে: একেত্রে রোটেনল বা মহায়ার খেল ব্যবহার করা যায়। এসব দ্রব্য পুরুরে দিলে মাছের ফুলকার ছিদ্র বন্ধ করে দেয়। ফলে মাছ দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। পুরুরে ১ ফুট বা ৩০ সেমি. গভীরতায় পানির জন্য শতক প্রতি ৩০-৩৫ গ্রাম রোটেনল অথবা ৩ কেজি মহায়ার খেল ব্যবহার করতে হবে। এজন্য মোট পরিমাণকে তিন ভাগ করতে হবে। একভাগ দিয়ে কাই তৈরি করে ছেট ছেট বল বানিয়ে পুরুরে বিভিন্ন স্থানে দিতে হবে। বাকি ২ ভাগ পানিতে শুলিয়ে পুরুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর জাল টেনে পুরুরের পানি উলট-পালট করে দিতে হবে। মাছ ভাসতে শুরু করলে জাল টেনে ধরে ফেলতে হবে। বিষ দেওয়ার পর ৭-১০ দিন পুরুরের পানি ব্যবহার করা যাবে না ও নতুন মাছ ছাড়া যাবে না। রোটেনল ব্যবহারে মৃত মাছ খাওয়া যাবে। পুরুরে বিভিন্ন রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করেও মাছ মারা যায় যেমন- ফস্টিজিন ট্যাবলেট। রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে মাছ মারা ঠিক নয়।

৪. চুন প্রয়োগ

পুরুরে তকানোর পরে তলায় চুন ছিটিয়ে দিতে হবে। পুরুরের তলায় চাষ দেওয়া হলে তাহের দিন চুন দিতে হবে। পুরুরে পানি থাকলে অ্যালুমিনিয়ামের বালতি বা ড্রামে চুন গুলার পর ঠাণ্ডা হলে সমস্ত পুরুরে ছিটিয়ে দিতে হয়।

চুন প্রয়োগের উপকারিতা: ১) চুন মাটি ও পানির উর্বরতা বাঢ়ায় ২) পানির পিএইচ ঠিক রাখে ৩) পানির ঘোলাত্তু কমায় ও পানি পরিষ্কার রাখে ৪) মাছের রোগ-বালাই দূর করে এবং ৫) সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

পুরুরের তলদেশের মাটির প্রকারভেদ, পুরুরের বয়স ও পানির পিএইচ মানের উপর চুন প্রয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে। যেমন-এন্টেলমাটি, কাদামাটি ও লাল মাটির পুরুরে চুন একটু বেশি দরকার হয়। নিম্নে পিএইচ মানের উপর ভিত্তি করে চুন প্রয়োগের মাত্রা দেওয়া হলো-

পুরুর প্রকৃতির সময় চুন প্রয়োগের মাত্রা

পানির পিএইচ মান	চুনের (পাথুরে) পরিমাণ (কেজি/শতক)	সাধারণ প্রয়োগের মাত্রা
৩-৫	১২	সাধারণত আমাদের দেশে প্রতি শতকে ১-২ কেজি চুন প্রয়োগ করা হয়।
৫-৬	৮	
৬-৭	২	

৫. সার প্রয়োগ

সার প্রয়োগের ফলে পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়। মাছের প্রধান প্রাকৃতিক খাবার হচ্ছে ফাইটোপ্রাক্টন ও জুপ্রাক্টন। সার প্রয়োগের ফলে পানিতে বিভিন্ন পৃষ্ঠি উপাদান যেমন-ফসফরাস, পটাশিয়াম পানিতে হিসে। এ পৃষ্ঠি উপাদান ব্যবহার করে পানিতে ফাইটোপ্রাক্টন তৈরি হয়। আর ফাইটোপ্রাক্টনের উপর নির্ভর করে জু-প্রাক্টন তৈরি হয়। সার দুই প্রকার। ১) জৈব সার, যেমন-গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, ২) অজৈব সার, যেমন-ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি ইত্যাদি। চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর সার প্রয়োগ বরতে হয়। রোড্রোজ্জুল দিনে সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে পুরুরে সার প্রয়োগ করা উচিত। সার পানিতে গুলে সমস্ত পুরুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পুরুর প্রকৃতির সময় সার প্রয়োগের মাত্রা

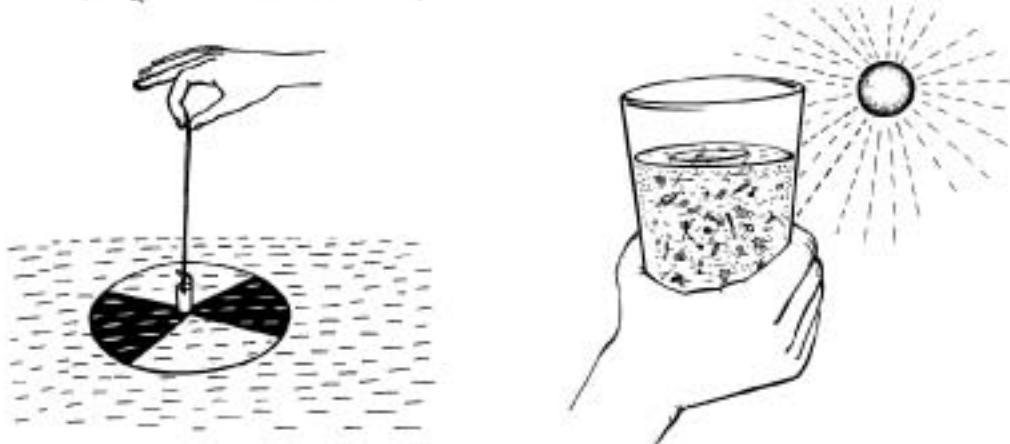
জৈব সার		অজৈব সার	
সারের নাম	মাত্রা (শতক প্রতি)	সারের নাম	মাত্রা (শতক প্রতি)
গোবর	৫-৭ কেজি	ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম
অথবা		টিএসপি	৫০-৭৫ গ্রাম
মুরগির বিষ্ঠা	৩-৪ কেজি	এমওপি	২০ গ্রাম

৬. প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

পুরুরে পোনা মঞ্জুদের পূর্বেই সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুরুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কয়েকটি পক্ষতিতে এটি করা যায়।

- ক) সেক্রিটিক্স: ২০ সেমি. ব্যাসযুক্ত টিলের একটি সানা-কালো থালা (একে সেক্রিটিক্স বলে) সূতা দ্বারা পানিতে ঢুবানোর পর যদি ২৫-৩০ সেমি. গভীরতায় থালা না দেখা যায় তবে পুরুরে প্রাকৃতিক খাদ্য রয়েছে। যদি ৩০ সেমি. এর অধিক গভীরতায় সেক্রিটিক্স দেখা যায় তবে পুরুতে হবে খাবার অনেক কম।
- খ) হাত পরীক্ষা: পানিতে হাতের কনুই পর্যন্ত ঢুবিয়ে যদি হাতের তালু দেখা না যায় তবে পুরুতে হবে খাদ্য পরিমাণ মতো তৈরি হয়েছে।
- গ) গ্লাস পরীক্ষা: একটি স্বচ্ছ কাচের গ্লাস দ্বারা পুরুরের পানি নিয়ে সূর্যের আলোর দিকে ধরলে যদি পানির রং সবুজ বা বাদামি সবুজ দেখা যায় এবং পানিতে অসংখ্য সূক্ষ্ম কণা ও ছোট পোকার মতো দেখা যায় তবে পুরুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাণ মতো তৈরি হয়েছে।

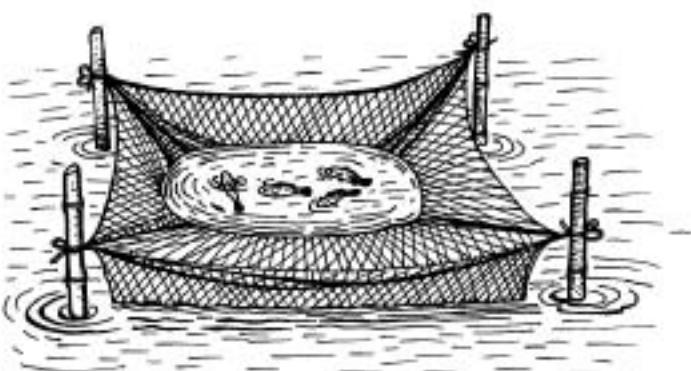
পরীক্ষা করার পরও যদি দেখা যায় খাদ্য তৈরি হয়নি তবে আরও ২-৪ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এরপরও খাদ্য তৈরি না হলে পুনরায় সার প্রয়োগ করতে হবে।



চিত্র: সেক্রিটিক্স ও গ্লাস পরীক্ষা

৭. পানির বিশাঙ্কতা পরীক্ষা

যে পুরুরে রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করে মাছ মারা হয়েছে সেখানে পোনা মজুদের ১ দিন পূর্বে পুরুরে হাপা ছাপন করে অথবা বালতিতে বা পাতিলে পুরুরের পানি নিয়ে তাতে ১০-১৫টি পোনা ছেড়ে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত রাখতে হবে। এসময়ে পোনা মারা না গেলে বোঝা যাবে পুরুরের পানিতে কোনো বিষক্রিয়া নেই। তখন পুরুরে পোনা ছাড়তে হবে।



চিত্র : পানির বিশাঙ্কতা পরীক্ষা পদ্ধতি

কাজ : শিক্ষার্থীরা শিক্ষকসহ পাশবর্তী কোনো পুকুরে গিয়ে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য আছে কিনা তা পরীক্ষা করবে এবং খাতায় লিখে জমা দিবে।

পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ার পদ্ধতি

পুকুরে পোনা ছাড়ার জন্য নিকটবর্তী কোনো সরকারি বা বেসরকারি হ্যাচারি বা নাসারি খামার থেকে পোনা সংগ্রহ করা যেতে পারে/কাছাকাছি ছানে মাটির ইাড়ি বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে পোনা পরিবহন করা যেতে পারে। কিন্তু দূরবর্তী ছানের ক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগে অঙ্গীজেন দিয়ে পোনা পরিবহন করা উচিত। এক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগে ৩ ভাগের ১ ভাগ পানি ও ২ ভাগ অঙ্গীজেন দিয়ে পোনা পরিবহন করতে হবে। পোনা সরাসরি পুকুরে ছাড়া উচিত নয়। পোনা ছাড়ার পূর্বে পোনাকে পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে নিন্তে হবে। এ জন্য পোনাভর্তি পলিব্যাগ বা পাত্র পুকুরের পানিতে ১৫-২০ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে। এ সময় অল্প অল্প করে পলিথিনে বা পাত্রে পুকুরের পানি মেশাতে হবে। এতে করে পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা গ্রায় সমান হবে। এরপর পলিব্যাগ বা পাত্র কাত করে আস্তে আস্তে এর ভিতরে পুকুরের পানির ঢেউ দিলে পোনা ধীরে ধীরে পুকুরে ঢেলে যাবে। সকালে বা বিকালে বা দিনের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে। পোনা ছাড়ার পূর্বে শোধন করে নিলে পোনাগুলো কোনো অক্ষিকারক পরজীবী ধারা আক্রান্ত থাকলে তা থেকে মুক্ত হবে, রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম হবে ও মৃত্যুর সুরক্ষা কমে যাবে। বালতিতে বা পাতিলে ১০ লিটার পানিতে ১ চা চাহচ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা ২০০ গ্রাম লবণ মিশিয়ে তাতে প্রতিবারে ৩০০-৫০০ টি পোনা আধা মিনিট গোছল করাতে হবে। একবার তৈরিকৃত মিশ্রণে ৪-৫ বার শোধন করা যাবে। তাই পুকুরের জায়গা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণে পোনা ছাড়তে হবে।



চিত্র : পুকুরে পোনা ছাড়ার পদ্ধতি

নতুন শব্দ: পিপিএম রোটেনেল, ফস্টেক্সিন ট্যাবলেট, সেক্সিডিস্ক

কাজ : শিক্ষার্থীরা মাছের পুকুর/অঞ্চল খামার পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন তৈরি ও উপস্থাপন করবে।

চতুর্থ পরিচেছন মাছের অভয়াশ্রম

নদী মাতৃক আয়াদের এই বাংলাদেশে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ জলাশয় যার মোট আয়তন হচ্ছে প্রায় ৪৭ লক্ষ হেক্টর এবং আরও রয়েছে ১.৬৬ লক্ষ বর্গ কিমি এর সুবিশাল বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগই হচ্ছে মুক্ত জলাশয় যেমন— নদ-নদী, বিল, সুন্দরবনের জলাভূমি, কাণ্ডাই লেক, হাওর ও প্রাবনভূমি। যার মোট আয়তন হচ্ছে ৪০.২৫ লক্ষ হেক্টর। অন্যদিকে বন্ধ জলাশয় রয়েছে মাত্র শতকরা প্রায় ১২ ভাগ যার মধ্যে রয়েছে পুকুর, দিঘি, ডোবা, হাওর ও চির্ঠি খামার। এদের মোট আয়তন হচ্ছে ৬.৭৮ লক্ষ হেক্টর। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট মাছ উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ আসে অভ্যন্তরীণ জলাশয় হতে এবং ২০ ভাগ আসে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ হতে।

সুন্দর অভীতে প্রাকৃতিকভাবে এদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়সমূহে বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর মাছ ধরা পড়ত। যাটের দশকে এর পরিমাণ ছিল মোট মৎস্য উৎপাদনের ৮০%। বিগত কয়েক দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অতিরিক্ত পানি ব্যবহার, কৃষিকাজে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার, শিল্পায়নের ফলে পানি দূষণ, অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ, নির্বিচারে ডিমগোলা ও পোনা মাছ নিধন, নদীতে অপ্ররিকল্পিত বাঁধ ও অবকাঠামো নির্যাণ এবং পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে বর্তমানে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় হতে এ উৎপাদন নেমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৫% এ। বাকি উৎপাদনের ৪৭% আসে বিভিন্ন বন্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ থেকে এবং ১৮% আসে সামুদ্রিক মৎস্য হতে। মুক্ত জলাশয়ে পুরু উৎপাদনই নয় সে সাথে মাছের জীববৈচিত্র্যও দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে মোট ২৬০ প্রজাতির স্বাদুপানির মাছের মধ্যে ১২টি চরম বিপন্ন, ২৮টি বিপন্ন ও ১৪টি ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। যে প্রজাতি প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে অচিরেই বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকি মোকাবেলা করছে তাকে চরম বিপন্ন প্রজাতি (যেমন— সরপুটি, মহাশোল, বাঘাআইড), আর যে প্রজাতি অন্দুর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি মোকাবেলা করছে তাকে বিপন্ন প্রজাতি বলে। অন্যদিকে যে প্রজাতি বিপন্ন না হলেও মধ্যমেয়াদি ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাকে ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি বলে। বাংলাদেশের কয়েকটি বিপন্ন প্রজাতির মাছের উদাহরণ হচ্ছে— রানি, পাবদা, টেংরা ইত্যাদি। আর ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি হচ্ছে ফলি, গুলশা, কাজলি, মেনি ইত্যাদি। মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য মাছের নিরাপদ আবাসস্থল বা অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। মৎস্য অভয়াশ্রম হচ্ছে কোনো জলাশয় বা এর একটি নির্দিষ্ট অংশ যেমন— কোনো হাওর, বিল বা নদীর কোনো অংশ যেখানে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বা সারা বছর বা দীর্ঘমেয়াদের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়। অনেক সময় উক্ত নির্দিষ্ট স্থানে মাছ আহরণ যেন না করা যায় এজন্য গাছের ডালগালা, বাঁশ ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। এতে করে সেখানে মাছ নিরাপদ আশ্রয় পায়, মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারে ও অবাধ প্রজনন ঘটাতে পারে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে প্রায় ৫০০টির মতো অভয়াশ্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের ক্রূরত

১. মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের বা ঘোষণার মাধ্যমে মাছের নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিত করা যায়।
২. মাছের অবাধ প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ করা যায়।
৩. মাছের নিরাপদ আশ্রয় তৈরির মাধ্যমে বিলুপ্ত প্রায় বা মাছের বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষণ করা যায়।

৪. মাছের বৃক্ষির জন্য পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য নিশ্চিত করা যায়।
৫. প্রজননক্ষম মাছকে রক্ষার মাধ্যমে বৎশবৃক্ষি ও মনুন বৃক্ষি করা যায়।
৬. জলজ পরিবেশে মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যায়।



চিত্র: মৎস্য অভয়াশ্রম

কাজ : শিক্ষার্থীরা মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করবে।

নতুন শব্দ : চরম বিপন্ন প্রজাতি, বিপন্ন প্রজাতি, বৃক্ষিপূর্ণ প্রজাতি, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়

পদ্ধতি পরিচেন

মৎস্য সংরক্ষণ আইন

মৎস্য সংরক্ষণ আইন

দিনে দিনে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বাঢ়ছে এবং সে সাথে বাঢ়ছে মাছের চাহিদাও। চাহিদা বৃক্ষি পাওয়ার ফলে জেলেরা দেশের বিভিন্ন জলাশয় হতে প্রায় ছেট বড় সব মাছই ধরছে। এ থেকে রেহাই পাচ্ছে না পোনা মাছ ও প্রজননক্ষম মাছও। ফলে প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে জন্মাস্বয়ে মাছ উৎপাদন করে যাচ্ছে। এমনকি কিছু প্রজাতি হারিয়ে যেতে বসেছে। মাছের উৎপাদন ও জীব বৈচিত্র্য হেন করে না যায় বরং বৃক্ষি পায় বা একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে থাকে এজন্য সরকার মাছের আকার, প্রজনন ও বৃক্ষির সময়, বিচরণক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়ে কতিপয় বিধি-নিষেধ আরোপ করে ১৯৫০ সালে “মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন- ১৯৫০” প্রণয়ন করে। এটি সাধারণভাবে ‘মৎস্য সংরক্ষণ আইন’ নামে পরিচিত। পরবর্তীতে বাস্তব প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে আইনটি সংশোধন, সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। এই আইনের উল্লেখযোগ্য বিধিসমূহ হলো-

- ১। চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রতি বছর : ক) জুলাই হতে ডিসেম্বর (আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি হতে পৌষ মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সেপ্টেম্বরের (৯ ইঞ্জি) নিচের কাতলা, বুই, মৃগেল, কালবাটুস, ঘনিয়া; ব) নভেম্বর হতে মে (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি

মাস পর্যন্ত ২৩ সেন্টিমিটারের (৯ ইঞ্চি) নিচের ইলিশ (যা “জাটকা” নামে পরিচিত); গ) নভেম্বর হতে এপ্রিল (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হতে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি) মাস ২৩ সেন্টিমিটারের (৯ ইঞ্চি) নিচের পাঞ্জাশ; ঘ) ফেব্রুয়ারি হতে জুন (মাঘ মাসের মাঝামাঝি হতে আবাঢ় মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ৩০ সেন্টিমিটার থেকে (১২ ইঞ্চি) ছেটি আকারের সিলন, বোয়াল ও আইড় মাছ ধরা, নিজের দখলে রাখা, পরিবহন বা বিক্রি করা নিষিদ্ধ।

- ২। চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত সাধারণভাবে নদী-নালা, খাল-বিলে সংযোগ আছে এবং জলাশয়ে প্রতি বছর ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে আগস্ট (চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হতে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি) পর্যন্ত শোল, গজার, টাকি মাছের পোনার কৌক বা মা মাছ ধরা ও ধৰ্মস করা যাবে না।
- ৩। জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা নরমার উদ্দেশ্য ব্যতীত নদী-নালা, খাল এবং বিলে অস্থায়ী বা স্থায়ী বাঁধ বা কোনোরূপ অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না।
- ৪। নদী-নালা, খাল-বিলে স্থায়ী স্থাপনার মাধ্যমে (ফিল্ড ইঞ্জিন) মৎস্য আহরণ করা যাবে না, এবং ক্ষেত্রে স্থায়ী স্থাপনা অপসারণ এবং বাজেয়ান্ত করা যাবে।
- ৫। অভ্যন্তরীণ জলাভূমিতে বিষ প্রয়োগ, পরিবেশ দূষণ, বাণিজ্যিক বর্জ্য বা অন্যবিধ উপায়ে মাছ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।
- ৬। মাছ ধরার ক্ষেত্রে ৪.৫ সেন্টিমিটার বা তদপেক্ষ কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের ফাঁস বিশিষ্ট ফাঁসজাল (প্রচলিত নাম-কারেন্ট জাল) ব্যবহার নিষিদ্ধ।
- ৭। ইলিশ অভ্যাশ্য সংরক্ষণ: সরকার ঘোষিত ইলিশ অভ্যাশ্য এলাকায় বছরের নির্ধারিত সময়গুলোতে কোনো ব্যক্তি কোনো মাছ ধরতে বা ধরার কারণ সৃষ্টি করতে পারবে না।
- ৮। ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ: ইলিশ মাছের অবাধ প্রজননের সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলোতে প্রতি বছর ১৫-২৪শে অক্টোবর (১-১০ই আশ্বিন) ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ।
- ৯। শান্তি: (ক) প্রথমবার আইন ভঙ্গকারীর শান্তি হবে কমপক্ষে ১ মাস হতে সর্বোচ্চ ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং তৎসহ সর্বোচ্চ ১০০০/- টাকা জরিমানা। (খ) পরবর্তীতে প্রতিবার আইন ভঙ্গের জন্য কমপক্ষে ২ মাস হতে সর্বোচ্চ ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং তৎসহ সর্বোচ্চ ২০০০/- টাকা জরিমানা।

নতুন শব্দ : জাটকা, কারেন্ট জাল

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গৃহপালিত পাখির আবাসন

হাঁস-মূরগির আবাসন

পারিবারিকভাবে ১০-১৫টি হাঁস-মূরগি পালনের জন্য শুধু রাতে আশ্রয়ের জন্য ছোট খৌয়াড় বা বাসস্থান তৈরি করা হয়। কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে খামারভিত্তিক হাঁস-মূরগি পালন করতে হলে এদের জন্য আবাসন বা বাসস্থান প্রয়োজন। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে পাখির বাসস্থান করা হয়ে থাকে। যথা-

- | | |
|---------------------------------|--|
| ১। আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা। | ২। নিবিড়ভাবে যত্ন নেওয়া যায়। |
| ৩। সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য। | ৪। খারাপ আবহাওয়া থেকে রক্ষা করা। |
| ৫। টিকা দেওয়া সহজ হয়। | ৬। বন্য পশুপাখির আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। |
| ৭। চোরের হাত থেকে রক্ষা করা। | ৮। তিম সঞ্চাহ করা সহজ হয়। |
| ৯। খাদ্য ও পানি সরবরাহ সহজ হয়। | ১০। হাঁস-মূরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা। |
| ১১। লিটার সহজে পরিকার করা যায়। | ১২। শ্রমিক কম লাগে। |

হাঁসমূরগির আবাসন তৈরির ধাপসমূহ

- ১। হাঁস-মূরগির আবাসনের স্থান নির্বাচন করা।
- ২। ঘরের ডিজাইন নির্বাচন করা।
- ৩। হাঁস-মূরগি পালনের জন্য বিভিন্ন প্রকার ঘর তৈরির পরিকল্পনা করা।
- ৪। হাঁস-মূরগির ঘর তৈরিকরণ
- ৫। হাঁস-মূরগিকে প্রয়োজনীয় জায়গা দেওয়া।

কাজ : শিক্ষার্থীরা, হাঁস-মূরগি আবাসন তৈরির ধাপগুলো লিখিবে এবং উপস্থাপন করবে।

হাঁস-মূরগির আবাসনের স্থান নির্বাচন করা : হাঁস-মূরগির বাসস্থান বা ঘর এমন জায়গায় তৈরি করতে হবে যেখানে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে। যথা-

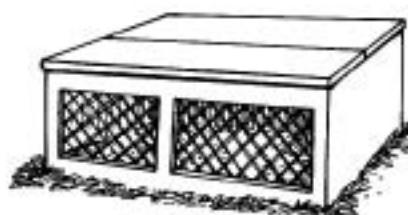
- ১। উচু ও বন্যামুক এলাকা হতে হবে।
- ২। বাজার, মহাসড়ক ও বসতি থেকে দূরে হবে।
- ৩। ডিম ও মাংস বাজারজাত করার সুবিধা থাকতে হবে।
- ৪। ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা থাকবে।
- ৫। বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের সুবিধা থাকবে।
- ৬। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধা সম্পূর্ণ স্থান হতে হবে।
- ৭। ভবিষ্যতে খামার বড় করার সুযোগ থাকতে হবে।

ঘরের ডিজাইন

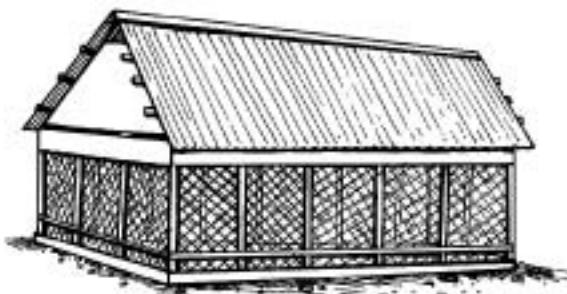
হাঁস-মূরগি পালনের জন্য আয়তাকার ঘর সবচেয়ে ভালো। হাঁসমূরগির সংখ্যার উপর ঘরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। তবে ঘরের দৈর্ঘ্য যাই হোক না কেন প্রযুক্তি ৪,৫-৯,০ মিটারের মধ্যে হতে হবে। হাঁস-মূরগির ঘর পূর্ব পশ্চিমে সংযোগ করে এবং দক্ষিণমুখী হতে হবে। ছাদের ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে দু'ধরনের মূরগির ঘর বেশি দেখা যায়। যেমন-

- ১। গ্যাবল টাইপ
- ২। শেভ টাইপ

শেড টাইপ : শেড টাইপ বা একচালা ঘর খুব সহজেই তৈরি করা যায়। ঘোলা অবস্থায় বা অর্ধ-আবক্ষ অবস্থায় হাঁস-মূরগি পালনের জন্য এ ধরনের ঘর খুবই উপযোগী।



চিত্র : শেড টাইপ ঘর



চিত্র : গ্যাবল টাইপ ঘর

গ্যাবল টাইপ : গ্যাবল টাইপ বা দোচালা ঘর তৈরিতে অর্চ বেশি হয়। এ ধরনের ঘরের ছান্দ ঢালু থাকে। সাধারণত যেসব অঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত হয়, সেখানকার জন্য গ্যাবল টাইপ ঘর খুবই উপযোগী।

ঘরের ডিজাইন যে প্রকারের হোক না কেন, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য হাঁস-মূরগির আমারে নিম্নলিখিত ঘরসমূহ থাকবে। যথা-

- ১। বাচ্চার ঘর বা ত্রুভার ঘর -এখানে সদ্য ফোটা বাচ্চাদের জন্য থেকে ৪ বা ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে তাপ প্রদান, টিকা, লিটার, খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা করতে হয়।
- ২। বাড়ত হাঁস-মূরগির ঘর বা ঝোয়ার ঘর -এখানে ডিম উৎপাদনকারী হাঁস-মূরগির বাচ্চাকে ৫/৭ সপ্তাহ থেকে ২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পালন করা হয়।
- ৩। ডিমপাড়া হাঁস-মূরগির ঘর -এখানে ডিম উৎপাদনকারী হাঁস-মূরগি ২১ থেকে ৭২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পালন করা হয়।

হ্যাচারি ঘর : যে আমারে বীজ থেকে ইনকিউবেটরের সাহায্যে বাচ্চা ফোটানো হয়, তাকে হাঁস-মূরগির হ্যাচারি আমার বলে এবং যে ঘরে বাচ্চা ফোটে তাকে হ্যাচারি ঘর বলা হয়।

ক্রয়লার ঘর : যে আমারে মাস উৎপাদনকারী ক্রয়লার মূরগি পালন করা হয় তাকে ক্রয়লার আমার বলে এবং যে ঘরে পালন করা হয় তাকে ক্রয়লার ঘর বলা হয়। ক্রয়লার ঘরে মূরগিকে ৪ বা ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পালন করা হয়।

ঘর তৈরিকরণ

ছান্দ বা ঢালা : টিন, অ্যাসবেস্টাস এবং করোগেটেড শিট দিয়ে ঘরের ছান্দ তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সিমেন্ট ও কংক্রিটের তৈরি ছান্দ সবচেয়ে ভালো। গ্রামীণ পরিবেশে পারিবারিক হাঁস-মূরগির আমারে ছন্দ ও উপর্যুক্ত গাছের পাতা ব্যবহার করা যাবে।

মেঝে : ঘরের মেঝে শুক রাখার জন্য হাঁস-মূরগিকে ইটের মেঝে বা মাচার উপর রাখা উচ্চম।

দেয়াল : মূরগির ঘরের দেয়াল মাটি, বাঁশ, কাঠ, ইট, তারের নেট ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা যায়। দেয়ালের উচ্চতা ক্রয়লারের ক্ষেত্রে ০.৩ মিটার (১ ফুট) ও লেয়ারের ক্ষেত্রে ০.৬ মিটার (২ ফুট) পর্যন্ত দেওয়া যেতে

পারে। আর দেয়ালের উপরের অংশে তারের নেট দেওয়া হবে থাকে। তবে শীতের দিনে উপরের নেটের অংশটুকু চেটের বন্ধা বা ঝিপল দিয়ে ঢাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

দরজা : ইঁস-মুরগির ঘরের দরজা দক্ষিণ দিকে থাকতে হবে। ঘরের দরজা আকারে বড় হওয়া উচিত।

জানলা : ঘরের লম্বালম্বি পাশে নেট থাকায় জানলা থাকে না। তবে, প্রত্যেক পাশ দেয়াল দ্বারা বন্ধ থাকলে জানলা দিতে হবে।

ইঁস-মুরগির প্রয়োজনীয় জায়গা : ঘরে ইঁস-মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। বয়সভেদে বিভিন্ন পক্ষতিতে ইঁস-মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

বয়স (মাস)	প্রতিটির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ (বর্গমিটার)		
০-১ (১ম দিন থেকে বয়স পার্চি)	লিটার পক্ষতি	খাচা পক্ষতি	মাচা পক্ষতি
	০.০৫ - ০.২৮	০.০২ - ০.০৭	০.০২ - ০.১৯

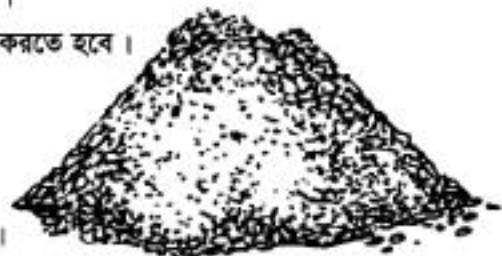
নতুন শব্দ : আবাসন, শেভ টাইপ ঘর, গ্যাবল টাইপ ও হ্যাচারি ঘর

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গৃহপালিত পাখির খাদ্য

দেহের বৃক্ষ, ভরণপোষণ ও উৎপাদনের জন্য খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যিক। দানা শস্য ও এদের উপজাতসমূহ গৃহপালিত পাখির (ইঁস-মুরগির) খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইঁস-মুরগির খামার পরিচালনায় যে পরিমাণ টাকা খরচ হয় তার ৭০ ভাগই খরচ হয় খাদ্য কর্তৃ খাতে। নিম্নে খাদ্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো।

- ১। দানাশস্য ও এদের উপজাতসমূহ তাজা ও মানসমত হতে হবে।
- ২। খাদ্য পাখির প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকবে।
- ৩। খাদ্য জীবাণু, ছাঁতক ও পরজীবী মুক্ত হতে হবে।
- ৪। প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে।
- ৫। খাদ্য হজমযোগ্য ও সহজপাচ হবে।
- ৬। খাদ্য খুব সুস্বাদু হতে হবে।
- ৭। খাদ্যের উৎপাদন খরচ কম হতে হবে।
- ৮। খাদ্যকে যে কোনো প্রকার দুর্গঞ্জমুক্ত হতে হবে।
- ৯। খাদ্য উপকরণ সহজলভ্য হতে হবে।



চিত্র : ফিস মিল

বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ মিশ্রিত করে পাখির রেশন তৈরি করা হয়। রেশন হচ্ছে ২৪ দফ্তায় কোনো পশু বা পাখি ঘারা গৃহীত খাদ্য। রেশন অবশ্যই পুষ্টি উপাদানে সুষম হতে হবে। যে রেশনে পাখির প্রয়োজনীয় শর্করা, আমিষ, চর্বি, খনিজ লবণ ও ভিটামিন উপস্থিতি থাকে তাকে সুষম রেশন বলে। সুষম খাদ্য বা রেশনের কাজ নিম্নে দেওয়া হলো।

- ১। খাদ্য বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।
- ২। খাদ্য শরীরে শক্তি যোগায়।
- ৩। খাদ্য দেহের বৃক্ষিতে সাহায্য করে।
- ৪। দেহের হাড় গঠনে সাহায্য করে।
- ৫। দেহ কোষের ক্ষয়পূরণ ও বৃক্ষি সাধন করে।
- ৬। দেহের পানির সমতা রক্ষা করে।
- ৭। দেহে রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে।
- ৮। দেহের রোগ প্রতিরোধ করে।
- ৯। ডিম ও মাস উৎপাদনে সাহায্য করে।



চিত্র : বিনুক/শামুকের উঁচু

মুরগির খাদ্য

যেহেতু মুরগি ডিম ও মাস উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়, তাই ডিমপাড়া মুরগি ও ব্রহ্মলার মুরগির জন্য পৃথক পৃথক রেশন তৈরি করা হয়। ডিমপাড়া মুরগি বা লেয়ার মুরগির ৩ প্রকার রেশনের নাম নিচে দেওয়া হলো।

- ১। লেয়ার স্টার্টার বা প্রারম্ভিক রেশন: ০-৮ সঙ্গাহ পর্যন্ত
 - ২। বাড়স্ত মূরগির রেশন: ৯-১৯ সঙ্গাহ পর্যন্ত
 - ৩। ডিমপাড়া বা লেয়ার মূরগির রেশন: ২০-৭২ সঙ্গাহ পর্যন্ত
- ত্রয়লার মূরগিকে ৩ প্রকার রেশন সরবরাহ করা হয়:
- ১। ত্রয়লার স্টার্টার বা প্রারম্ভিক রেশন: ০-২ সঙ্গাহ পর্যন্ত
 - ২। ত্রয়লার প্রোয়ার বা বাড়স্ত বাচার রেশন: ৩-৪ সঙ্গাহ পর্যন্ত
 - ৩। ত্রয়লার ফিনিশার রেশন: ৫-৬ সঙ্গাহ পর্যন্ত

খাদ্য উপকরণ: মূরগির খাদ্য তৈরিকে প্রধানত দানাশস্য ও এদের উপজাত ব্যবহার করা হয়। রেশন তৈরিক জন্য দানাশস্য হিসাবে প্রধানত গম, ভুট্টা ও ভূসি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বসতবাড়িতে পারিবারিক মূরগি পালনে যে কোনো শস্যদানা যেমন, ধান, চাল, খুদ, ডাল, সরিয়া ইত্যাদি মূরগিকে খেতে দেওয়া হয়। খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান, প্রাপ্যতা ও বাজারদর বিবেচনা করে রেশন তৈরিক জন্য নির্বাচন করতে হবে। নিম্নে পৃষ্ঠি উপাদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে খাদ্য উপকরণের একটি তালিকা দেওয়া হলো।

পৃষ্ঠি উপাদান	খাদ্য উপকরণ
শর্করা	গম, ভুট্টা, ধান, চাল, চালের কুড়া, গমের ভূসি ইত্যাদি।
আমিষ	শুটকি মাছের গুঁড়া, তিলের হৈল, সরিয়ার হৈল, সয়াবিন হৈল, রক্তের গুঁড়া ইত্যাদি।
জ্বেহ	বিভিন্ন উদ্বিজ তৈল যেমন: পাম তৈল, তিলের তৈল, সয়াবিন তৈল ইত্যাদি।
খনিজ পদার্থ	খাদ্য লবণ, কিনুক খোসা চূর্ণ, হাঁড়ের গুঁড়া, ডিমের খোসা, চুনা পাথর ইত্যাদি।
ভিটামিন	শাকসবজি, ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিয়া ইত্যাদি।
পানি	পরিষ্কার বিশুক জীবাণুমুক্ত পানীয় জল।

মূরগির খাদ্য গ্রহণ: লেয়ার ও ত্রয়লার মূরগির দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ মূরগির জাত, বয়স, তাপমাত্রা, খাদ্যের মান, বাসস্থান, খাদ্যের আকার ও পরিবেশনের উপর নির্ভর করে।

বয়স	মূরগি (গ্রাম/দিন)	ত্রয়লার (গ্রাম/দিন)
প্রথম সঙ্গাহ	১০	২৫
দ্বিতীয় সঙ্গাহ	২০	৬৫
তৃতীয় সঙ্গাহ	২৫	১০০
চতুর্থ সঙ্গাহ	৩০	১৩০
পঞ্চম সঙ্গাহ	৩৫	১৬০
ষষ্ঠ সঙ্গাহ	৩৭	১৬৫
সপ্তম সঙ্গাহ	৪০	----
অষ্টম সঙ্গাহ	৪৫	----
বাড়স্ত	৭০	----
বয়ক	১১৫	----

কাজ : ১০০টি বাড়ত লেয়ার মূলগি ৭ দিনে কী পরিমাণ খাদ্য এহণ করবে শিক্ষার্থীরা এককভাবে তা হিসাব করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

খাদ্য তৈরির নিয়মাবলি

গম বা ভূট্টাকে প্রথমে মেশিনে ভেঙে নিতে হবে। খৈলকেও ভালোভাবে গুঁড়া করে নিতে হবে। খাদ্য উপকরণ মাপার পক্ষা ব্যবহার করতে হবে। খাদ্য তৈরির জায়গা পরিষ্কার পরিজঙ্গল হতে হবে। প্রথমে গম বা ভূট্টা মেপে মেঝেতে ঢালতে হবে। তারপর চালের মিহিকুঁড়া ও গমের ভূসি, ভূসির উপর গুটকি মাছের গুঁড়া, তার উপর খৈল ও সয়াবিন মিল ঢালতে হবে। এভাবে সবগুলো উপকরণ ঢালার পর খাদ্যের স্ফুটিকে একটি পিরামিডের মতো দেখা যাবে। এবার বিনুকের গুঁড়া, হাঁড়ের গুঁড়া ও লবণ এই পিরামিডের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। এবার আধা কেজি খাদ্য আলাদা করে নিয়ে তার মধ্যে ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিয়া উন্নতমুক্ত করতে হবে। এরপর মিশ্রিত ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিয়া পিরামিডের উপর সমস্ত খাদ্য ছিটিয়ে দিতে হবে। সয়াবিন তৈল দেওয়ার প্রয়োজন হলে তা পিরামিডের চারদিকে ঢেলে দিতে হবে। এবার খাদ্যে স্ফুটির ভিতরে বার বার হাত ঢুকিয়ে সবগুলো উপকরণ ভালো ভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশ্রিত এ খাদ্য বাদামি রঞ্জের দেখাবে।

মূলগির জন্য বর্তমানে বিভিন্ন বাণিজ্যিক খাদ্য বাজারে পাওয়া যায়। এসব খাদ্য অত্যাখণ্টিক ফিল্ড মিলে তৈরি করা হয়। মূলগির বয়স ও উচ্চেশ্বর অনুসারে বাজারে ম্যাশ (পাউডার), ক্র্যাবল (দানা) ও পিসেট (বড়ি) আকারের খাদ্য বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

লেয়ার বা ডিমপাড়া মূলগির খাদ্য তালিকার বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের মিশ্রণ-

উপকরণের নাম	শতকরা হার (%)
গম/ভূট্টা ভাঙ্গা	৪৫-৫৫
গমের ভূসি	৮-১২
চালের মিহিকুঁড়া	১০-১৫
তিলের খৈল	১০-১৫
গুটকি মাছের গুঁড়া	১০-১২
বিনুক চূৰ্ণ ও হাঁড়ের গুঁড়া	১.৫-৩
লবণ	০.৫

বিশেষ মুষ্টাব্য:

- ১। ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ : উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রায় এ খাদ্যতালিকার সঙ্গে ঘোণ করতে হবে।
- ২। জীবাণুমুক্ত বিশেষ পানি : পর্যাপ্ত পরিমাণ

বিভিন্ন বয়সের প্রয়লার মুরগির খাদ্য তালিকা :

উপাদান	প্রারম্ভিক রেশন (%)	বৃদ্ধি রেশন (%)
গম/ভূটা ভাঙা	৫০	৫২
চালের মিহি গুঁড়া	১৫	১২
তিলের খৈল	১২	১০
পেটকি মাছের গুঁড়া	১৪	১২
সয়াবিন বিল	৮	৯
সয়াবিন তৈল	-	২
ইঁড়ের গুঁড়া	১.৫	২.৫
খাদ্য লবণ	০.৫	০.৫
সর্বমোট	১০০	১০০

কাজ :

শিক্ষাধীনীরা এককভাবে ১০০টি প্রয়লার মুরগির ১৪ দিনের প্রারম্ভিক রেশন তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

বিশেষ প্রটোক্স

- ১। ডিটাইল-খনিজ মিশ্রণ : উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রা খাদ্যতালিকার সঙ্গে যোগ করতে হবে।
- ২। জীবাণুমুক্ত বিত্তন পানি : পর্যাপ্ত পরিমাণ

নতুন শব্দ : ভরণপোষণ স্টার্টার রেশন, ঝোয়ার রেশন, ফিনিশার রেশন, লেয়ার রেশন। ম্যাশ, ক্র্যাচল ও পিলেট খাদ্য

হাঁসের খাদ্য

হাঁসকে জলজ পাখি বলা হয়। এরা খাল, বিল, পুকুর, হাঁওর ও নদীর ছোট জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। হাঁস তৃণলতা এবং খাবারের উচ্চিষ্টাংশ খেয়েও ভালো উৎপাদন দিতে পারে। হাঁসের খাবারের সাথে পানি মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। হাঁস শুক খাদ্যের চেয়ে ভেজা খাবার খেতে খুব পছন্দ করে। তাই এদেরকে সবসময় গুঁড়া ও ভেজা খাদ্য দেওয়া উচিত। প্রথম ৮ সপ্তাহ হাঁসকে গুচুর পরিমাণে খেতে দেওয়া উচিত। পরবর্তীতে সকালে ও সন্ধিয়া দিনে দুইবার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। হাঁসের বাচ্চাকে জন্মানোর পর প্রথম কয়েক দিন হাতে তুলে খাওয়াতে হয় যাতে করে বাচ্চারা খাবার খাওয়া শিখতে পারে।



চিত্র : হাঁসের বাচ্চা খাদ্য খাচ্ছে



চিত্র : হাঁসকে খাদ্য দেওয়া হচ্ছে

বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ মিশ্রিত করে মুরগির মতো হাঁসের রেশন তৈরি করা হয়। হাঁসের ও প্রকার রেশনের নাম নিচে দেওয়া হলো।

- ১। হাঁসের বাচ্চার বা প্রারম্ভিক রেশন : ০-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত
- ২। বাড়তি হাঁসের রেশন : ৫-১৯ সপ্তাহ পর্যন্ত
- ৩। ডিমপাড়া হাঁসের রেশন : ২০ সপ্তাহ থেকে বাকি সময় পর্যন্ত

হাঁসের খাদ্য গ্রহণ : হাঁসকে বয়স ও উদ্দেশ্য অনুসারে ও প্রকার রেশন সরবরাহ করা হয়। হাঁসের দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ হাঁসের জাত, বয়স, খাদ্যের মান, বাসস্থান ও খাদ্যের আকার ও পরিবেশনের উপর নির্ভর করে।

বয়স	হাঁস (গ্রাম/দিন)
প্রথম সপ্তাহ	১৫
দ্বিতীয় সপ্তাহ	২৫
তৃতীয় সপ্তাহ	৩০
চতুর্থ সপ্তাহ	৩৫
পঞ্চম সপ্তাহ	৪০
ষষ্ঠ সপ্তাহ	৪৫
সপ্তম সপ্তাহ	৫০
অষ্টম সপ্তাহ	৫৫
বাড়তি	৮৫
বয়স্ক	১২৫

বিভিন্ন বয়সের হাঁসের রেশন

উপকরণের নাম	উপকরণের শতকরা হার (%)
ভূট্টার গুঁড়া	৪৫-৫০
ধানের কুঁড়া	১০-১৫
খেল	১০-১৫
সয়াবিন মিল	৮-১০
গুটকি মাছের গুঁড়া	৮-১০
শামুকের খোসা চূর্ণ	১.৫-২.৫
খাদ্য লবণ	০.৫

কাজ : একটি বয়স্ক হাঁস ২০ সপ্তাহ পর্যন্ত মোট কী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করবে শিক্ষার্থীরা এককভাবে তা হিসাব করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

অষ্টম পরিচেছন গবাদিপশুর খাদ্য

প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য আবশ্যিক। যা কিছু দেহে আহার্যক্ষেত্রে গৃহীত হয় এবং পরিপাক, শোষণ ও বিপাকের মাধ্যমে দেহে ব্যবহৃত হয় বা শক্তি উৎপাদন করে তাকে খাদ্য বলে। যেমন- গম, ভূট্টা, ঘাস, খেল, ভুসি ইত্যাদি।

প্রচলিতভাবে গবাদি পশুর খাদ্যকে প্রধানত নিম্নোক্ত দুইভাবে ভাগ করা যায়। যথা-

১। ঔশ জাতীয় খাদ্য (Roughage feed)

২। দানাদার খাদ্য (Concentrate feed)

ঔশ জাতীয় খাদ্য

রাফেজজাতীয় খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ ঔশ (Fiber) এবং কম পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। যে কোনো খড়, প্রাকৃতিক বা চাষ করা সবুজ ঘাস, হে, সাইলেজ প্রভৃতি। রাফেজ জাতীয় ঘাস গবাদিপশু চারণভূমি থেকে পেঁচে থাকে বা ঘাস কেটে পশুকে সরবরাহ করা হয়। ভুলনামূলক বিচারে লিগিউম জাতীয় ঘাস যেহেন-আলফা-আলফা, কাউপি, খেসারি, মাসকলাই, ইপিল-ইপিল ইত্যাদিতে বেশি পরিমাণ প্রোটিন, শক্তি, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সাধারণ ঘাসের চেয়ে বেশি থাকে। সাধারণ ঘাসের মধ্যে ভূট্টা, নেপিয়ার, প্যারা, জার্মান প্রভৃতি প্রধান। এ জাতীয় ঘাসের সুবিধা হলো হেঁকের প্রতি এর ফলন অন্যান্য ঘাসের চেয়ে বেশি হয়।

দানাজাতীয় খাদ্য

যে খাদ্যে কম পরিমাণে ঔশ এবং বেশি পরিমাণে শক্তি পাওয়া যায় তাকে দানাদার খাদ্য বলা হয়। দুধাল বা মাস উৎপাদনকারী গবাদি পশুর ক্ষেত্রে শুধু ঔশজাতীয় খাদ্য সরবরাহ করলে কাঞ্চিত ফল পাওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

দানাজাতীয় খাদ্যকে নিম্নোক্ত উপায়ে ভাগ করা যায়-

ক) প্রাণিজ উৎস-ফিসমিল, ব্রাডমিল, ফেনোর মিল প্রভৃতি।

খ) উল্টিজ উৎস-গম, ভূট্টা, বার্জি, সরগাম, খুদ, খেল, কুঁড়া, ভুসি প্রভৃতি।

এ জাড়াও গবাদি পশুর খাদ্যে খনিজ উৎপাদন হিসাবে কিছু বিনুকের গুঁড়া, ভিমের খোসার গুঁড়া, হাঁড়ের গুঁড়া প্রভৃতি, ভিটামিন হিসাবে পাতাজাতীয় সবজি, ভিটামিন- মিলারেল প্রিমিজ এবং খাদ্য অনুষঙ্গ হিসাবে কিছু এন্টিবায়োটিক, হরমোন প্রভৃতি প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশে গবাদিপশুর খাদ্যের প্রাপ্তি কাতু ভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সবুজ ঘাস বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া যায় এবং এক্ষেত্রে ঘাস সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে রাখা যায় তাহলে সারা বছর সবুজ ঘাসের অপর্যাপ্ততা থাকবে না।

দুই পদ্ধতিতে ঘাস সংরক্ষণ করা যেতে পারে ।

ক । সাইলেজ

খ । হে

সাইলেজ

রসাল অবস্থায় ফুল আসার সময় সবুজ ও সতেজ ঘাসকে কেটে টুকরা করে সেগুলো বায়ুরোধী অবস্থায় সংরক্ষণ করাকে সাইলেজ বলে । বাণিজ্যিকভাবে সাইলেজিটে সাইলেজ সংরক্ষণ করা হয় । ভূটা, সরগাম, আলফা আলফা থেকে প্রস্তুতকৃত সাইলেজে বেশি পরিমাণে শক্তি পাওয়া যায় ।

সাইলেজ ব্যবহারের সুবিধা

- ১ । দীর্ঘ দিন পুষ্টিমান অঙ্গুল থাকে ।
- ২ । সঠিক সময়ে ঘাস কেটে সেগুলো কার্যকরী খাবার হিসাবে গবাদিপন্তকে সরবরাহ করা যায় ।
- ৩ । এতে হে-এর তুলনায় কম পুষ্টিমান অপচয় হয় ।
- ৪ । সাইলেজ তৈরির ফলে ঘাসের জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায় ।
- ৫ । সাইলেজ ঠাণ্ডা ও অর্দ্ধ আবহাওয়াতেও তৈরি করা যায় ।

সাইলেজ তৈরির পদ্ধতি

বিভিন্ন ধরনের ঘাস দিয়ে সাইলেজ তৈরি করা গেলেও ভূটা ও আলফা-আলফা দিয়ে তৈরি সাইলেজ অত্যন্ত উন্নত মানের হয় । ভূটার সাইলেজ গবাদি পন্ত বিশেষ করে দুধাল গাভীর জন্য অত্যন্ত উপকারী । ভূটার সাইলেজে বেশি পরিমাণে পুষ্টি উপাদান থাকে ।

ভূটার গাছের গোড়ায় কালো দাগ আসার সাথে সাথে সাইলেজ প্রস্তুতের জন্য ভূটা কাটার উপযোগী হয় । এ সময়ে ভূটা গাছের তক্ষ পদার্থের পরিমাণ ৩০-৩৫% হয় । ভূটা গাছগুলোকে ভূমি থেকে ১০-১২ সেমি উচ্চতে কাটা হয় । এরপর এগুলোকে কেটে টুকরা টুকরা করা হয় । টুকরা করা ঘাস গর্তে বায়ুরোধী অবস্থায় রেখে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় । তবে বর্তমানে গর্তের পরিবর্তে পলিথিন দিয়ে তৈরি বড় আকারের ব্যাগে সংরক্ষণ করা যায় । টুকরা করা গাছগুলো ব্যাগের ভিতর চুকিয়ে বায়ু মুখ বক্ষ করে দেওয়া হয় যাতে বাতাস চলাচল করতে না পারে । এভাবে সংরক্ষণ করলে কোনো পুষ্টি উপাদান না হারিয়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী থেকেনো সময়ে পন্তকে সরবরাহ করা যায় ।

সাইলেজ তৈরির সময় গাছ টুকরা করা ও বায়ুরোধী করার উদ্দেশ্য :

- ১ । গাঁজনের জন্য বেশি পরিমাণে গাছের সুগার অবযুক্ত হতে পারে ।
- ২ । বায়ুরোধী হলে সুষ্ঠুভাবে গাঁজন সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাকটিক এসিড তৈরি হয় ।

কোনো খাদ্য উপাদানের অপচয় ব্যতিরেকে ঘাস সংরক্ষণের জন্য এটা একটা কার্যকর ব্যবস্থা। সাইলেজ বায়ুরোধী পরিবেশে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ অঙ্কুশ রেখে ক্ষতিকর ইস্ট, মোন্ট, ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে নীর্ধনিত রক্ষা করে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়।

হে

হে অতি পরিচিত এবং সবুজপূর্ণ সংরক্ষিত খাদ্য যা সারা বছর পরাদিপন্তকে সরবরাহ করা যায়। সবুজ ঘাসকে শকিয়ে এর আন্তর্ভূত ২০% বা তার নিচে নাহিয়ে এনে হে প্রস্তুত করা হয়। হে তৈরির জন্য এক বা একাদিক লিগিউম জাতীয় ঘাস চাষ করা যায়। লিগিউম ঘাসে সাধারণ ঘাসের তুলনায় বেশি মাত্রায় প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান থাকে। লিগিউম গাছের মূলে রাইজেবিয়াম নামক ব্যাকটেরিয়া বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ধরে রাখে যা প্রোটিন গঠনের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে লিগিউম ছাড়াও সাধারণ ঘাস দিয়ে হে তৈরি করা হতে পারে।

গুণগত মানের হে-এর বৈশিষ্ট্য

হে এর খাদ্যমান ঘাসের গুণগতমানের উপর নির্ভর করে। হে-এর গুণগতমান ঘাসের পূর্ণতাপ্রাপ্তি, পাতার পরিমাণ, ঘাসের রং প্রভৃতি দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

- ১। হে এর জন্য ব্যবহৃত ঘাস পাতা সমৃক্ষ হতে হবে। হে পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্ত হতে হবে। পাতার পরিমাণ গ্রহণ হতে হবে যাতে দুই-তৃতীয়াংশ পুষ্টি উপাদান পাতার মধ্যে থাকে।
- ২। হে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের হতে হবে যাতে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন বা ভিটামিন এ বিদ্যমান থাকে। বেশি আর্দ্রতা থাকার কারণে বা অত্যধিক তাপের কারণে হে বাদামি বর্ণের হতে পারে যেটা পুষ্টি উপাদান কমে ঘাওয়ার নির্দেশনা হিসাবে বিবেচিত হবে।
- ৩। হে আগাছামুক্ত হতে হবে।
- ৪। হে মোন্ট ও খুলা বালিমুক্ত হতে হবে।
- ৫। হেতে খাওয়ার উপযোগী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গন্ধ থাকতে হবে।

হে তৈরির পদ্ধতি

গাছ কাটার সময় : হে তৈরির জন্য সঠিক পূর্ণতা প্রাপ্তির সময়ে গাছ কাটিতে হবে। যত কম বয়সে গাছ কাটা যাবে, হে এর গুণগতমান তত বেশি হবে। যত বেশি বয়সে গাছ কাটা হবে, হে এর গুণগতমান তত কমে যাবে। তবে ফুল আসার সময় কাটাই উচ্চম।

সঠিকভাবে শকানো : হে তৈরির সময় গাছকে সঠিকভাবে শকাতে হবে যাতে করে মোন্ট মুক্ত ও অতিরিক্ত তাপমুক্ত অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়। গাছগুলোকে দ্রুত শকাতে হবে এবং অতিরিক্ত সূর্যের আলো পরিহার করতে হবে যাতে করে ভালো মানের হে এর বৈশিষ্ট্যগুলো ধরে রাখা যায়। গাছ কেটে রোদে উলটপালট করে এমনভাবে নেড়ে দিতে হবে যাতে করে অতিমাত্রায় পাতা ঝরে না যায়। সবুজ ঘাসে সাধারণত ৭৫-

৮০ ভাগ অর্দ্ধতা থাকে। হেখানে ভালো মানের হে তে সর্বোচ্চ ২০-২৫ ভাগ অর্দ্ধতা থাকে। রোদে তকানোর সময় বৃষ্টির পানিতে ভেজানো যাবে না।

হে সরক্ষণ : হে অবশ্যই শুক অবস্থায় সরক্ষণ করতে হবে।

- কাজ :**
- ১। শিকারীরা আঁশজাতীয় খাদ্যের পরিবর্তে শুধু দানাদার খাদ্য সরবরাহ করে গবাদি পশু পালন সম্ভব কিনা এ বিষয়ে প্রতিবেদন লিখে জমা দিবে।
 - ২। শিকারীরা সাইলেজ তৈরি করবে এবং এর ধাপগুলো লিখে জমা দিবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আলুর কোন রোগ ব্যাপক ক্ষতি করে ?

- | | |
|------------------|-------------------|
| ক. আলুর মড়ক রোগ | খ. ঢলে পড়া রোগ |
| গ. কাঞ্চপচা রোগ | ঘ. ভাইরাসজনিত রোগ |

২. পুকুরের পানিতে দ্রব্যভূত অ্বিজেন কমপক্ষে কত ভাগ হওয়া প্রয়োজন ?

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ক. ২ মি গ্রাম/লিটার | খ. ৩ মি গ্রাম/লিটার |
| গ. ৫ মি গ্রাম/লিটার | ঘ. ৭ মি গ্রাম/লিটার |

৩. গোল আলুর মড়ক রোগ দেখা দেখ -

- i. নিম্ন তাপমাত্রায়
- ii. ঘন কুয়াশায়
- iii. অতিরিক্ত বৃষ্টির সময়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i & ii | খ. i & iii |
| গ. ii & iii | ঘ. i, ii & iii |

নিচের উভীপক্টি পড় ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ফরিদা বেগম তার বাড়ির দক্ষিণ পাশের ১৫ শতকের একটি পুরুর মাছ চাষের জন্য প্রস্তুত করেন। তিনি তার পুরুরে উপযুক্ত মাঝার সাথে ও চুন প্রয়োগ করেন। পোনা ছাড়ার পর দেখা গেল অধিকাংশ পোনাই মারা গিয়েছে।

৪. ফরিদা বেগমের পুরুরের জন্য কত কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে?

ক. ২০ কেজি

খ. ২৫ কেজি

গ. ৩০ কেজি

ঘ. ৩৫ কেজি

৫. পুরুরের পোনা মারা যাওয়ার কারণ-

i. পানির তাপমাত্রার পার্থক্য

ii. ক্ষতিকারক পরজীবীর আক্রমণ

iii. অক্সিজেনের ভিন্নতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i & ii

খ. i & iii

গ. ii & iii

ঘ. i, ii & iii

সূজনশীল প্রশ্ন

১. কলক বড়ুয়া পত পালনের জন্য চারণ ভূমি তৈরি করেছেন। বর্ষা মৌসুমে তার চারণ ভূমিতে ব্যাপক হারে ঘাস উৎপাদন হলেও তাক মৌসুমে ঘাসের চাহিদা হেটাতে পারেন না। এজন্য তার পতঙ্গলোর সাথে বছরের প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য কাঁচা ঘাসের যথোপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। এরপর কলক বড়ুয়া তার প্রতিবেশী অনেককেই উক্ত পদ্ধতিতে গো-খাদ্য সংরক্ষণের উন্নত করলেন।

ক. গো- খাদ্য কাকে বলে?

খ. দানাজাতীয় খাদ্য কীভাবে পতের উৎপাদন বাড়ায় ব্যাখ্যা কর।

গ. কলক বড়ুয়ার গৃহীত পদ্ধতিটির তৈরি কৌশল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কলক বড়ুয়ার কার্যক্রমটি মূল্যায়ন কর।

২. বেকার মুখক মহিমুল্লাহ বঙ্গড়া পর্যটী উন্নয়ন একাডেমী থেকে মৎস্য চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে মাছ চাষের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ৫০ শতাংশের পুরুর সংস্কার করে কার্প জাতীয় মাছ চাষের জন্য প্রস্তুত করেন। প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগের পর মাছের পোনা মজুদ করেন। মজুদ পরবর্তী সময়ে সার প্রয়োগের জন্য সেকিডিক্ষ ব্যবহার করে পুরুরের প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করেন। বর্তমানে সফল মৎস্য চাষি হিসাবে তিনি এলাকায় পরিচিত।

৩. মাছের চাষের জন্য পুরুরের পানিতে প্রতি লিটারে কী পরিমাণ দ্রবীভূত অঙ্গিজেনের প্রয়োজন?

৪. চুন পাথরের পানির শুণগত মান বৃক্ষি করে ব্যাখ্যা কর।

৫. মহিমুল্লাহ তার পুরুর প্রস্তুতির সময় কান্টটুকু গোবর প্রয়োগ করেছিল হিসাব করে দেখাও।

৬. মহিমুল্লাহর পুরুরে সার প্রয়োগ পদ্ধতি অর্থের অপচয় রোধ করে বেশি উৎপাদনে সহায়ক বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

কৃষি ও জলবায়ু

এ অধ্যায়ে প্রথমে প্রতিকূল পরিবেশ ও বিরুপ আবহাওয়া সহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাতের বৈশিষ্ট্য, শুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে ফসল, মৎস্য ও পশ্চপাখি উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের শেষ দিকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ফসল, মৎস্য ও পশ্চপাখির অভিযোজন কৌশল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বিরুপ আবহাওয়া-সহিষ্ণু ফসলের জাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- বিরুপ আবহাওয়া-সহিষ্ণু ফসলের শুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষি ক্ষেত্রের (ফসল, মৎস্য ও পশ্চপাখি) উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারব।
- কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারব।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ফসল, মৎস্য ও পশ্চপাখির অভিযোজন কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ফসল, মৎস্য ও পশ্চপাখির অভিযোজনের উপযোগিতা মূল্যায়ন করতে পারব।

প্রথম পরিচেছনা

বিকল্প আবহাওয়া-সহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাত

অষ্টম শ্রেণিতে আমরা প্রতিকূল পরিবেশ ও বিকল্প আবহাওয়া সম্পর্কে জেনেছি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল বা বিকল্প আবহাওয়া বিরাজ করে। শীতকালে অতি শৈত্য বা কম শৈত্য পড়া, গ্রীষ্মকালে অতি উচ্চ তাপমাত্রা, খরা, লবণাক্ততা, বন্যা বা জলাবদ্ধতা হলো বাংলাদেশের ফসল উৎপাদনে প্রতিকূল পরিবেশ ও বিকল্প আবহাওয়া। পূর্বপ্রস্তুতি ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা না থাকলে এ ধরনের প্রতিকূল পরিবেশ বা বিকল্প আবহাওয়ায় ফসলের ফলন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। বিকল্প আবহাওয়া বা প্রতিকূল পরিবেশে ফসল উৎপাদনের পূর্ব শর্ত হলো উপরোগী ফসল বা ফসলের জাত নির্বাচন। বিভিন্ন ধরনের বিকল্প আবহাওয়া বা প্রতিকূল পরিবেশ-সহিষ্ণু ফসল বা ফসলের জাত রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে বেশ কিছু ফসলের প্রতিকূল পরিবেশ-সহিষ্ণু নতুন জাত বের করেছেন এবং আরও জাত বের করার জন্য গবেষণা চালিয়ে আছেন। আমরা এখন বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল আবহাওয়া-সহিষ্ণু ফসল বা ফসলের জাত নিয়ে আলোচনা করব।

শৈত্য সহিষ্ণু ফসল

বাংলাদেশে নভেম্বর থেকে জেনুয়ারি মাস পর্যন্ত শীতকাল। শীতকালে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা জানুয়ারি মাসে হয়ে থাকে। শীতকালে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে থাকে। আমাদের দেশে শৈত্য বেশি পড়লে এবং শৈত্যজ্য নীরবস্থায়ী হলে শীতকালীন ফসল, যেমন—গোলজালু ও গমের ফলন ভালো হয়। তবে রোপা আমন ও বোরো ধানের পরাগায়ণ ও দানা গঠনের সময় শৈত্য বেশি পড়লে অর্ধাং তাপমাত্রা কমে গেলে চিটা হয়ে ফলন কমে যায়। এ সময় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে গেলে এবং কয়েকদিন এ অবস্থা স্থায়ী হলে ফলন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এ জন্য সঠিক সময়ে বীজ বপন ও চারা রোপণ করতে হবে। ত্রি ধান ৩৬ ও ত্রি ধান ৫৫ এ দুটি শৈত্য সহিষ্ণু ধানের জাত। এর মধ্যে ১টি জাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো :

ত্রি ধান ৫৫ : এ জাতটি ২০১১ সালে অনুমোদন লাভ করে। আগাম ও উচ্চফলনশীল এ জাতের গাছের উচ্চতা ১০০ সেমি. বোরো মৌসুমে হেটের প্রতি গড় ফলন ৭ টন এবং আউশ মৌসুমে ৪.৫ টন। বোরো মৌসুমে জাতটি মাঝারি শৈত্য সহ্য করতে পারে বলে দেশের শৈত্য-প্রবণ এলাকায় চাষ করা যায়। তাছাড়া জাতটি মাঝারি লবণাক্ততা এবং খরাও সহ্য করতে পারে। জাতটির জীবনকাল বোরো মৌসুমে ১৪৫ দিন এবং আউশ মৌসুমে ১০০ দিন।

খরা সহিষ্ণু ফসল

আমরা জানি শুক মৌসুমে একটানা ২০ দিন বা তার অধিক দিন কোনো বৃষ্টিপাত না হলে তাকে খরা বলে। অনাবৃষ্টি বা বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার কারণে জমিতে পানির ঘাটতি দেখা যায়। ফলে উদ্ধিদ দেহে প্রয়োজনীয় পানির ঘাটতি দেখা দেয়। এ অবস্থাকে খরা কবলিত বলা হয়। প্রতিবছর দেশে রবি, খরিপ-১ ও খরিপ-২ মৌসুমে ৩০-৪০ লাখ হেক্টের জমি বিভিন্ন মাঝারি খরার সম্মুখীন হয়। এতে করে খরার তীব্রতা অনুযায়ী ১৫-১৯ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়ে থাকে। খরাপ্রবণ এলাকায় ফসল চাষের কলাকৌশল সম্পর্কে আমরা অষ্টম

শ্রেণিতে বিস্তারিত জেনেছি। সেসব কৌশলের মধ্যে অন্যতম কৌশল হলো খরা প্রবণ এলাকায় খরা সহিষ্ঠ ফসল বা ফসলের জাত চাষ করা। সাধারণত খরা সহিষ্ঠ ফসলের মূল খুব দৃঢ় ও শাখা-প্রশাখাযুক্ত এবং গভীরমূলী হয়। এ সব ফসলের পাতা ছোট, সরু, পুরু বা পেঁচানো হয়ে থাকে। খেজুর, কুল, অড়হর, তরমুজ, অনেক জাতের গম ইত্যাদি খরা সহিষ্ঠ ফসল। এখন আমরা প্রধান প্রধান কয়েকটি খরা সহিষ্ঠ ফসলের জাত সম্পর্কে আলোচনা করবো।

কাজ : শিক্ষার্থীরা খরা ও শৈত্য-সহিষ্ঠ ফসলের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে এবং খরা-সহিষ্ঠ ফসল ও ফসলের জাতের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

খরা সহিষ্ঠ ধানের জাত :

ত্রি ধান ৫৬ ও ত্রিধান ৫৭ দুইটি খরা সহিষ্ঠ ধানের জাত। এর মধ্যে ত্রি ধান ৫৭ এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো :

ত্রি ধান ৫৭ : এ জাতটিও রোপা আমন। গাছের উচ্চতা ১১০-১১৫ সেমি জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন। প্রজনন পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৮-১৪ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলমের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। খরা কবলিত অবস্থায় জাতটি হেঁটেরপ্রতি ৩.০-৩.৫ টন এবং খরা না হলে ৪.০-৪.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম। ত্রি ধান ৫৬ ও ত্রি ধান ৫৭ এর জীবনকাল কম বলে এরা খরা সহ্যের পাশাপাশি খরা এড়াতেও পারে।

খরা সহিষ্ঠ গমের জাত :

বারি গম ২০ (গৌরব) ও বারি গম ২৪ (প্রদীপ) দুইটি খরা সহিষ্ঠ গমের জাত। এর মধ্যে বারি গম ২৪ এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো :

বারি গম ২৪ (প্রদীপ) : এ জাতটি মধ্যম খাটো, উচ্চ ফলনশীল এবং খরা সহিষ্ঠ। এ জাতের পাতা চওড়া, বৌকানো ও হালকা সবুজ রঙের। জাতটির জীবনকাল ১০২-১১০ দিন এবং ফলন ৪.৩-৫.১ টন/হেক্টর।

উৎপরনী ৩৫ : এ জাতটির ফলন ৯৪ টন/হেক্টর। আরেক অন্যান্য খরা সহিষ্ঠ জাতের মধ্যে রয়েছে উৎপরনী ৩৩, উৎপরনী ৩৭, উৎপরনী ৩৯ ও উৎপরনী ৪০ ইত্যাদি।

খরা সহিষ্ঠ অন্যান্য ফসলের জাত :

বারি ছোলা-৫ (পাবনাই) : হালকা সবুজ রঙের এ জাতের গাছের উচ্চতা ৫০ সেমি বীজ ছোট, মসৃণ ও ধূসর বাদামি রঙের, জীবনকাল ১২৮-১৩০ দিনের এবং ফলন ২.৪ টন/হেক্টর হয়ে থাকে। খরা-প্রবণ বরেন্ট্র এলাকায় অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এ জাতের ছোলা বপন করতে হয়। খরা সহিষ্ঠ অন্যান্য জাতের মধ্যে রয়েছে বারি বার্লি-৬, বারি বেঙ্গ-৮, বারি হাইব্রিড টমেটো-৩ ও বারি হাইব্রিড টমেটো-৪, সবজি মেশ্প্যাড ইত্যাদি।

লবণাক্ততা সহিষ্ঠ ফসল

লবণাক্ত মাটি থেকে ফসলের পানি সঞ্চাহ করতে অসুবিধা হয়। লবণাক্ততার মাত্রা বেশি হলে ফসল জন্মাতে পারে না। জলবায় পরিবর্তনের কারণে দেশের দক্ষিণাধ্যলের উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ততার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জন্য উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত সহিষ্ঠ ফসল বা ফসলের জাতের আবাদ এলাকা বাড়াতে হবে।

নিচের ছকে লবণ্যাকৃতা সহিষ্ণু ও লবণ্যাকৃতায় সংবেদনশীল কিছু ফসলের তালিকা দেওয়া হলো :

উপকূলীয় লবণ্যাকৃতা সহিষ্ণু	মধ্যম লবণ্যাকৃতা সহিষ্ণু	লবণ্যাকৃতা সহিষ্ণু
নারিকেল	মিটি আলু	শিম
সুপারি	গোল আলু	লেবু
তাল	মরিচ	কমলা
বার্শি	বরবটি	গাজর
খেজুর	মুগ	পিয়াজ
সুগারবিট	খেসারি	স্ট্রবেরি
শালগম	মটর	মসুর
তুলা	ফুব	আম
ধৈঝো	ভুট্টা	ডালিম
পালঃশাক	টমেটো	
	আমড়া	
	পেয়ারা	

উপকূলীয় লবণ্যাকৃতা এলাকায় ধান প্রধান ফসল। ধানের কিছু স্থানীয় ও উন্নত জাত রয়েছে যারা বিভিন্ন মাত্রার লবণ্যাকৃতা সহ্য করতে পারে। স্থানীয় জাতের মধ্যে রয়েছে- রাজাশাইল, কাজলশাইল, বাজাইল, কালামানিক, গুরচা, গাবুরা ইত্যাদি। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট ইতোমধ্যে বেশ কিছু লবণ্যাকৃতা সহিষ্ণু জাতের ধান বের করেছে। যেমন- ত্রি ধান ৪০, ত্রি ধান ৪১, ত্রি ধান ৪৭, ত্রি ধান ৫৩, ত্রি ধান ৫৪ ও বিনা ধান ৮। এইসব জাতের মধ্যে ২টি প্রধান জাতের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো :

ত্রি ধান ৪৭ : ২০০৬ সালে এ জাতটি লবণ্যাকৃতবল এলাকায় বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে। এ জাত চারা অবস্থায় বেশি লবণ্যাকৃতা সহ্য করতে পারে এবং বয়স্ক অবস্থায় নিম্ন হতে মধ্যম মাত্রার লবণ্যাকৃতা সহ্য করতে পারে। জাতটির গাছের উচ্চতা ১০৫ সেমি জীবনকাল ১৫২ দিন এবং লবণ্যাকৃত পরিবেশে হেঁটেরপ্রতি ৬ টন ফলন দিতে সক্ষম।

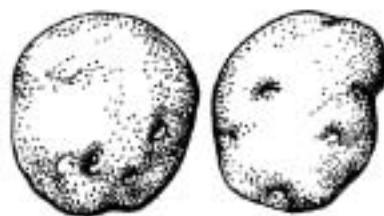
বিনা ধান ৮ : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট থেকে ২০১০ সালে লবণ্যাকৃতা সহনশীল এ জাতটি বের হয়। বোরো মৌসুমের এ জাতটির জীবনকাল ১৩০-১৩৫ দিন। লবণ্যাকৃত এলাকায় হেঁটেরপ্রতি ফলন ৪.৫-৫.৫ টন। জাতটির বিভিন্ন ধরনের রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতাও রয়েছে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সমৃদ্ধ উপকূলবর্তী এলাকায় চাষ উপযোগী লবণ্যাকৃতাসহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাতের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

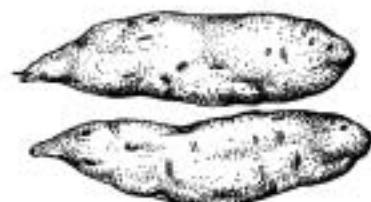
লবণাক্ততা সহিষ্ণু অন্যান্য ফসলের জাত

বারি আলু ২২ (সেকত) : এ জাতের আলুর আকার লম্বাটে গোল এবং লাল রঙের। জাতটির ফলন ২০-৩০ টন/হেক্টর।

বারি মিটি আলু-৬ ও ৭ : এ জাত দুটোর আলুর খেসার রং গাঢ় কমলা রঙের, ভিতরটা হালকা কমলা রঙের। আলুতে মধ্যম মাত্রায় ক্যারোটিন এবং শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে। ফসল সঞ্চাহ করতে ১২০-১৩০ দিন সময় লাগে। জাত দুটি সাধারণ পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৪০-৪৫ টন এবং লবণাক্ত পরিবেশে ১৮-২০ টন ফলন দিতে পারে।



চিত্র : বারি আলু ২২



চিত্র : বারি মিটি আলু ৬

বারি সরিষা-১০ : এ জাতের সরিষার গাছ খাটো, উচ্চতা ৮০-১০০ সেমি, জীবনকাল ৮৫-৯০ দিন এবং ফলন ১.২-১.৪ টন/হেক্টর। জাতটি লবণাক্ততার পাশাপাশি ধরা ও সহজ করতে পারে।

লবণাক্ততা সহিষ্ণু আখের জাত

ঈশ্বরদী ৩৯ ও ঈশ্বরদী ৪০ এর মধ্যে ঈশ্বরদী ৪০ এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো :

ঈশ্বরদী ৪০ : ঈশ্বরদী ৩৯ জাতের মতো এ জাতটিতেও উচ্চমাত্রায় চিনি পাওয়া যায়। উচ্চ ফলনশীল এ জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল ও আগাম পরিপন্থতা গুণসম্পদ এবং অঞ্চল ভেদে ফলন ৮৫-৯৫ টন/হেক্টর। এ জাতটির লবণাক্ততার পাশাপাশি বন্যা ও ধরা সহজ করতে পারে।



চিত্র : ঈশ্বরদী ৪০

বন্যা বা জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ফসল

বাংলাদেশে প্রতিবছর কম-বেশি বন্যা হয়ে থাকে। বন্যাজনিত সাময়িক জলাবদ্ধতা ছাড়াও দেশের কিছু অঞ্চলে স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে, যেমন-খুলনা ও যশোর জেলার ভবদহ এলাকা। বন্যার কারণে বা অন্য কোনো কারণে সৃষ্টি জলাবদ্ধতা, জলজ উদ্ধিদ ছাড়া বেশিরভাগ উদ্ধিদ সহজ করতে পারে না।

দেশের বিশুর্ত বন্যাপ্রবণ এলাকার প্রধান ফসল ধান। বন্যা সহিষ্ণু ছানীয় জাতের গভীর পানির আমন ধানের মধ্যে রয়েছে—বাজাইল ও ফুলকড়ি। বন্যার পানির উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে এ সব জাতের ধান গাছের উচ্চতাও বাড়তে থাকে। এমনকি দিনে ২৫ সেমি পত্তন বাড়তে পারে এবং ৪ মিটার গভীরতায়ও বেঁচে থাকতে পারে। উচ্চ জাতের আমন ধানের মধ্যে আছে ত্রি ধান ৪৪। এ জাতের ধান জোয়ার-ভট্টা অঞ্চলে ৫০ সেমি উচ্চতার প্রাবন সহজ করতে পারে।

বন্যাপ্রবণ এলাকার বন্যার পানি নেমে গেলে নাবী জাতের আমন ধান চাষ করে বন্যার ক্ষতি পূর্ষিয়ে নেওয়া যায়। নাবী জাতের মধ্যে রয়েছে—বিআর ২২ (কিরণ) ও বিআর ২৩ (দিশারী)। কিরণ ও দিশারী জাত দুইটি দেশের বন্যা প্রবণ এলাকায় বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর থেকে ১৫ই আশ্বিন পর্যন্ত রোপণ করা যায়। জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে ৪০-৫০ দিনের চারাও রোপণ করা যায়। ফলে উচ্চ জোয়ার থেকে ফসল বৈচে। আমন মৌসুমে এ এলাকায় চাষাবাদের জন্য সম্প্রতি বের হওয়া জাত দুটি হলো—ত্রিধান ৫১ ও ত্রিধান ৫২।

ত্রিধান ৫১ ও ত্রিধান ৫২ : ঢল বন্যাপ্রবণ এলাকায় আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ২০১০ সালে এ জাতটি অনুমোদন লাভ করে। এ জাত দুটির চারা রোপণের এক সম্ভাব্য পর ১০-১৪ দিন পানির নিচে ছুবে থাকলেও চারা মরে না বিধায় ফসল করে না। বন্যামুক্ত পরিবেশে এ জাতের জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন ও ফসল ৪.৫-৫.০ টন/হেক্টর এবং বন্যাকবলিত হলে জীবনকাল ১৫৫-১৬০ দিন ও ফসল ৪.০-৪.৫ টন/হেক্টর।

জলাবদ্ধতা বা বন্যা সহিষ্ণু অন্যান্য ফসলের জাত

আখের জাত

ঈশ্বরদী ৩২ : বন্যা বা জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু এ জাতটির ফসল হেক্টরপ্রতি ১০৪ টন।

ঈশ্বরদী ৩৮ : এ জাতের আখে উচ্চমাত্রায় চিনি থাকে। জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল ও আগাম পরিপন্থতা গুণ সম্পন্ন। জাতটির ফসল ১১৩ টন/হেক্টর এবং উচ্চমাত্রায় বন্যা সহিষ্ণু। এ জাতগুলো ছাড়াও ঈশ্বরদী-৩৪, ঈশ্বরদী-৩৬, ঈশ্বরদী-৩৭, ঈশ্বরদী-৩৯, ঈশ্বরদী-৪০ জাত উচ্চ মাত্রায় বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।

কেনাফের জাত

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউট থেকে উদ্ভাবিত বিজেআরআই কেনাফ-৩ (বট কেনাফ) জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। কেনাফ পাটের মতো একধরনের আঁশ ফসল। এ জাতের কেনাফের পাতা অর্ধও ও বট পাতার ন্যায় এবং ফসল ৩.৫ টন/হেক্টর।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বন্যা ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাতের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : শৈত্য সহিষ্ণু ফসল, বন্যা বা জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ফসল

ধ্বনির পরিচেছন জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষিক্ষেত্রে প্রভাব

বাংলাদেশে ফসল উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

সৃষ্টির স্বীকৃত থেকেই পৃথিবীর জলবায়ু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে প্রাণী ও উদ্ভিদের বসবাস উপরোক্তি হয়ে উঠে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের এ ধারা অত্যন্ত ধীর গতিতে অব্যাহত ছিল। কিন্তু বিগত এক শতকে পৃথিবীর অনেক দেশে জলবায়ুর উচ্চে ঘোষণা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তন প্রকৃতিতে বিকল্প প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। এ পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত বিশ্ব। নগরায়ন, যাত্রিক সম্ভাবনা, কলকারখানার প্রসার, জ্বালানি তেল ও কয়লার ব্যবহার, বৃক্ষনির্ধন ইত্যাদির কারণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রিন্টার্স গ্যাসের পরিমাণ বাঢ়ছে। ফলে বৈশিষ্ট্য তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আজ বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন দেশ বলে চিহ্নিত হয়েছে। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন গ্রিপোর্ট (২০০৭-০৮) বলা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ৭ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভৌগলিক অবস্থান এবং ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ আগে থেকেই পৃথিবীর একটি অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দুর্যোগের মাঝাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। IPCC (Inter Governmental Panel on Climate Change) সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে—

- ১। বাংলাদেশের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ১৯৮৫-১৯৯৮ সালের মধ্যে মে মাসে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং নভেম্বর মাসে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২। বাংলাদেশের ৮ লাখ ৩০ হাজার হেক্টের জমিতে লবণাক্ততা দেখা দিয়েছে।
- ৩। বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০০২, ২০০৩, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে বন্যা হয়েছে অর্ধেক ভয়াবহ বন্যার সংখ্যা বেড়েছে।
- ৪। বঙ্গোপসাগরে খূর্চিকাড়ের সংখ্যা বেড়েছে।
- ৫। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের লোনা পানি নদীগুলি দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রবেশ করেছে।

দেশের পরিবেশ ও উৎপাদন শ্রেষ্ঠাপটসমূহ বিবেচনার জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও বৃক্ষিক্ষয় ঘট হচ্ছে কৃষি ক্ষেত্র। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশে বিভিন্ন রকম বিকল্প অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে; যেমন—

- ১। গ্রীষ্মকালে অতি উচ্চ তাপমাত্রা
- ২। অনিয়মিত ও অসময়ে বৃষ্টিপাত
- ৩। অল্প সময়ে অধিক বৃষ্টি এবং তার ফলে জলাবদ্ধতা ও ভূমিধস
- ৪। শুষ্ক ছৌসুম্যে কম বৃষ্টিপাত
- ৫। বন্যার ভয়াবহতা ও সংখ্যা বৃদ্ধি
- ৬। আকশ্মিক বন্যা ও খরার ফলে ফসলহানি
- ৭। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও গরম
- ৮। উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ও ভূমিক্ষয়
- ৯। আড়-জলোজ্বাসের তীব্রতা ও সংখ্যা বৃদ্ধি
- ১০। কুয়াশা, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি

কাজ : শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্টি বিভিন্ন ধরনের বিকল্প আবহাওয়ার একটি তালিকা তৈরি করবে।

ফসল উৎপাদনে তাপমাত্রার প্রভাব

আমরা আগেই জেনেছি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল ও শীতকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি গ্রীষ্ম ও শীতকালে তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধির অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করা যাচ্ছে। কখনো কখনো গ্রীষ্মকালে অতি উচ্চ তাপমাত্রা এবং শীতকালে অভ্যাধিক শীত পড়তে দেখা যাচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে উফশী ধানের ফলন কমে যাবে এবং গমে রোগের আক্রমণ বেড়ে যাবে। এখনকার চেয়ে দেশের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে গম চাষ সম্ভব হবে না। আলু ও অন্যান্য শীতকালীন ফসল উৎপাদনে ধস নামবে। ধানের জন্য অসহ্য গরম তাপমাত্রা হলো ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফুল ফোটার সময় ধানগাছ সবচেয়ে বেশি কাতর। এ সময় তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তারও বেশি হলে চিটার পরিমাণ বেড়ে যায়। নিম্ন তাপমাত্রার কারণে ধানগাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহুত হয়, ধানগাছ হলদে বর্ণ ধারণ করে, ধানের চারা দুর্বল হয় এবং ফসলের জীবনকাল বেড়ে যায়।

ফসল উৎপাদনে খরার প্রভাব

বাংলাদেশে ফসল উৎপাদনে খরা অন্যতম একটি প্রাকৃতিক দুর্বোগ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। ফসলের বৃদ্ধি পর্যায়ে গড় বৃষ্টিপাতের অভাবে মাটিতে পানি শূন্যতা সৃষ্টি হয়। কম বৃষ্টিপাত ও অধিক হারে মাটি থেকে পানি বাস্পীভূত হওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্রে খরার প্রভাব দেখা দেয়। দেশে প্রতি বছর ৩০-৪০ লাখ হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রার খরায় কবলিত হয়ে থাকে। খরাপ্রবণ এলাকায় ফসলের ফলন নির্ভর করে খরার তীব্রতা, খরার হিতাকাল এবং ফসলের বৃদ্ধি পর্যায়ের উপর। ফসলে ক্ষতির মাত্রার উপর নির্ভর করে খরাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যেমন-

- ১। তীব্র খরা (৭০-৯০ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়)
- ২। মাঝারি খরা (৪০-৭০ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়)
- ৩। সাধারণ খরা (১৫-৪০ ভাগ ফলন ঘাটতি হয়)

কাজ : শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ফসল উৎপাদনে খরার প্রভাব সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করবে ও প্রেরিতে উপস্থাপন করবে।

ফসল উৎপাদন মৌসুমের উপর ভিত্তি করে খরাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- রবি খরা, খরিপ-১ খরা ও খরিপ-২ খরা।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খরার তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা ও টাঙ্গাইল জেলার কিছু অংশে তীব্র খরা প্রবণ এলাকা। রংপুর ও বারিশাল জেলা এবং দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার কিছু অংশ মাঝারি খরাপ্রবণ এলাকা। তবে বর্তমানে তিন্তা নদীতে পানিপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় শক্ত মৌসুমে তিন্তা অববাহিকায় খরার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খরাতে খাপ খাওয়ানোর কৌশল হিসাবে চাষ পদ্ধতির পরিবর্তন, কম পানি লাগে এমন ফসলের চাষ, জাবড়া প্রয়োগ ইত্যাদি পদ্ধতিকে উৎসাহিত করে উপযোগী ফসলের চাষ করতে হবে। খরা সহিষ্ঠ ছানীয় জাতের উল্লয়ন ও এর আবাদ এলাকা বাড়াতে হবে। খরার কারণে ধান লাগাতে বেশি দেরি হলে নাবি ও খরা সহিষ্ঠ জাতের ধান চাষ করতে হবে। আমন ধান কাটার পর খরা সহনশীল ফসল যেমন- ছোলা চাষ, তেল ফসল হিসাবে তিলের চাষ জনপ্রিয় করতে হবে।

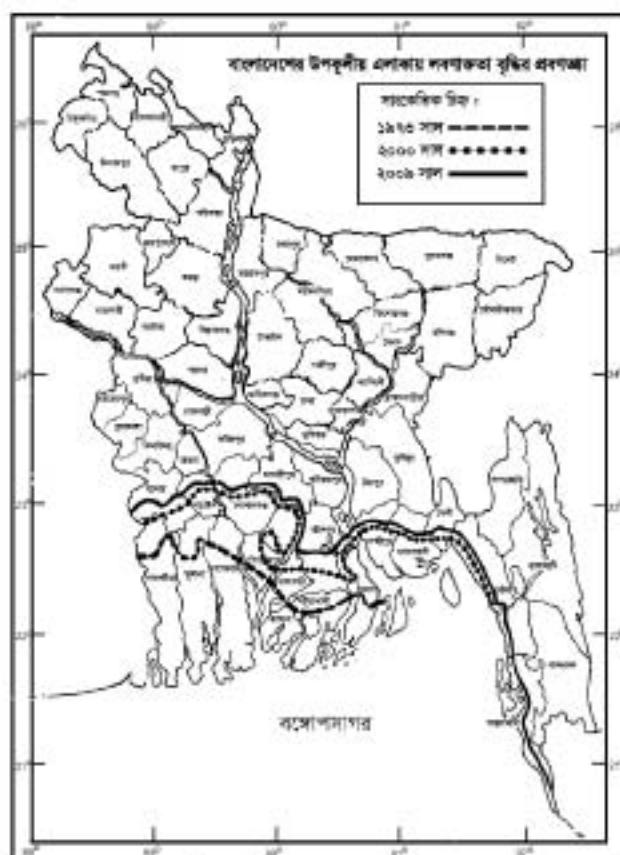
ফসল উৎপাদনে লবণাক্ততার প্রভাব

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মাটিতে লবণাক্ততার প্রভাব দেখা যায়। বাড়, জলোচ্ছাস এবং প্রবল জোয়ারের ফলে সৃষ্টি বন্যায় সরাসরি লবণাক্ত পানি দিয়ে জমি ছবে যাওয়ায় মাটিতে লবণের পরিমাণ বেড়ে যায়। আবার শুষ্ক মৌসুমে পানির বাল্পীভবনের মাধ্যমে মাটির নিচের লবণ উপরে উঠে আসে। ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। বর্তমানে লবণাক্ততায় আক্রান্ত জমির পরিমাণ ১০,৫৬ লাখ হেক্টর। অর্থাৎ প্রায় ১৬.৮৯ লাখ হেক্টর উপকূলীয় জমির ৬২.৫২% বর্তমানে বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততায় আক্রান্ত। লবণাক্ততার মাত্রার উপর ভিত্তি করে লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা-

- ১) খুব সামান্য লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি
- ২) সামান্য লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি
- ৩) মধ্যম লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি
- ৪) তীব্র লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি ও
- ৫) অতি তীব্র লবণাক্ততা আক্রান্ত মাটি

খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, যশোর, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর জেলার অনেক এলাকার লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়েছে। ফলে এ সব এলাকায় কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কম বৃষ্টিপাতের কারণে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ধারা আরও বাঢ়বে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন করে অনেক এলাকায় লবণাক্ততা ছড়িয়ে পড়বে। এমনিতেই উপকূলীয় এলাকার প্রায় ৫০% জমি বিভিন্ন মাত্রায় প্রাবিত হওয়ায় সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় না। তদুপরি উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় ফসল চাষ আরও ছমকির মুখে পড়বে।

এমতাবস্থায় লবণাক্ততা সহজেই ফসল এবং ফসলের জাতের চাষ উপকূলীয় এলাকায় জনপ্রিয় করতে হবে। লবণাক্ত সহিষ্ঠ স্থানীয় জাতের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। লবণাক্ত এলাকায় চাষের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমন মৌসুমে বিআর ২৩, ত্রি ধান ৪০, ত্রি ধান ৪১ এবং বোরো মৌসুমে ত্রি ধান ৪৭, বিলা ধান ৮ জাতের চাষ করতে হবে।



কাজ : শিক্ষার্থীরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশে লবণাক্ততা বৃদ্ধির প্রবণতা মানচিত্রে প্রদর্শন করবে।

ফসল উৎপাদনে জলাবদ্ধতা বা বন্যার প্রভাব

প্রতি বছর দেশের প্রায় ২৫% জমি বন্যার কারণে বিভিন্ন মাত্রায় প্রাবিত হয়। যে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে এ দেশে বন্যা হয়ে থাকে। দেশের মোট উৎপাদিত দানা শস্যের ৬০ ভাগের বেশি এ সময় উৎপাদন হয়। ঘন ঘন বন্যার কারণে কৃষকেরা হ্রাসীয় জাতের আমন ধান চাষে বাধা হয়ে পড়ে, কারণ এসব জাত গভীর পানিতে জন্মাতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যার তীব্রতা, হ্রাসিত্ব ও ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

কড়-জলোচ্ছাসজনিত বন্যা উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি করে। জমিতে লবণাক্ত পানির জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। ফলে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার কারণে ফসল চাষের অনুপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। কর্জবাজার, চট্টগ্রাম, সুনামগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোণা, নীলফামারী ইত্যাদি জেলা চল বন্যার শিকার হয়। প্রায় প্রতিবছর এ সব অঞ্চলের হাজার হাজার একর জমির পাকা বোরো ধান কর্তনের আগেই চল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় চার হাজার বর্গকিলোমিটার ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের এক হাজার চারশত বর্গকিলোমিটার এলাকা এ ধরনের চল বন্যা প্রবণ।

বন্যার পানি নিয়ন্ত্রণ ও সমুদ্রের লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঠেকাতে আরও বেশি বাঁধ, স্লাইস পেট নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিবে। এগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত দিক ভালোভাবে যাচাই করে নিতে হবে। কোনো রকম ভূল হলে দীর্ঘদিন তার মাত্রল দিতে হবে। যশোর ও খুলনা জেলার ভবনহ এলাকার জলাবদ্ধতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

থাপ খাওয়ানোর কৌশল হিসাবে চল বন্যাপ্রবণ এলাকায় প্রচলিত ফসলের জাতের চেয়ে আগাম পাকে এমন জাতের ফসল চাষ করতে হবে। ত্রি ধান ২৮, ত্রি ধান ৪৫ চাষ করলে ত্রি ধান ২৯ এর থেকে আগে পাকে। দেশের মধ্যাঞ্চলে বন্যা পরবর্তী সময়ে নারী জাতের ধান, যেমন- নাইজারশাইল, বিআর ২২, বিআর ২৩ এবং ত্রি ধান ৪৬ চাষ করতে হবে। বন্যার কারণে বীজতলা তৈরির জমি না পেলে দাপেগ পক্ষতির বীজতলা তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী সময় দ্রুত শাকসবজি ও অন্যান্য ফসল চাষের জন্য কৃষকদের কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

কাজ : শিক্ষাধীন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যা ও জলাবদ্ধতার প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করবে এবং খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : তীব্র ঘরা, সাধারণ ঘরা, রবি ঘরা, খরিপ-১ ঘরা, খরিপ-২ ঘরা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে অভিযোজন কলাকৌশল

ফসলের অভিযোজন কলাকৌশল

আমরা জানি প্রতিকূল পরিবেশে উদ্ভিদ বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের শারীরবৃক্ষীয় ও জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে খাপ আইয়ে নেয়। এ খাপ আইয়ে নেওয়ার কৌশলকে অভিযোজন বলে। ফসলের অভিযোজন কৌশলের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কৃষিবিজ্ঞানীরা প্রতিকূল পরিবেশে চাষযোগ্য বিভিন্ন ধরনের ফসলের জাত উন্নোবন করছেন। এ পরিচ্ছেদে আমরা খরা, লবণাক্ততা, জলবন্ধতা বা বন্যা ইত্যাদি প্রতিকূল বা বিকৃপ পরিবেশে ফসলের অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করব।

খরা অভিযোজন কৌশল

খরা সম্পর্কে আমরা আগেই জেনেছি। খরা অবস্থায় ফসলের জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় রসের ঘাটতি থাকে, বাতাসে জলীয় বাস্পের পরিমাণ কম থাকে, তাপমাত্রা বেশি ও সূর্যালোক প্রথর থাকে। এ অবস্থায় ফসল খরা এড়ানো ও খরা প্রতিরোধ করার মাধ্যমে টিকে থাকে।

১। খরা এড়ানো

খরা অবস্থায় ফসলের অভিযোজনের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো খরা অবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়া। বৃষ্টিপাত শুরু হওয়া ও খরা অবস্থা শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে জীবনচক্র শেষ করে খরা কবলিত না হওয়ার কৌশলকে খরা এড়ানো বলে।

আবাদকৃত ফসলের মধ্যে কিছু কিছু জাতের ফসল রয়েছে যাদের জীবনকাল শুরু। কোনো কোনো ফসলের আগাম জাত অল্প সময়ে পরিপন্থুতার কারণে দুই-একটি খরা এড়াতে পারে। ফসলের ফুল, ফল ধারণ ও পরিপন্থুতার কাল শুরু হলে খরা এড়াতে পারে। যেমন— ফেলনের ফুল ফোটা হতে দানা পরিপন্থ হতে ১৭-২০ দিন সময় লাগে। ফলে খরাপ্রবণ এলাকার ফেলন চাষ করে খরা শুরু হওয়ার পূর্বেই ফসল তোলা সম্ভব।

২। খরা প্রতিরোধ

খরাকবলিত অবস্থায় ফসলের টিকে থাকার কৌশলকে খরা প্রতিরোধ বলে। ফসলের খরা প্রতিরোধ কৌশলকে আবার দুই ভাগ করা হয়, যথা- ক) খরা সহ্যকরণ ও খ) খরা পরিহারকরণ। আমরা এখন খরা সহ্যকরণ কৌশল নিয়ে আলোচনা করব।

ক) ফসলের খরা সহ্যকরণ কৌশল

ফসল খরায় পতিত হওয়ার পরও দেহাভ্যন্তরে শুরু পানি সাম্যতা নিয়ে টিকে থাকার ক্ষমতাকে খরা সহ্যকরণ বলে। এ সব ফসল খরা অবস্থা চলে গেলে পুনরায় স্বাভাবিক বৃক্ষি ও ফুল-ফল ধারণ করে। ফসলের খরাসহ্যকরণ কৌশলগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১। কোষের পানিশূন্যতা রোধকরণ : এ ধরনের ফসল খরা অবস্থায় কোষের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিমাণ দ্রব জমিয়ে রাখে। ফলে কোষাভ্যন্তরে উচ্চতর অভিস্রবণ চাপ বজায় থাকে। কোষ থেকে পানি শুরিয়ে যায় না এবং কোষ চুপসে যায় না। খরার সময় তুলা ফসলে এটা সম্ভব করা যায়।

- ২। মোটা কোষ প্রাচীর : অনেক ফসলে পাতার কোষে পানির পরিমাণ কমে গেলেও কোষ প্রাচীর মোটা হওয়ার কারণে পাতা নেতৃত্বে পড়ে না।
- ৩। উপোসকরণ : কিছু কিছু উত্তিদ খরা কবলিত অবস্থায় সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার হার কমিয়ে দেয়। এ অবস্থায় পাতার কোষ নেতৃত্বে পড়লেও রক্ষী কোষ বিভিন্ন প্রকার দ্রাব জমিয়ে রেখে রসক্ষীতি চাপ বজায় রাখে এবং স্বল্প মাত্রার কার্বন ডাই অক্সাইড প্রবেশ করিয়ে সীমিত পর্যায়ের সালোকসংশ্লেষণ বজায় রাখে। এভাবে খরাকালীন অবস্থায় উত্তিদ কোনো রকমে বেঁচে থাকে।
- ৪। প্রোটিন ও প্রোলিন জমাকরণ : খরার প্রভাবে উত্তিদ দেহের প্রোটিন ভেঙে বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়। উত্তিদ দেহে প্রোটিন বেশি মজুদ থাকলে তা খরা প্রতিরোধে সাহায্য করে। আবার প্রোটিন ভেঙে নানা রকম বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হতে পারে। এ জন্য কিছু কিছু উত্তিদ প্রোলিন নামক এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করে যা এ বিষাক্ততার মাত্রাকে কমিয়ে ফসলকে খরা সহ্যশীল করে তোলে।
- ৫। কোষ গহ্নন শূন্যতা : উত্তিদের অঙ্গ ভেদে খরা সহ্য করার সামর্থ্য পার্থক্য দেখা যায়। উত্তিদের যে সব অঙ্গে কোষ গহ্নন থাকে না, সে সব অঙ্গ খরা সহ্যশীল হয়। যেমন— খরার কারণে কোনো কোনো উত্তিদের পাতা মরে গেলেও পত্র মুকুল মরে না। পত্র মুকুল খরা সহ্য করে এবং খরার অবসান হলে বৃক্ষি পেতে থাকে।
- ৬। সুষ্ঠাবস্থা : অনেক বহুবৰ্ষী উত্তিদের খরা অবস্থায় মাটির উপরের অংশ মরে যায় কিন্তু মাটির নিচে কন্দ/বাল্ব/গাইজোম ইত্যাদি আকারে সুষ্ঠাবস্থায় বেঁচে থাকে। অনুকূল পরিবেশে এগলো অক্ষুরিত হয়।

খ) ফসলের খরা পরিহারকরণ কৌশল

আমরা আগেই জেনেছি ফসলের খরা প্রতিরোধের কৌশল দুইটি, যথা— খরা সহ্যকরণ ও খরা পরিহারকরণ। নিচে ফসলের প্রধান খরা পরিহারকরণ কৌশলগুলো বর্ণনা করা হলো :

- ১। পত্ররক্ত নিরসন : অনেক ফসল পত্ররক্ত খোলা ও বক্ষ হওয়াকে নিরসন করে প্রশ্বেদন প্রক্রিয়ায় পানির অপচয় হ্রাস করে খরা অবস্থা মোকাবেলা করে। যেমন—বৰ ও লব্ধ জাতের অনেক গম ফসল সকালের দিকে অল্প সময়ের জন্য পত্ররক্ত খোলা রাখে এবং দিনের বাকি সময় পত্ররক্ত বক্ষ রাখে। আবার অনেক ফসলের কোষে পানি ঘাটতি হলে এবং পরিবেশের তাপমাত্রা বৃক্ষি পেলে পত্ররক্তের আকার কমিয়ে দেয়, পত্ররক্ত বক্ষ করে দেয়। শিমের অধিকাংশ জাত এভাবে খরা পরিহার করে। আবার অনেক ফসলের পাতায় পত্ররক্তের সংখ্যা কম থাকে, পত্ররক্ত পাতার ছোট ছোট ভাঁজ বা গর্তের মধ্যে থাকে। ফলে প্রশ্বেদন কর হয়, পানি সংরক্ষিত থাকে।
- ২। প্রশ্বেদন নিরসন : অনেক ফসল খরায় পতিত হলে পাতার উপর লিপিত জমা করে প্রশ্বেদন হারকে কমিয়ে দেয়; যেমন— সয়াবিন ফসল। আবার অনেক ফসল পাতার উপরে যোম বা ঘন রোমের আঁচ্ছাদন সৃষ্টি করে প্রশ্বেদন হ্রাস করে।
- ৩। পাতার আকার হ্রাসকরণ : অনেক ফসল খরাকবলিত অবস্থায় পাতার আকার হ্রাস করে প্রশ্বেদন কমিয়ে দেয়; যেমন— ফেলন। পাতার কিনারা বা পাতার অঞ্চলগ পুড়িয়ে অনেক উত্তিদ পাতার আকার হ্রাস করে।

- ৪। **পাতা বরানো :** খরার মাত্রা বৃক্ষ পেলে অনেক ফসল নিচ থেকে পুরাতন পাতা বারিয়ে প্রশ্বেদন হ্রাস করে। তুলা, চিনাবাদাম, জোয়ার ও ফেলনের এ ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। খরার অবসান হলে এ ধরনের ফসলে কাণ্ডের শীর্ষ বা পাতার কক্ষ থেকে পুনরায় কুশি গজায়। খরার ফলে ইথিলিন (এনজাইম) উৎপাদন বৃক্ষ পাওয়ায় এ ধরনের ঘটনা ঘটে।
- ৫। **সালোকসংশ্লেষণ দক্ষতা বৃক্ষিকরণ :** কিছু ফসল প্রতরক্ত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রশ্বেদন কমালেও প্রতরক্তের সাহায্যে খুব কম পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে বেশি পরিমাণ খাদ্য তৈরি করে। ভূট্টা, আখ ইত্যাদি ফসলে এটা দেখা যায়।
- ৬। **দক্ষ মূলতন্ত্র :** কিছু কিছু উত্তিদ মূলের দৈর্ঘ্য, সংখ্যা ও ঘনত্ব বাড়িয়ে অধিক পরিমাণ পানি আহরণের মাধ্যমে খরা অবস্থা মোকাবেলা করে; যেমন— ভূট্টা, তুলা ও গমের অনেক জাতে এ ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। মূলের অধিক গভীরতা ও ঘনত্ব একই ফসলে বিরাজমান থাকলে সে ফসল অধিক খরা প্রতিরোধী হয়; যেমন— জোয়ার ও বাজরা। আবার ধইনচা, তুলা, অডহর গভীরমূলী হওয়ায় খরা প্রতিরোধী হয়।
- ৭। **পাতা মোড়ানো ও পাতা কুকিলকরণ :** অনেক দানা ফসল; যেমন— জোয়ার, কাউন পাতার আকার হ্রাসকরণ ছাড়াও খরা পরিবেশে পাতা কুকিল করে। আবার অনেক ফসল পাতা মুড়িয়ে সূর্যালোক প্রাণ্তির আয়তন কমিয়ে দেয়। ফলে এদের প্রশ্বেদন কর্মে যাওয়ার কারণে পানির অপচয় হ্রাস পায় এবং খরা পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়।
- ৮। **পাতার দিক পরিবর্তন :** অনেক উত্তিদে খরা অবস্থায় সূর্যালোকের সাথে বা খাড়াভাবে পাতার দিক পরিবর্তন করে। ফলে প্রশ্বেদনের হার হ্রাস পেয়ে পানি সাশ্রয় হয়। চিনাবাদাম, তুলা ও ফেলনসহ আরও অনেক ধি-বীজপত্রী উত্তিদ এ প্রক্রিয়ায় খরা প্রতিরোধ করে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ফসলের খরা অভিযোগজন কৌশলগুলো খাতায় লিখে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

ফসলের লবণাক্ততা অভিযোগজন কলাকৌশল

অষ্টম শ্রেণিতে আমরা লবণাক্ত পরিবেশে ফসল উৎপাদন কলাকৌশল সম্পর্কে জেনেছি। লবণাক্ততার প্রতি সাড়া প্রদানের উপর ভিত্তি করে ফসলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; ক) হ্যালোফাইটস— গোলপাতা, কেওড়া ও খ) প্রাইকোফাইটস— সুগারবিট, শিম, তুলা। হ্যালোফাইটস জাতীয় উত্তিদ লবণাক্ত পরিবেশে অঙ্গুরিত হয়ে সেখানেই জীবনচক্র সম্পর্ক করতে পারে যা প্রাইকোফাইটস পারে না।

লবণাক্ত এলাকার মৃত্তিকা পানিতে অতিরিক্ত সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির ক্যালসিয়াম ও সালফেট লবণ দ্রব্যভূত থাকায় পানির ঘনত্ব বেশি থাকে। এ পরিবেশে উত্তিদকে টিকে থাকতে হলে উত্তিদের কোষ রসের ঘনত্ব মৃত্তিকা পানির ঘনত্ব থেকে বেশি হতে হয়। বেশি না হলে উত্তিদ মাটি থেকে পানি বা খাদ্যোপাদান শোষণ করতে পারে না, উল্টা পানি হারিয়ে নেতিয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় উত্তিদ কোষের রসপরিষ্কৃতি বজায় রাখার জন্য মাটি হতে বিভিন্ন প্রকার আয়ন (K^+ , Na^+) আহরণ করে লবণাক্ততার এ বাধা অতিরুম করে। এতে করে উত্তিদের দেহাভ্যন্তরে আয়নের আধিক্য ঘটে। কিছু লবণ সহ্যকারী উত্তিদ আয়নের আহরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো কোনো প্রজাতির পাতায় একধরনের লবণ জালিকা থাকে যার মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ন বের করে দিতে পারে। আবার কোনো কোনো প্রজাতি পাতার আয়ন বাড়িয়ে শরীরে লবণের ঘনত্ব কমিয়ে নেয়। কোনো কোনো প্রজাতিতে পাতার কোষে অতিরিক্ত আয়ন জমিয়ে রাখার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে।

কিছু কিছু উদ্ধিদ আছে যারা লবণাক্ত পরিবেশে আয়ন আহরণ না করে অন্য উপায় অবলম্বন করে। এ সব উদ্ধিদের মূলের কোষের রসস্ফীতি বজায় রাখার জন্য কোষ গহবরে বিভিন্ন প্রকার জৈব দ্রাব জমা করে রাখে। এ ধরনের উদ্ধিদের কোষ গহবরের আয়তন কোষের মোট আয়তনের ৯৫% হয়ে থাকে। কোষ গহবরে জমা করা জৈব দ্রব্যের মধ্যে সালোক-সংশ্লেষণজাত দ্রব্যই বেশি থাকে।

জলাবক্ষ অবস্থায় বা বন্যায় ফসলের অভিযোগন কৌশল

জলজ উদ্ধিদ ছাড়া অধিকাংশ ফসল বন্যা বা জলাবক্ষ বা মৃত্তিকা পানির সম্পূর্ণ অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে না। এ অবস্থায় মাটিতে অঙ্গিজেনের অভাবে উদ্ধিদের মূল শ্বসনকাঞ্চ চালাতে পারে না। যত দ্রুত মাটি বা পানিত্ব দ্রব্যাত্মক অঙ্গিজেন শেষ হয়ে যায় এ সব উদ্ধিদ তত দ্রুত মারা যায়। ধান পানি পছন্দকারী উদ্ধিদ। ধান গাছে এ্যারেনকাইমা টিস্যু থাকে। এ টিস্যুর মধ্যে প্রচুর বায়ু কৃতৃপক্ষ থাকে। বায়ু কৃতৃপক্ষে অঙ্গিজেন জমা থাকে। ফলে ধানগাছ ঢুবে না গেলে বন্যা বা জলাবক্ষ অবস্থায় বেঁচে থাকে এবং ভালো ফলন দেয়। তবে অনেক দিন ঢুবে থাকলে মারা যায়। গভীর পানির আমন ধান বন্যার পানি বাড়ার সাথে সাথে উচ্চতায় বাড়তে থাকে। এ সব জাতের ধানগাছের পর্ব মধ্যে এক ধরনের ভাজক কলা থাকে যা বন্যার পানি বাড়ার সাথে সাথে দ্রুত বিভাজিত হয়ে গাছের দৈহিক বৃক্ষ ঘটিয়ে বন্যা মোকাবেলা করে। আবার লঘা জাতের ধান উচ্চতার কারণে বন্যা এড়াতে পারে।

উচ্চ তাপমাত্রায় অভিযোগন কৌশল

উচ্চ তাপমাত্রায় ফসলের সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের হার কমে যায়। শ্বসনের তুলনায় সালোকসংশ্লেষণের হার বেশি কমে। এ অবস্থায় ফসলের প্রোটিন ভেঙে যায়, পানির অপচয় হয়। তাপ সহ্যশীল উদ্ধিদে উচ্চ তাপমাত্রায় বিশেষ ধরনের স্থিতিশীল প্রোটিন সৃষ্টি হয়। তাপ সহ্যশীল উদ্ধিদ দেহ থেকে ভেঙে যাওয়া প্রোটিনকে সরিয়ে দিতে পারে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা লবণাক্ততা, জলাবক্ষতা এবং উচ্চ তাপমাত্রায় ফসলের অভিযোগন কৌশল সম্পর্কে খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শব্দ : খরা এড়ানো, খরা প্রতিরোধ, খরা সহ্যকরণ, প্রোলিন, হ্যালোফাইটস, এ্যারেনকাইমা টিস্যু

চতুর্থ পরিচ্ছেদ মৎস্য ক্ষেত্রের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

পুষ্টির চাহিদা পূরণ, কর্মসংহান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন তথা বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে মৎস্য আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান বিশেষ তৃতীয়। আর মাছ চাষের ক্ষেত্রে এদেশের অবস্থান পর্যবেক্ষণ। এদেশের নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর, পুকুর, নিধি, প্রাবন ভূমি ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ মুক্ত ও বন্ধ জলাশয়ের মোট পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৪.৭ মিলিয়ন হেক্টার। সেসাথে আরও রয়েছে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার বগুকিলোমিটারের বিশাল সামুদ্রিক এলাকা। দেশের এই সকল জলভাগ থেকে বর্তমানে যে মৎস্য উৎপাদন হয় তা এদের আয়তনের তুলনায় ঘটেছে নয়। এ থেকে আরও অনেক বেশি উৎপাদন সম্ভব। বাংলাদেশে ২০১১-১২ সালে যেখানে মাছের উৎপাদন ছিল প্রায় ৩২.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন। সেখানে সরকারের জনপক্ষে ২০২১ অনুষাগী ২০২০-২০২১ সাল নাগাদ মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ মাত্রা ধরা হয়েছে ৪৫.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। যদিও দেশে মাছের উৎপাদন বিগত

বছরগুলোতে অন্মাখয়ে বেড়েছে। কিন্তু এটি বেড়েছে মাছ চাষ বৃক্ষের ফলে। অথচ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় যেমন-নদী, খাল, বিল, হাওর প্রাবন্ধিতে প্রাকৃতিকভাবে মাছের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সেখানে কমে যাচ্ছে মাছের জীববৈচিত্র্যও। আর এর অন্যতম কারণ হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের তাপমাত্রা বৃক্ষ পাচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে, লবণ্যাত্তা বৃক্ষ পাচ্ছে, অনাবৃষ্টি বা অপর্যাপ্ত বৃষ্টি হচ্ছে। বেড়ে যাচ্ছে সাইক্রোন ও জলোচ্ছাসের তীব্রতা ও সংখ্যা। এ সমস্ত কারণে মাছ চাষ, মাছের স্বাভাবিক প্রজনন ও বিচরণ ব্যাহত হচ্ছে। নিচে মৎস্য ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আলোচনা করা হলো-

ক) মাছ চাষ ও পোনা উৎপাদনে প্রভাব

- ১) আমাদের দেশে মৌসুমি পুরুরগুলোতে এপ্রিল-মে মাসে বৃষ্টির পানি জমলে চাষিরা মাছ ছাড়ে। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাত কমে গেছে। অথবা বৃষ্টিপাত তবু হতে দেরি হচ্ছে। এতে করে পোনা ছাড়তে দেরি হচ্ছে। আবার দেরিতে পোনা ছাড়ার পর পুরুর ডকিয়েও যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। ফলে চাষের সময় কমে যাচ্ছে এবং মাছ বড় হওয়ার আগেই ছেট মাছ বাজারজাত করতে হচ্ছে। এতে করে চাষিরা লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে।
- ২) জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বৃক্ষ ও কম বৃষ্টিপাতের ফলে হ্যাচারিতে মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন বাধাপ্রস্ত হচ্ছে। প্রজননের অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া ও তাপমাত্রা বেশি থাকার কারণে হ্যাচারিতে মাছ কৃত্রিম প্রজননে সাড়া দিচ্ছে না। পেটে ডিম আসলেও ডিম ছাড়ছে না। ডিম শরীরে শোষিত হয়ে যাচ্ছে। আবার মাছ ডিম ছাড়লেও তা নিষিক্ত হচ্ছে না বা কম হচ্ছে। আবার নিষিক্ত হওয়া ডিম ফুটার হারও কম হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন এভাবে হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন ব্যাহত করছে।
- ৩) বলু গভীর পুরুরে অধিক তাপমাত্রায় মাছ সহজে রোগাচ্ছত হচ্ছে এবং মৃত্যুহার বেড়ে যাচ্ছে। ফলে উৎপাদন কম হচ্ছে ও চাষিদের আয় কমে যাচ্ছে।
- ৪) কম বৃষ্টির কারণে চাষের পুরুরে কম পানি পাওয়া যাচ্ছে। ফলে পুরুরে বা খামারে পানি সরবরাহে চাষিকে অতিরিক্ত খরচ করতে হচ্ছে।
- ৫) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, সাইক্রোন, জলোচ্ছাসের তীব্রতা এবং সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে মৎস্য সেক্টরে অ্যান্টিক্রিটির পরিমাণ বেড়ে গিয়ে চাষিদের দুর্ভোগ বাঢ়ছে। পুরুর থেকে মাছ বেরিয়ে যাচ্ছে।
- ৬) সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃক্ষের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের চাষের পুরুরগুলো দুরে যেতে পারে।

খ) অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে প্রভাব

- ১) কম বৃষ্টিপাতের ফলে নদীতে কম পানি হচ্ছে ফলে অল্প পানিতে সহজেই মাছ ধরা সম্ভব হচ্ছে। এতে করে ছেট-বড়, প্রজননক্ষম সব মাছ ধরা পড়ছে। ফলে নদীতে মাছের জীববৈচিত্র্য ও স্থায়ী উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

- ২) তাপমাত্রা বৃক্ষের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে ফলে লবণাক্ততা দূকে পড়ছে শূল ভূ-খণ্ডের দিকে। এতে করে উপকূলীয় এলাকার স্বাদুপানির মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র কমে যাচ্ছে। সে সাথে করে যাচ্ছে উৎপাদনও।
- ৩) আমাদের দেশে বিল, বীগড়, প্রাবন ভূমিতে এপ্রিল-মে মাস হচ্ছে দেশীয় জাতের ছোট মাছের প্রজননকাল। সামগ্রিক বহুরঙ্গলোতে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় বা কম হওয়ার কারণে ঝুলাই মাস পর্যন্তও এসব জলাশয়ে পানি হচ্ছে না। ফলে এসব মাছের প্রজনন চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে এর প্রভাব পড়ছে সমগ্র মৎস্য উৎপাদনে এবং যারা মাছ আহরণ করে তাদের পৃষ্ঠি ও জীবীকার ক্ষেত্রে।
- ৪) আমাদের দেশে একমাত্র হালদা নদীতে প্রাকৃতিকভাবে মুই জাতীয় মাছ ডিম ছাড়ে। বৈশাখ মাসে অচও গরমের পর ভারী বৃষ্টি শুরু হলে এরা ডিম ছাড়ে। তখন নদী থেকে জেলেরা নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে এবং এই ডিম ফুটিয়ে পোনা উৎপাদন করে। জলবায়ুর পরিবর্তনে তাপমাত্রার বৃক্ষের ফলে ব্রহ্মাছের ডিমের পরিপন্থতা এগিয়ে আসছে। অন্যদিকে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার সময় দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। এতে করে মাছের শারীরবৃক্ষীয় অবস্থার সাথে বৃষ্টিপাতের সময়ের অবিল হচ্ছে। ফলে ডিম পাওয়ার সম্ভাবনা কমে আসছে।

গ) সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রে প্রভাব

- ১) বায়ুমণ্ডলে দিন দিন কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাঢ়ছে ফলে বেড়ে যাচ্ছে বাতাসের ও সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা। ফলে বাতাসের গতি প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে, বৃষ্টির ধরন পরিবর্তন হচ্ছে। এতে করে সাগরে মাছের বিচরণ ও উৎপাদনশীলতায় প্রভাব পড়ছে। ফলে সমুদ্রের কোনো অংশে মাছের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। আবার মাছের নিরাপদ বিচরণক্ষেত্র বলে খ্যাত কিছু এলাকা মাছশূন্য হয়ে যেতে পারে।
- ২) বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে মাছ উষ্ণ মণ্ডলীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের সাগরের দিকে সরে যাচ্ছে। অনেক মাছ তার অভিপ্রায়ন (migration) পথ, প্রজননক্ষেত্র এবং বিচরণক্ষেত্র পরিবর্তন করে ফেলছে। ফলে জেলেরা সুদূর অঞ্চল থেকে যে জান ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সমুদ্রের যে সব সামুদ্রিক এলাকায় মাছ আহরণ করতে যেত সেগুলোর পরিবর্তন হলে জেলেরা বিপাকে পড়বে।
- ৩) কোরাল রীফ বা প্রবাল সামুদ্রিক মাছের উৎকৃষ্ট আবাসস্থল, যেখানে বিভিন্ন ধরনের মাছ বাস করে এবং প্রজনন ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করে। পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি, চেতেয়ের তারতম্য, সমুদ্রের অস্তুর বৃদ্ধি, দূষণ, স্রোতের গতি পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে প্রবাল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র তথা মৎস্য বৈচিত্রের উপর অত্যন্ত নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলছে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মৎস্য ক্ষেত্রের উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখবে।

পদ্ধতি পরিচেছন

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মৎস্য ক্ষেত্রে অভিযোজন কলাকৌশল

জলবায়ু পরিবর্তন মৎস্য জীববৈচিত্র্য ও উৎপাদনে যে নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলছে তা কাটিয়ে উঠা জরুরি। অন্যথায় একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে অন্যদিকে আমাদের খাদ্যনিরাপত্তা আরাত্মক হ্রাসের সম্মুখীন হবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের এই নেতৃত্বাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠার জন্য পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ-খাইয়ে চলার উদ্যোগ নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত অভিযোজন কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে-

- ১। জলবায়ু পরিবর্তনে যেহেতু উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে তাই লবণাক্ততা সহনশীল মাছের চাষ এবং পোনা উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। যেমন-ভেটকি, বাটা, পারশে ইত্যাদি।
- ২। লবণাক্ততা বেড়ে চলছে এমন জলাশয়ে চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ করা যেতে পারে।
- ৩। খরা প্রবণ এলাকা যেখানে বৃষ্টিপাত কম হয় সেখানে স্বল্প সময়ের পানিতে বড় পোনা চাষ করা যায়। এজন্য এলাকায় বড় পোনা মজুদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তেলাপিয়া বেশ খরা সহনশীল একটি মাছ। খরা অঞ্চলে কই ও দেশি মাঙ্গরের চাষও করা যেতে পারে।
- ৪। বন্যাপ্রবণ বা অধিক বৃষ্টিযুক্ত এলাকায় পুরুরের পাড় উঁচু করে বেঁধে দিতে হবে বা নেট দিয়ে ধিরে দিতে হবে যেন বন্যার পানি পুরুরে প্রবেশ করতে না পারে বা পুরুর ভেসে মাছ বেরিয়ে যেতে না পারে।
- ৫। বন্যাপ্রবণ এলাকায় পুরুরের পাড় উঁচু করে সমাজভিত্তিক মৎস্য পোনা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যায়। এ এলাকায় যে সময়ে বন্যা হয় না সে সময়ে ঐ পোনা পুরুরে মজুদ করা যায়।
- ৬। বন্যাপ্রবণ এলাকায় বন্যার সময়টাতে ঘৰায় মাছ চাষ করা যেতে পারে।
- ৭। উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ ভেঙে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি ও জলদুর্ভেগের এলাকাগুলোতে পরিকল্পিত মাছ চাষ, ঘৰায় মাছ চাষ ও কাঁকড়া চাষের মাধ্যমে সে পানিকে কাজে লাগানো যায়।
- ৮। দিন দিন পরিবেশের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় তাপমাত্রা সহনশীল মাছ চাষ ও এদের পোনা উৎপাদনের ব্যবস্থা নেওয়া যায়। যেমন- মাঙ্গর, ঝুই, শিৎ।
- ৯। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে পুরুরের পানি গরম হয়ে গেলে পুরুরে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে বাঁশের ত্রুম তৈরি করে তাতে টেপাপানা রাখা যেতে পারে। এতে করে মাছ গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এর নিচে অবস্থান নিতে পারবে। একই উদ্দেশ্যে পুরুরের পাড়ে পানির উপর কিছু লতানো উষ্ণিদ জন্মানোর সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বাইরে থেকে কিছু পানি সেচ দেওয়া যেতে পারে।
- ১০। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সামুদ্রিক মৎস্য বিচরণ এলাকা পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে তা যেন জেলেদের মৎস্য আহরণে ও জীবিকা নির্বাহে নেতৃত্বাচক প্রভাব না ফেলে এ লক্ষ্যে নতুন বিচরণ এলাকাসমূহ চিহ্নিত করতে হবে। এ জন্য আধুনিক গবেষণা ও জরিপ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ষষ্ঠ পরিচেছন

জলবায়ু পরিবর্তনে পশ্চপাদ্ধির উপর প্রভাব

পৃথিবীর তাপমাত্রা ও মানুষ কর্তৃক পরিবেশ ধ্বনসই জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। আমাদের দেশ নিয়মিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্ঘটনাগে ক্ষতিহস্ত হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে এসব প্রাকৃতিক দূর্ঘটনাগে দেশে প্রতি নিয়ন্ত আঘাত করছে। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দূর্ঘটনাগে হেমল-জলোচ্ছবি, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়, প্রবল বায়ুপ্রবাহ, বন্যা ও খরা প্রভৃতি কারণে পশ্চপাদ্ধির ব্যাপক ক্ষতি হয়। ফলে খামার মালিক বা কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয় না। এ ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা পুরুষে নেওয়ার জন্য দূর্ঘটনাগকালীন ও দূর্ঘটনাগে পরবর্তী সময়ে কঙগলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দূর্ঘটনাগের বাস্তবতা মেনে নিয়েই সামুদ্রিক ঝড়, টর্নেডো, বন্যা, খরা, পাহাড়ি ঢল, অভিবৃষ্টি ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। ইতোমধ্যে উত্তরাঞ্চলের বরেন্দ্র ভূমির শালবন, রাজশাহী অঞ্চলের পট্টিতলা ও নজীপুরের জঙ্গল সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। যার ফলে এ অঞ্চলে প্রচণ্ড খরা হয়। এসব বনাঞ্চলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়াও উপকূলীয় বনায়ন পরিকল্পনা, পার্বত্য চট্টগ্রামের অশ্বেশিভূক্ত বনাঞ্চলের বনায়ন সম্প্রসারণ, দেশের নদ-নদী খাল উন্ধার ও পুনঃব্যবহার এবং ছোট বড় পাহাড় রক্ষার পরিবেশ আইন অবিলম্বে কার্যকর করাতে হবে। দেশের সামাজিক বনায়ন সম্প্রসারণসহ ব্যাপকভাবে গাছ লাগাতে হবে। এগুলো হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী ব্যবস্থা। এসব বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হলে জলবায়ুর পরিবর্তনে পরিবেশ বিপর্যয়ের হ্যাত থেকে দেশ তথ্য পশ্চপাদ্ধি রক্ষা করা যাবে। নিম্নে জলবায়ু পরিবর্তনে পশ্চপাদ্ধির সমস্যা মূল্যায়নের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো।

খরাজনিত সমস্যা : খরায় যে সকল সমস্যা দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে-

- কাঁচা ধানের অভাব হয়।
- পানি দূষিত হয়।
- গবাদি পশু অপৃষ্ঠিতে ভোগে।
- গবাদিপশুর বিভিন্ন রোগব্যাধি দেখা দেয়।
- মাঠ-ঘাটের ঘাস শক্তিয়ে যায়।
- পশুর বহিগুরুদেশের পরজীবীর উপন্দুর বৃক্ষ পায়।
- অধিক তাপ পশ্চপাদ্ধির অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে।
- গবাদিপশুর আস্থ্যের অবনতিসহ মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা যায়।
- তাপপীড়নে খামারে ত্রয়লার ও লেয়ার মুরগির মৃত্যু হয়।

বন্যাজনিত সমস্যা : বন্যা পরিস্থিতিতে যে সকল সমস্যা দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে-

- জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।
- দেশের অধিকাংশ এলাকা পানিতে ছড়ে যায়।

- রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে।
- গো-খাদ্য পাওয়া যায় না।
- পানি দূষিত হয়।
- পশুপাখি রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যার সৃষ্টি হয়।
- গবাদি পশু অপুষ্টিতে ভোগে।
- বিভিন্ন সংজ্ঞামক রোগ ও কৃষির আক্রমণ বৃদ্ধি পায়।
- ঘাসে বিষত্রিম্বা সৃষ্টি হয়, গবাদিপশু অসুস্থ হয়ে পড়ে।
- পরিবেশ অবাস্থাকর হয়, অনেক পশুর মৃত্যু হয়।

জলোচ্ছাসজনিত সমস্যা : জলোচ্ছাসের সময় যে সকল সমস্যা দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে-

- জলোচ্ছাসকবলিত এলাকার পানি দূষিত হয়।
- জলোচ্ছাস ও ঝড়ের ফলে বহু গবাদিপশু ও জীবজন্ম তাৎক্ষণিক মারা যায়।
- সৎকারের অভাবে মৃত পশুপাখি পরিবেশ দূষিত করে।
- পশু খাদ্যের অভাব দেখা দেয়।
- জীবিত গবাদিপশু উদরাময়, পেটের শীতা ও পেটফালাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

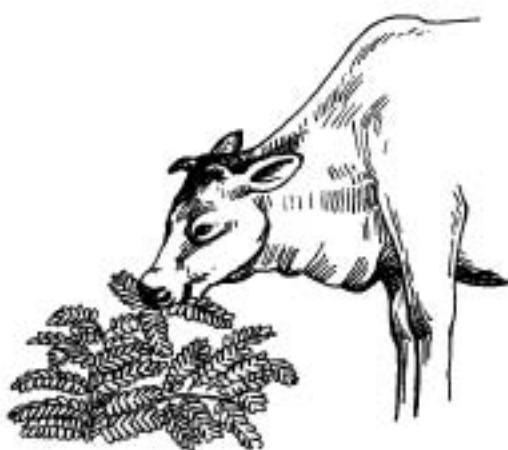
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পশ্চাপাথির অভিযোজন কলাকৌশল

কোনো প্রজাতি তার পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলকে অভিযোজন বলে। মনে রাখতে হবে পরিবেশ ও জীবের দেহের মধ্যে অভিযোজন প্রক্রিয়া সম্পর্ক হয়ে থাকে। জীবের অভিযোজন পরিবেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই অভিযোজন পরিবেশের তাপমাত্রা, আর্দ্ধতা, বায়ুপ্রবাহ ও বাহুর উপাদান, সমূদ্রপৃষ্ঠ থেকে ঐ স্থানের উচ্চতা এবং জীবের শারীরিক গঠন ও দৈহিক অবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। অভিযোজনের এসব উপাদান মোকাবেলা করেই জীব তার অবস্থালে ঢিকে থাকে। এটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম।

কিন্তু হঠাৎ করে জলবায়ুর ব্যাপক কোনো পরিবর্তন হলে মানুষ তার বৃক্ষি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারলেও পশ্চাপাথি সেই পরিবেশে নিজেকে অভিযোজন করতে পারে না। কারণ পশ্চাপাথি অসহায় ও নিরীহ প্রাণী। কোনো অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তন থীরে থীরে হলে অনেক পশ্চাপাথি পরিবেশের সাথে অভিযোজন করতে সক্ষম হয়। পরিবেশে অভিযোজনে অস্ফুর অনেক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে। প্রতিকূল ও বিরূপ পরিবেশে পশ্চাপাথির অভিযোজনের জন্য মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দ্বা, বন্যা ও জলোচ্ছাসজনিত সমস্যা সমাধানের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এতে পশ্চাপাথি অনেকাংশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হবে।

খরায় পশ্চাপাথি রক্ষার কলাকৌশল

- ১। কাঁঠাল, ইপিল-ইপিল, বাবলাসহ বিভিন্ন গাছের চাষ বৃক্ষি করতে হবে এবং খরার সময় এসব গাছের পাতা পশ্চকে খাওয়াতে হবে।
- ২। খরার সময় পশ্চকে ভাতের মাড়, তরিতরকারির উচ্চিষ্ট অংশ, কুঁড়া, গমের ভূসি, ভালের ভূসি, ধৈল, বোলাগুড় পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াতে হবে।
- ৩। গবাদিপশ্চকে নিয়মিত সহজামক রোগের টিকা দিতে হবে।
- ৪। পশ্চকে কাঁচা ঘাসের সম্পূরক খাদ্য (যেমন - সবুজ অ্যালজি) খাওয়াতে হবে।
- ৫। খরা মৌসুম আসার পূর্বেই ঘাস দ্বারা সহিলেজ ও হে তৈরি করে রাখতে হবে। যা খরা মৌসুমে গবাদিপশ্চকে খাওয়ানো যাবে।
- ৬। গবাদিপশ্চকে শক খড় না খাইয়ে ইউরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করা খড় ও ইউরিয়া মোলালেস ব্রক খাওয়ানো যেতে পারে।
- ৭। গবাদির পশ্চকে পর্যাপ্ত দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে।



চিত্র : খরার সময় পশ্চ ইপিল ইপিল পাতা খাচ্ছে

- ৮। পন্তকে বেশি করে পরিষ্কার পানি খাওয়াতে হবে ।
- ৯। পন্তকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে ।
- ১০। পন্তর শরীর সব সহয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং পরজীবির জন্য চিকিৎসা করাতে হবে ।
- ১১। পন্তকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে এবং প্রথর রোলে নেওয়া যাবে না ।
- ১২। গবাদিপন্ত অসুস্থ হলে পন্ত ভাঙ্গারের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা করাতে হবে ।

বন্যাজনিত সমস্যার পন্তপারি রক্ষার কলাকৌশল

- ১। গবাদিপন্তকে যথাসম্ভব উঁচু ও তকনো জায়গায় রাখতে হবে ।
- ২। গবাদিপন্তকে পরিষ্কার পানি খাওয়াতে হবে, বন্যার দূর্ঘিত পানি খাওয়ানো যাবে না ।
- ৩। গবাদিপন্তর মৃতদেহ গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে ।
- ৪। বন্যার সময় গবাদিপন্তকে খাদ্য হিসাবে খড়, চালের কুঁড়া, ভুসি ও খৈল বেশি পরিমাণে খাওয়াতে হবে ।
- ৫। এ সময় কচুরিপানা, দলঘাস, লতাশঙ্খ এমনকি কলাগাছও গবাদিপন্তকে খাওয়ানো যেতে পারে ।
- ৬। কাঁচা ঘাসের বিকল হিসাবে হে ও সাইলেজ খাওয়ানো যেতে পারে ।
- ৭। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে পতিত জমিতে বিভিন্ন জাতের ঘাসের বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে ।
- ৮। গবাদিপন্তকে সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হবে ও ক্রিমিনাশক বড়ি খাওয়াতে হবে ।
- ৯। ভাঙ্গারের পরামর্শ মোতাবেক আক্রান্ত পন্তকে চিকিৎসা করাতে হবে ।

জলোচ্ছাসজনিত সমস্যা ঘোকাবেলায় পন্তপারি রক্ষার কলাকৌশল

উপকূলীয় এলাকায় সামুদ্রিক জলোচ্ছাস একটি বিরাট প্রাকৃতিক দুর্যোগ । বছরের ষে কোনো সময় জলোচ্ছাস সমুদ্র-উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হেনে গবাদিপন্তর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে পারে । আমাদের দেশের বিস্তৃণ সমুদ্র-উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপগুলো জলোচ্ছাসের কবলে পড়ে । তাই জলোচ্ছাসের কবল থেকে গবাদিপন্তকে রক্ষা করার জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে হবে ।

- ১। উঁচুনানে পন্তপারির ব্যবস্থা করতে হবে ।
- ২। জলোচ্ছাস বা ঝড়ের সংকেত পাওয়ার সাথে সাথে গবাদিপন্তকে উঁচু আশ্রয়স্থলে নিয়ে বেঁধে রাখতে হবে ।
- ৩। জলোচ্ছাসের পর মৃত পন্তকে মাটির নিচে ঢাপা দিতে হবে ।
- ৪। এ সময় পন্তর জন্য ভাতের মাড় ও জাউ, তকনো খড় এবং দানাদার খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে ।
- ৫। গবাদিপন্তকে দানাদার খাদ্য হেমন-ভুসি, কুঁড়া, খৈল ও প্রয়োজন মতো লবণ খাওয়াতে হবে ।
- ৬। গবাদিপন্তকে কাঁচা ঘাসের পরিবর্তে বিভিন্ন গাছ-পাতা খাওয়াতে হবে ।
- ৭। জলোচ্ছাস কবলিত এলাকায় টিম গঠন করে পন্তচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে ।
- ৮। গবাদিপন্তকে নিয়মিত সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হবে ।
- ৯। গবাদিপন্তকে যাতে পচা দূর্ঘিত পানি থেয়ে রোগান্ত হতে না পারে সেদিকে লাক্ষ রাখতে হবে ।

অনুশীলনী

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. বিক্রপ পরিবেশে ফসল উৎপাদনের পূর্বশর্ত কোনটি ?

- ক. উপযোগী ফসল নির্বাচন।
- খ. সঠিক জমি নির্বাচন।
- গ. যথাযথ পরিচর্যা করা।
- ঘ. অধিক পরিমাণ সার প্রয়োগ।

২. খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চলে রোগা আমনের জনপ্রিয় জাত কোনটি ?

- | | |
|-------------|-----------|
| ক. বালাম | খ. দিশারী |
| গ. চান্দিনা | ঘ. মুঙ্গা |

৩. জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে আমাদের দেশে ফসল উৎপাদনে-

- i. রোগবালাই বৃক্ষ পাবে।
- ii. জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃক্ষ পাবে।
- iii. ভূমির উর্বরতা হ্রাস পাবে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i & ii | খ. i & iii |
| গ. ii & iii | ঘ. i, ii & iii |

৪. হ্যালোফাইটস জাতীয় উদ্ভিদ কোনটি ?

- | | |
|-----------|---------|
| ক. শিম | খ. তুলা |
| গ. কেওড়া | ঘ. বাইন |

নিচের উকীলকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

তাহের খিয়ার বাড়ি লেআকোনা জেলায়। আমন মৌসুমে ধানের বৃক্ষের প্রাথমিক পর্যায়ে ১০-১৫ দিন পানির নিচে থাকায় আশানুকূপ ফলন পাননা। আবার পাহাড়ি চলে প্রায় সহযাই পাকা বোরো ধান তলিয়ে যায়।

৫. তাহের খিয়ার আমন মৌসুমে কোন জাতের ধানের চাষ করলে আশানুকূপ ফলন পাবেন?

ক. কিরণ (বি আর ২২)

খ. ত্রি ধান ৫১

গ. ত্রি ধান ৪৫

ঘ. ত্রি ধান ৩৬

৬. বোরো মৌসুমে পাকা ধান নষ্ট না হওয়ার জন্য তাহের খিয়ার উচিত-

i. সঠিক সময়ে চারা ঝোপণ করা।

ii. ত্রি ধান ২৮ ও ত্রি ধান ৪৫ জাতের ব্যবহার

iii. ত্রি ধান ৫১ ও ত্রি ধান ৪৫ জাতের ব্যবহার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সুজিত বাবুর বাড়ি সমুদ্র উপকূলবর্তী সাতক্ষীরা জেলায়। তিনি আবাদি জমিতে স্থানীয় জাতের ধান চাষ করে উৎপাদনে ব্যর্থ হন। এরপর কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে বিনা ধান-৮ চাষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একদিন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদর্শিত তথ্য তিনি দেখে সুজিত বাবু লবণাক্ততা সহ্যক বিভিন্ন ফসলের চাষ সম্পর্কে অনেক তথ্যই জানতে পারলেন।

ক. লবণাক্ত সহিষ্ণু ফসল কাকে বলে?

খ. তাপমাত্রা কীভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত করে? ব্যাখ্যা কর।

গ. সুজিত বাবুর সিদ্ধান্তটি সঠিক কি না তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সুজিত বাবুর এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম মূল্যায়ন কর।

২. চিত্রার বাবা নিয়মিত চৌথামে হালদা নদী থেকে মাছের ডিম সংগ্রহ করে বিক্রি করে আসছেন। কিন্তু এ বছর চিত্রার বাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘস্থাস নিয়ে বললেন নিশ্চিত সময়ে কার্প জাতীয় মাছের ডিম সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। ফলে আয়- রোজগার কমে যাবে। তিনি এলাকার মৎস্য সংগ্রহ চলাকালে শোভাযাত্রার ও তথ্য চিত্রের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ কমে যাওয়ার কারণ জানতে পারেন।

ক. আবহাওয়া কাকে বলে?

খ. পরিবেশের বিকল্প প্রতিক্রিয়ার একটি ক্ষতিকর দিক ব্যাখ্যা কর।

গ. চিত্রার বাবার ডিম সংগ্রহ করতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উন্নীপকে উন্নিখিত শোভাযাত্রাটি কৃষি উৎপাদন বৃক্ষিতে কিঙ্কপ প্রভাব ফেলবে বিশ্বেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষিজ উৎপাদন

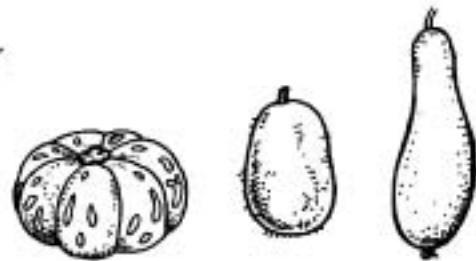
কৃষিজ উৎপাদন বলতে বিভিন্ন প্রকার মাঠ ফসল, উদ্যান ফসল, ঔষধি গাছপালা, মাছ চাষ ও গৃহপালিত পশুপাখি পালন প্রক্রিতির উৎপাদনকে বোঝায়। মানুষের জীবনযাত্রা চলমান রাখতে কৃষিজ উৎপাদন বাড়ানো সরকার। বাংলাদেশে পতিত ও অব্যবহৃত জায়গাতেও পরিকল্পিতভাবে ফুলফল ও শাকসবজি চাষ করা যায়। এছাড়া শস্য পর্যায় অবলম্বন করে দানা জাতীয় ফসলের পরে সরিয়া বা মাস কলাই চাষ, আঁশ জাতীয় ফসলের পরে দানা জাতীয় ফসল চাষ করা যায়। এছাড়া এ দেশে বীশ, বেত, পাটকাটি, খড়, নারিকেলের ছেবড়া ইত্যাদি শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। কাজেই কৃষিজ উৎপাদন সম্পর্কে জানা খুবই জরুরি।



চিত্র: ধানের গোছা



চিত্র: পাটি গাছ



চিত্র :সবজি (মিটি কুমড়া, চাল কুমড়া, শাঁট)

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- চাষ উপযোগী বিভিন্ন জাতের ফসলের নাম, উৎপাদন পদ্ধতি, রোগবালাই ব্যবহারণা ও ফসলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শাকসবজি চাষ পদ্ধতি, রোগ বালাই ও দমন পদ্ধতি এবং শাকসবজি চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার ফুল-ফল চাষ পদ্ধতি, রোগ বালাই ও দমন পদ্ধতি এবং ফুল-ফল চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাছ পালন পদ্ধতি, মাছের রোগ শনাক্তকরণ ও ব্যবহারণা এবং মাছ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গৃহপালিত পশুপাখির আবাসন ও পালন পদ্ধতি, রোগ শনাক্তকরণ, ব্যবহারণা, পরিচর্যা এবং গৃহপালিত পশুপাখি পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সমষ্টি চাষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন সমষ্টি চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- সমষ্টি চাষ পদ্ধতির মাছের স্বাস্থ্য ব্যবহারণা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব এবং সমষ্টি চাষ পদ্ধতির ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারব।
- শিল্পে ব্যবহৃত হয় একটি কৃষিজ দ্রব্যাদির বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার এবং ব্যবহারের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- ঔষধি উদ্ভিদ শনাক্তকরণ এবং ঔষধি উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতে পারব।

প্রথম পরিচেছন ফসল চাষ পদ্ধতি

আমরা অষ্টম শ্রেণিতে চাষ উপযোগী ফসলের মধ্যে কেবল গম ফসল চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জেনেছি। এ পরিচেছনে আমরা ধান, পাট, সরিষা ও মাসকলাই এর জাত ও চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।

ধান চাষ

জমি নির্বাচন : বাংলাদেশে দানাজাতীয় ফসলের মধ্যে ধানের চাষ ও উৎপাদন সরচেয়ে বেশি। কারণ মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য হলো ভাত। ধানের ফলন সব জমিতে ভালো হয় না। মাঝারি নিচু ও নিচু জমিতে ধানের ফলন বেশি ভালো হয়। মাঝারি উচু জমিতেও ধান চাষ করা হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে পানি সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। এটেল ও পলি দোআশ মাটি ধান চাষের জন্য উপযোগী।

ধানের জাতসমূহ : বাংলাদেশে তিনি জাতের ধান আছে। যথা :

ক) **হানীয় জাত :** টেপি, গিরবি, দুখসর, লতিশাইল

খ) **হানীয় উন্নতজাত :** কটকতারা, কালিজিরা, হাসিকলমি, নাইজার শাইল, লতিশাইল, বিনাশাইল ইত্যাদি।

গ) **উচ্চফলনশীল (উফশী) জাত :** বাংলাদেশে অনেক জমিতে উফশী (উচ্চ ফলনশীল) ধানের চাষ করা হয়ে থাকে। উফশী ধানের জাতগুলোর সাধারণ কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন :

- গাছ মজবুত এবং পাতা খাড়া।
- শীঘ্ৰের ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে।
- গাছ খাটো ও হেলে পড়ে না।
- খড়ের চেয়ে ধানের উৎপাদন বেশি।
- পোকা ও রোগের আক্রমণ কম হয়।
- অধিক কুশি গজায়।
- সার গ্রহণক্ষমতা অধিক এবং ফলন বেশি।

উফশী ধানে যখন প্রয়োজনীয় বিশেষ গুণাগুণ, যেমন- রোগবালাই সহনশীলতা, বৰু জীবনকাল, চিকন চাল, থৰা, লবণ্যাঙ্গতা ও জলমগ্নতা সহিস্ফুল ইত্যাদি সংযোজিত হয়, তখন তাকে আধুনিক ধান বলে। তাই সকল উফশী ধান আধুনিক নয়, কিন্তু সকল আধুনিক ধানে উফশী গুণ বিদ্যমান।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট (বি.ই.বি.) বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে এ পর্যন্ত ধানের উফশী ৬১টি জাত উন্নাবন করেছে। ধানের মৌসুম তিনটি। যথা- আউশ, আমন ও বোৱো। বি.ই.বি. ধানের কতকগুলো অনুমোদিত

জাত আছে যেগুলো আউশ ও বোরো দুই মৌসুমেই চাষ করা যায়। যেমন— বিআর ১ (চান্দিনা), বি আর ২(মালা), বিআর ৯(সুফলা), বিআর ১৪(গাঁজী)। আবার বিআর ৩ (বিপুর) জাত সকল মৌসুমে চাষ করা যায়। নিম্নে তিন মৌসুমের অনুমোদিত জাতগুলোর সংখ্যা ও কিছু জাতের নাম উল্লেখ করা হলো :

- ক) আউশ মৌসুমের জাত : শুধু আউশ মৌসুমেই চাষ করা হয় এবং জাত হলো ৮টি। এদের মধ্যে কয়েটি বিআর ২০ (নিজামী), বিআর ২১ (নিয়ামত) ইত্যাদি। এ জাতগুলো আউশ মৌসুমে বপন ও রোপণ দুইভাবেই আবাদ করা যায়। এ মৌসুমে বীজ বপনের উপযুক্ত সময় ১৫-৩০ শে তৈর এবং চারা রোপনের জন্য চারার বয়স হবে ২০-২৫ দিন।
- খ) আমন মৌসুমের জাত : শুধু আমন মৌসুমেই চাষ করা হয় এবং জাত হলো ২৭টি। এদের কয়েকটি হলো বিআর ৫(দুলাভোগ), বিআর ১১(মুক্তা), বিআর ২২(কিরণ), ত্রি ধান ৫৬, ত্রি ধান ৫৭ ও ত্রি ধান ৬২ ইত্যাদি।
সবগুলো জাতই রোপণ পদ্ধতিতে চাষ করা হয় এবং রোপনের জন্য চারার বয়স হতে হবে ২৫-৩০ দিন।
- গ) বোরো মৌসুমের জাত : শুধু বোরো মৌসুমেই চাষ করা যায় এবং জাত হলো ১৬টি। এদের কয়েকটি হলো বিআর ১৮(শাহজালাল), ত্রি ধান ২৮, ত্রি ধান ২৯, ত্রি ধান ৪৫, ত্রি ধান ৫০ (বাংলামতি), ত্রি হাইত্রি ধান ১, ত্রি হাইত্রি ধান ২ এবং ত্রি হাইত্রি ধান ৩ ইত্যাদি। রোপনের জন্য চারার বয়স হতে হবে ৩৫-৪৫ দিন।

এ ছাড়া ধান ফসলের আরও কিছু জাত আছে। যেমন : বৃষ্টিবহুল, খরা-সহিষ্ণু, লবণাক্তা-সহিষ্ণু, হাওর, ঠাণ্ডা-সহিষ্ণু জাত ইত্যাদি।

বীজ বাহাই : কমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ বীজ গজায় এবং পরিষ্কার, সুস্থ ও পুষ্ট বীজ বীজতলায় বপনের জন্য বাহাই করতে হবে। নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে বীজ বাহাই করা হয়।

প্রথমে দশ লিটার পরিষ্কার পানিতে ৩৭৫ গ্রাম ইউরিয়া সার মিলিয়ে প্রাপ্ত মুবণে ১০ কেজি বীজ ছেড়ে হাত দিয়ে নেড়ে ঢেড়ে দিলে পুষ্ট বীজ দুবে নিচে জমা হবে এবং অপুষ্ট ও হালকা বীজগুলো পানির উপর ভেসে উঠবে। হাত বা চালনি দিয়ে ভাসমান বীজগুলো সরিয়ে নিলেই পানির নিচ থেকে ভালো বীজ পাওয়া যাবে। এ বীজগুলো পুনরায় পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ বার ধূঁয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে ইউরিয়া মেশানো পানি বীজতলায় সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

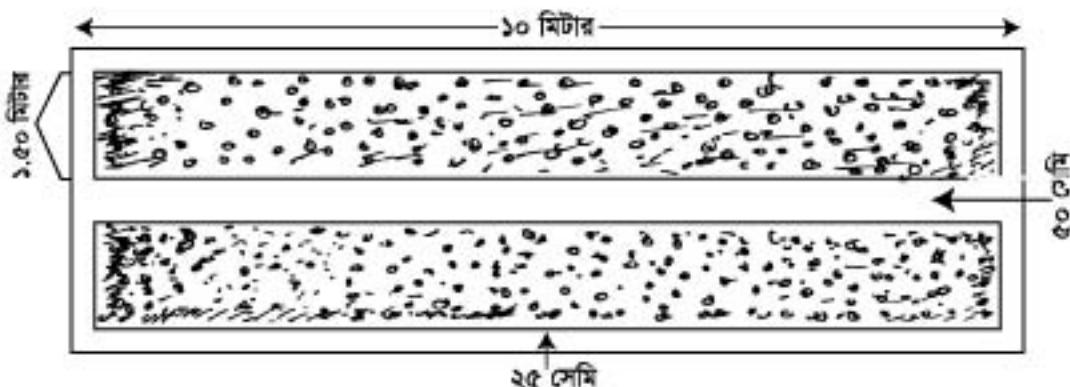
বীজ শোধন ও জাগ দেওয়া : বাহাইকৃত বীজ দাগমুক্ত ও পুষ্ট হলে সাধারণভাবে শোধন না করলেও চলে। তবে শোধনের জন্য ৫২-৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস (হাতে সহনীয়) তাপমাত্রার পরম পানিতে ১৫ মিনিট বীজ দুবিয়ে রাখলে জীবাণুমুক্ত হয়। এছাড়া প্রতি কেজি ধান বীজ ৩০ গ্রাম কার্বক্সিন (১৭.৫%) + ধিরাম (১৭.৫%) দ্বারাও শোধন করা যায়।

শোধনকৃত বীজ বাঁশের টুকরি বা ক্রামে ২-৩ স্তৰের তকানো খড় বিছিয়ে তার উপর বীজের ব্যাগ রেখে পুনরায় ২-৩ স্তৰ তকানো খড় দিয়ে বা কচুপাতা দিয়ে ঢেকে ভালোভাবে ঢেপে তার উপর কোনো ভারী জিনিস দিয়ে চাপ দিয়ে রাখতে হবে। এভাবে জাগ দিলে আউশ ও আমন মৌসুমের জন্য ৪৮ ঘণ্টা বা দুই দিনে, বোরো মৌসুমে ৭২ ঘণ্টা বা তিন দিনে ভালো বীজের অঙ্কুর বের হবে এবং সেগুলো বীজতলায় বপনের উপযুক্ত হবে।

বীজতলা তৈরি : ধানের চারা তৈরির জন্য সাধারণত চার ধরনের বীজতলা তৈরি করা হয়। যথা-
ক) শকনো বীজতলা খ) ভেজা বীজতলা গ) ভাসমান বীজতলা ঘ) দাপোগ বীজতলা উচ্চ ও দোআশ
মাটিসম্পন্ন জমিতে শকনো বীজতলা এবং নিচু ও এন্টেল মাটি সম্পন্ন জমিতে ভেজা বীজতলা তৈরি করা
হয়। আর বন্যাকবলিত এলাকায় ভাসমান ও দাপোগ বীজতলা তৈরি করা হয়। প্রচুর আলো বাতাস থাকে
এবং বৃষ্টি বা বন্যার পানিতে ঝুঁকে যাবে না এমন জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হয়। এখানে শকনো
ও ভেজা বীজতলা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক) শকনো বীজতলা : বীজতলার জমি উর্বর হওয়া প্রয়োজন। জমিতে ৪/৫টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি
ভালোভাবে ঝুরঝুরা ও সমান করতে হবে। মাটিতে অবশ্যই রস থাকতে হবে। প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে।
এর আগে জমি থেকে আগাছা বেছে সরিয়ে ফেলতে হবে। জমি যদি অনুর্বর হয় জমিতে জৈব সার দিতে
হবে। বীজতলায় রাসায়নিক সার ব্যবহার না করাই উত্তম।

বীজতলার মাপ : এক শতক জমিতে দুই খঙ্গের বীজতলা তৈরি করা যায়। প্রতিটি বীজতলার আকার ১০
মিটার \times ৪ মিটার জায়গার মধ্যে নালা বাদ দিয়ে ৯.৫ মিটার \times ১.৫ মিটার হবে। বীজ তলার চারদিকে ২৫
সেমি। জায়গা বাদ দিতে হবে এবং দুই খঙ্গের মাঝখানে ৫০ সেমি। জায়গা নালার জন্য রাখতে হবে।
বীজতলায় বীজ বোনার আগে বীজ জাগ দিতে হবে। বিভিন্ন জাতের ধানের অক্তুর বের হওয়ার জন্য বিভিন্ন
সময়কাল দরকার। যেমন- আউশের জন্য ২৪ ঘণ্টা, আমনের জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগে। এক শতক
বীজতলার জন্য ৩ কেজি পরিমাণ বীজ উল্লিখিত নিয়মে জাগ দিয়ে অক্তুরিত করতে হবে। এরূপ অক্তুরিত
বীজ বীজতলায় বুনতে হবে।



চিত্র: এক শতক জমিতে ধানের বীজতলার নকশা

চারার পরিচর্ষা ও অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য দুই বেডের মাঝের জায়গা থেকে মাটি উঠিয়ে দুই বেডে
সমানভাবে উঠিয়ে দিতে হবে। এতে বেডগুলো উচু হয়। এরপর প্রতিবর্গমিটার বেডে ৬০-৮০ গ্রাম বীজ
বেডের উপর সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বেডের উপরের মাটি বাঁশ বা কাঠের
চ্যাপ্টা লাঠি দিয়ে সমান করতে হবে। দুই বেডের মাঝে সৃষ্টি নালা সেচ, নিষ্কাশন ও সার বা উষ্ণ প্রয়োগের
জন্য খুবই দরকার হয়।

৪) ভেজা বীজতলা : একেব্রে জমিতে পানি দিয়ে ২-৩টি চাষ ও মই দেওয়ার পর ৬-৭ দিন ফেলে রাখতে হয়। এতে জমির আগাছা, খড়কুটা ইত্যাদি পচে গিয়ে সারে পরিণত হয়। এরপর জমি আরও ২-৩ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ধকঢকে কাদাময় করতে হয়। ভেজা বীজতলায় বীজ বাড়িতে গঞ্জিয়ে বোনা ভালো। একেব্রেও বীজতলার মাপ তকনো বীজতলার মতোই।

বীজতলার পরিচর্যা : পাথি যাতে বীজতলার বীজ খেতে না পারে সেজন্য বগনের সময় থেকে ৪-৫ দিন পর্যন্ত পাহারা দিয়ে পাথি তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বেড় যাতে শকিয়ে না যায় সেজন্য দুই বেডের মাঝের নালায় পানি রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। এরপর নালা থেকে প্রয়োজনীয় পানি বেডে সেচ দিতে হয়। বীজ তলায় আগাছা জন্মালে তা তুলে ফেলতে হয়। রোগ বা পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে তা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। বীজ তলার চারাগুলো হলদে হয়ে গেলে প্রতিবর্গমিটারে ৭ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া প্রয়োগের পর চারাগুলো সবুজ না হলে গুঁকের (সালফার) অভাব হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বীজতলায় প্রতি বগমিটারে ১০ গ্রাম করে জিপসাম সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় বীজতলায় চারাগুলো ক্ষতি হতে পারে। তাই রাতে পলিথিন ঘারা চারাগুলো ঢেকে দিনের বেলায় খোলা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে চারার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

চারা উঠানো

- ১। চারা তোলার পূর্বে বীজতলায় পানি সেচ দিয়ে মাটি ভিজিয়ে নেওয়া উক্ত। এতে বীজতলার মাটি নরম হয়। ফলে চারা তুলতে সুবিধা হবে।
- ২। ধানের চারা পোকায় আক্রান্ত থাকলে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- ৩। চারার গোড়া বা কাণ্ড যাতে না ভাঙ্গে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ৪। চারা তোলার পর তা ছেট ছেট আটি আকারে বেঁধে নিতে হয়।



চিত্র : বীজতলা থেকে চারা তুলছে

চারা বহন ও সংরক্ষণ : সরাসরি রোপণের ফেস্টে-

- ১। বীজতলা থেকে রোপণের জন্য চারা বহন করার সময় পাতা ও কাণ্ড ঘোড়ানো যাবে না।
- ২। ঝুড়ি বা টুকরিতে সারি করে সাজিয়ে পরিবহন করতে হয়।

- ৩। বন্ধাবন্ধী করে কখনো ধানের চারা বহন করা যাবে না।
- ৪। চারা সরাসরি রোপণ সম্ভব না হলে চারার আটি ছায়ার মধ্যে ছিপছিপে পানিতে রেখে সংরক্ষণ করতে হবে।

জমি তৈরি : ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে কানাময় ও সমান করে নিতে হবে। একেত্রে কোদাল দিয়ে জমির চারদিক ছেঁটে দিতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা : ভালো ফলন পেতে হলে অবশ্যই জমিতে সার দিতে হবে। এছাড়া উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত মাটি থেকে বেশি পরিমাণে খাদ্যোপাদান গ্রহণ করে বিধায় সার প্রয়োগ অত্যাৰশ্যক। গোৰু বা আৰঙ্গনা পচা জাতীয় জৈব সার জমি তৈরির সময় মাটিৰ সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ব্যক্তিৰ সকল রাসায়নিক সার যেমন- টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, দস্তা প্রভৃতি জমিতে শেষ চাষ দেওয়াৰ আগে প্রয়োগ কৰে মাটিৰ সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা রোপণ কৰার পৰ ইউরিয়া সার ও কিন্তিৰে ছিটিয়ে প্রয়োগ কৰতে হয়। ১ম কিন্তি চারা রোপণেৰ ১৫-২০ দিন পৰ, ২য় কিন্তি ৩০-৩৫ দিন পৰ অৰ্ধাং চারার গোছায় ৪-৫টি কুশি আসা অবস্থায় এবং শেষ কিন্তি ৪৫-৫০ দিন পৰ অৰ্ধাং কাইচ থোক আসাৰ ৫-৭ দিন আগে প্রয়োগ কৰতে হবে।

নিচে শতক প্রতি জৈব সার, ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও দস্তা সারেৰ পরিমাণ দেওয়া হলো:

সারেৰ নাম	পরিমাপ
পচা গোৰু বা কমপোষ্ট	২০ কেজি
ইউরিয়া	৩৬০-৮৪০ গ্ৰাম
টি এস পি	৩০০-৫০০ গ্ৰাম
এমওপি	১৬০-২৮০ গ্ৰাম
জিপসাম	২৪০-২৮০ গ্ৰাম
দস্তা	৪০ গ্ৰাম

শতকপ্রতি ২০ কেজি পচা গোৰু সার বা কমপোষ্ট দিলে ভালো ফলন পাওয়া যাব।

সার প্রয়োগেৰ সাধাৱণ মীতিমালা : জাত ও মৌসুম ছাড়া সার প্রয়োগেৰ ক্ষেত্ৰে আৱণ কিছু মীতিমালা যেনে চলতে হয়। যেৰন: পাহাড়েৰ পাদভূমিৰ মাটি ও লাল বেলে মাটিতে এমওপি সার দেড়গুণ দিতে হয়।

- ১। গৃহাবহিত পলিমাটি ও সেচন্ত্রকল্প এলাকাৰ মাটিতে দস্তা সার বেশি পরিমাণে দিতে হয়।
- ২। হাতোৱ এলাকাৰ মাটিতে প্রত্যোক সার কম পরিমাণে দিতে হবে।
- ৩। স্থানীয় জাতেৰ ধানে সারেৰ পরিমাণ অৰ্ধেক প্রয়োগ কৰতে হবে।

চারা রোপণ : সমান করা সমতল জমিতে জাত ও মৌসুম ভেদে ২৫-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করা ভালো। জমিতে ছিপছিপে পানি রেখে দড়ির সাহায্যে সারি করে চারা রোপণ করতে হবে। এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ২০-২৫ সেমি, এবং সারিতে এক গোছা থেকে অন্য গোছার দূরত্ব ১৫-২০ সেমি, ইওয়া দরকার। প্রতি গোছার ২-৩ টি চারা রোপণ করতে হবে। দেরিতে রোপণ করলে চারার সংখ্যা বেশি ও ঘন করে রোপণ করতে হবে।

পরিচর্যা

ক) সেচ : জমি সমান হলে মুক্ত প্রাবন পক্ষতিতে এবং ঢালু হলে আল বন্ধ মুক্ত প্রাবন পক্ষতিতে পানি সেচ দিতে হয়। বোরো ধান সম্পূর্ণভাবে সেচের উপর নির্ভরশীল। জমিতে ৫-৭ সেমি এর নিচে পানি থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। চারা রোপণ করার পর ৬-৭ সেমি এর নিচে পানি থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। চারা রোপণ করার পর ৬-৭ দিন পর্যন্ত ৩-৫ সেমি সেচ দিতে হয়। এতে আগাছা দমন হয়। এরপর কুশি উৎপাদন পর্যায়ে ২-৩ সেমি এবং চারার বয়স ৫০-৬০ দিন হলে ৭-১০ সেমি পরিমাণ পানি সেচ দেওয়া উচ্চম। খোড় আসার সময় পানি সেচ সবচেয়ে বেশি উভয়পূর্ণ। নালা পুষ্ট হতে শুরু করলে আর সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

খ) আগাছা দমন : কমপক্ষে তিন বার ধানের জমিতে আগাছা দমন করতে হয়। যেমন :

- চারা রোপণ করার ১০-১৫ দিনের মধ্যে
- প্রথম আগাছা দমনের পরবর্তী ১৪ দিনের মধ্যে
- খোড় বের হওয়ার পূর্বে।

ধানক্ষেতে সাধারণত আরাইল, গইচা, শ্যামা প্রভৃতি আগাছার উপদ্রব হয়। এগুলো সরাসরি হাত/নিড়ানি ধারা ও প্রত্যক্ষ প্রয়োগ করে দমন করতে হবে।

গ) পোকা দমন : ধানক্ষেতে অনেক পোকার উপদ্রব হয়। এদের আক্রমণে ধানের ফলন অনেক কমে যায়। সাধারণত ধান ফসলে মাজরা পোকা, পামরিপোকা, বাদামি গাছ ফড়ি, গাঞ্জি পোকা, গল মাছি, শীষকাটা লেদা পোকা প্রভৃতি দেখা যায়।

নিচে কয়েকটি পোকার পরিচিতি ও দমন পক্ষতি বর্ণনা করা হলো :



চিত্র: মাজরাপোকা মথ



চিত্র: পামরিপোকা



চিত্র: গাঞ্জি পোকা



চিত্র: শীষকাটা ফড়ি

নিম্নলিখিত তালিকার পোকার আক্রমণের লক্ষণসমূহ অনুযায়ী কীটনাশক ব্যবহার করে পোকা দমন করা যায়।

তালিকা ১

পোকার নাম	আক্রমণের লক্ষণসমূহ
১. মাজরাপোকা	১) ধান গাছের মাঝাড়গা ও শীঘ্ৰে ক্ষতি করে, ২) কুশি অবস্থার আক্রমণ করলে মাঝাড়গা সাদা হয়ে যায়, ৩) ফুল আসার পর আক্রমণ করলে ধানের শীঘ্ৰে সাদা চিটা হয়, ৪) সব ঝুঁতুড়েই কমবেশি আক্রমণ করে।
২. পামরিপোকা	১) পামরি পোকার কীড়া পাতার ভিতরে ছিঁড়ে করে সবুজ অংশ খায়। ২) পূর্ণ বয়স্ক পোকা পাতার সবুজ অংশ ঝুঁড়ে ঝুঁড়ে খায় বলে পাতা সাদা হয়ে যায়।
৩. গলমাছি	১) গল মাছির কীড়া ধানগাছের বাড়ত কুশিতে আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত কুশি পিয়াজ পাতার মতো হয়ে যায়। ২) কুশিতে শীঘ্ৰ হয় না।
৪. গাছিপোকা	১) গাছিপোকা ধানের দানায় দুধ সৃষ্টির সময় আক্রমণ করে। ২) বয়স্ক পোকার গা থেকে গচ্ছ বের হয়।
৫. বাদামি গাছ ফড়িং	১) ধানের গোড়ায় বসে রস চুম্বে থায়, ২) গাছ পুড়ে যাওয়ার রং ধারণ করে মরে যায়, একে হপোর বার্ন বলে।

তালিকা ২

পোকার নাম	কীটনাশকের নাম
গাছিপোকা, পামরিপোকা, মাজরা পোকা, গলমাছি, ছাতরা পোকা, চুঙ্গিপোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, পাতা শোষক পোকা,	ক্লোরোপাইরিফস ৫০ বা ম্যালাথিয়ন ৫৭ বা ফেনিট্রাথিয়ন ৫৭ বা ডায়াজিন ৬০
বাদামি গাছ ফড়িং	কার্বোফুরান ৩ জি/ ১০জি বা ডায়াজিন ১৪ বা
শীঘ্ৰকাটা লেদা পোকা	ভেপোন ১০০

রোগ দমন : ধানগাছের অনেক রোগ হয়। ছত্রাক, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি জীবাণু রোগের কারণ। নিচে কয়েকটি ক্ষতিকর রোগের কারণ, লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণসমূহ	দমনপদ্ধতি
১. ব্রাস্ট রোগ	ছাঁয়াক	১) পাতায় ডিম্বাকৃতির দাগ পড়ে ২) দাগের চারদিকে গাঢ় বাদামি এবং মাঝের অংশ সাদা হাই বর্ণের হয়। ৩) অনেকগুলো দাগ একত্রে মিশে গিয়ে সম্পূর্ণ পাতা মরে যায়।	১) নীরোগ বীজ ব্যবহার করা। ২) পটাশ জাতীয় সার উপরি প্রয়োগ করা। ৩) বীজ শোধন করে বোনা ৪) জমিতে পানি ধরে রাখা ৫) জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করা। ৬) রোগ প্রতিরোধ জাত বিআর৩, বিআর ১৪, বিআর ১৫, বিআর ১৬, বিআর ২৪, ত্রি ধান ২৮ রোপণ করা।
২. টুংরো রোগ	ভাইরাস	১) চারা বোপশের এক মাসের মধ্যে টুংরো রোগ দেখা দিতে পারে। ২) আজুমণের প্রথমে পাতার রং হালকা সবুজ, পরে আস্তে আস্তে হলদে হয়ে যায়। ৩) গাছ টান দিলে সহজেই উঠে আসে। ৪) কৃশি হয় না। ৫) প্রথমে দুই-একটি গোছায় এ রোগটি দেখা যায়, পরে ধীরে ধীরে আশেপাশের গোছায় ছড়িয়ে পড়ে।	১) পাতা ফড়িং এ রোগ ছাড়ায়, তাই পাতা ফড়িং দমন করতে হবে। ২) রোগ প্রতিরোধীজাত যেমন চান্দিমা, দুলাভোগ, ত্রি শাইল, গাজী, বিআর ১৬, বিআর ২২, ত্রি ধান ৩৭, ত্রি ধান ৩৯, ত্রি ধান ৪১, ত্রি ধান ৪২ চাষ করা। ৩) আলোর ফাঁদ ব্যবহার করে সবুজ পাতা ফড়িং মেরে ফেলা। ৪) রোগাত্মক গাছ তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলা। ৫) ম্যালাধিয়ন ৫৭ ইসি স্প্রে করা।

এছাড়া ধান ফসলে পাতা পোড়া রোগ, উফরা রোগ, খোল পোড়ারোগ, বাকানি রোগ, বাদামি দাগ রোগ, খোলপচা রোগ, স্মাট প্রভৃতি রোগ দেখা যায়।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলীয়ভাবে ধান ফসলের বিভিন্ন উপকারী ও অপকারী কীটপতঙ্গ সঞ্চাহ
 করে অ্যালবাম তৈরি করতে বলবেন। একেবেশে শিক্ষক কীটপতঙ্গ সঞ্চাহের ও অ্যালবাম তৈরির
 নিয়মগুলো বলে দেবেন।

ফসল কর্তৃন, মাড়াই ও সংরক্ষণ

শীষে ধান পেকে গেলেই ফসল কাটতে হবে। অধিক পাকা অবস্থায় ফসল কাটলে অনেক ধান ঘারে পড়ে,
 শীষ ভেঙে যায়, শীষকাটা লেদা পোকা এবং পাখির আক্রমণ হতে পারে। শীষের উপরের দিকে শতকরা ৮০
 ভাগ ধানের চাল শক্ত ও ব্রহ্ম এবং নিচের অংশের ২০ ভাগ ধানের চাল আঁশিক শক্ত ও ব্রহ্ম হলে ধান
 ঠিকমতো পেকেছে বলে বিবেচিত হবে। কাটার পর ধান মাঠে ফেলে না রেখে যত তাড়াতাড়ি সন্তুষ্ট মাড়াই
 করা দরকার। কাঁচা খলার উপর ধান মাড়াই করার সময় চাটাই, চট বা পলিথিন বিছিয়ে দিতে হবে। এভাবে
 ধান মাড়াই করলে ধানের রং উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকে। মাড়াইয়ের পর ধান ৩-৪ দিন পূর্ণ রোদে শক্ত

হবে। এবার ভালোভাবে কুলাদিয়ে বেড়ে সংরক্ষণ করতে হবে। যে পাত্রে ধান রাখা হবে তা পরিপূর্ণ করে রাখতে হবে। সংরক্ষণের সময় নিম্ন/নিমিন্দা/বিষকাটালীর পাতা (গুঁড়া) মিশিয়ে দিলে পোকার আক্রমণ হয় না। তারপর পাত্রের মুখ শক্ত করে বন্ধ করতে হবে যেন ভিতরে বাতাস না চুকে।

ফলন

আউশের চেয়ে আমনের, আবার আমনের চেয়ে বোরোর ফলন বেশি হয়ে থাকে। উল্লেখ্য স্থানীয় জাতের তুলনায় উফশী জাতের ফলন বেশি হয়ে থাকে। উফশী জাতের ধানের হেষ্টেরপ্রতি ফলন ৫-৬ টন এবং শতক (৪০ বগমিটার) প্রতি ২০-২৪ কেজি।

কাজ : শিক্ষাধীনের প্রত্যেককে অর্ধনেতিক উন্নয়নে ধান ফসল চাষের পুরুত্ব বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিতে বলবেন।

পাট চাষ

বাংলাদেশে ব্রহ্মপুর, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদীর পলিবাহিত উর্বর সমতল ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে পাট জন্মে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, বার্মা, মিশর ও ব্রাজিল প্রভৃতি দেশেও পাট জন্মে। পাটের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে পাটশিল্প গড়ে উঠেছে।

জমি নির্বাচন : উর্বর দোআশ মাটি পাট চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তবে বেলে ও এঁটেল মাটি ছাড়া সব জমিতেই পাট চাষ করা যায়। যে জমিতে বৰ্ষার শেষের দিকে পলি পড়ে সে জমি পাট চাষের জন্য উত্তম। তোষা পাট উচু জমিতে এবং দেশি পাট উচু ও নিচু দুইধরনের জমিতেই চাষ করা যায়।

চাষ উপযোগী পাটের জাতসমূহ : প্রত্যেকটি ফসলের এমন অনেক জাত আছে যেগুলোর মধ্যে ফলনশীলতা, পরিবেশগত উপযোগিতা, পোকা ও রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা, দৈহিক বৈশিষ্ট্য (আকার, আকৃতি ও বর্ণ), পৃষ্ঠামান, খাদ্যাঙ্গণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি গুণাবলি বিদ্যমান। তবে একই জাতে সব বৈশিষ্ট্যের সর্বোৎকৃষ্ট সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হয় না। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনসিটিউট (BJRI) ১৭টি দেশি, ১৬টি তোষা বা বঙ্গী পাট, ২টি কেনাফ এবং ১টি মেষ্টা জাতের পাট উন্নাবন ও অবমূক্ত করেছে।

দেশি পাটের জাতসমূহ : সিভিএল-১ (সবুজপাট), সিভিই-৩ (আত পাট), সি সি-৪৫ (জো পাট), ডি-১৫৪, এটেম পাট-৩৮ ইত্যাদি দেশি পাটের জাত।

তোষা বা বঙ্গী পাটের জাতসমূহ : ও-৪, ও-৯৮৯৭ (ফার্মুলি তোষা), সিজি (চিন সুরা গ্রিন) ইত্যাদি তোষা বা বঙ্গী পাটের জাত।

কেনাফ জাতসমূহ : এইচ সি-২ (জলি কেনাফ), এই সি-৯৫

মেষ্টাজাত : এইচ সি-২৪ (টানী মেষ্টা)

জমিচাষ : ফার্মুল-চৈত্র মাসে দুইএক পশলা বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে পাটের জমি চাষ করতে হয়। রবি ফসল তোলার পর পরই জমি চাষ করা উচিত। ৫-৬টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটির চেলা ভেঙে

সমান করতে হবে। পাটের বীজ ছেট বলে মাটির দলা ভেঙে যিহি করতে হবে এবং আগাছা থাকলে বা পূর্ববর্তী ফসলের শিকড় উঠিয়ে ফেলতে হবে, নতুন বীজ আশানুরূপ গজাবে না।

সার প্রয়োগ : পাটের জমিতে সঠিক সময়ে পরিমাণমতো জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করে পাটের ফলন সহজেই বৃক্ষ করা যায়। পাটের জমিতে সঠিক নিয়মে জৈব সার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সার পরিমাণে কম লাগবে। তবে মাটিতে সন্তা ও গন্ধকের অভাব অনুভূত না হলে জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

বীজ ব্যবহার পর সার প্রয়োগ : জমি নিড়ানি দিয়ে আগাছা মুক্ত করে ও-৯৮৯৭ জাত বাদে অন্যান্য জাতের বেলায় শতক প্রতি ২০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ও-৯৮৯৭ জাতের বেলায় শতক প্রতি ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কিছু পরিমাণ তকনো মাটির সাথে মিশিয়ে জমিতে ছিটিয়ে দিয়ে 'হে' বা নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ছিতীয়বার ইউরিয়া সার দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গাছের কচি পাতা ও ডগার প্রয়োগকৃত সার না লাগে। সার প্রয়োগের সময় মাটিতে যেন পর্যাপ্ত রস থাকে।

বীজ শোধন : বীজ ব্যবহার আগে শোধন করে নেয়া উত্তম। প্রতি কেজি পাট বীজের সাথে রিডেমিল বা ক্যাপটান ৭৫% বালাইনশক মিশিয়ে বীজ শোধন করে নেয়া উচিত।

বীজ ব্যবহার সময় : সঠিক সময়ে পাটের বীজ না বুললে গাছে অসময়ে ফুল আসে এবং ফলন কম হয়, পাটের গুণগত মানও কমে যায়। পাট জাতভেদে ১৫ই ফেব্রুয়ারি হতে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোনা হয়।

বীজ ব্যবহার পদ্ধতি ও বীজ হার : জমিতে পাট বীজ সারিতে ও ছিটিয়ে এ দুই উপায়ে ব্যবহার করা যায়। সারিতে বীজ ব্যবহার করলে বীজের পরিমাণ কম লাগে। এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ২৫-৩০ সেমি এবং সারিতে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ৭-১০ সেমি আবার ছিটানো পদ্ধতিতে বুললে বীজ বেশি লাগবে। বীজ যেন মাটির খুব গভীরে বোনা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। জমিতে "জো" আসলে বীজ বুনতে হবে।

বীজ ব্যবহারের পর পরিচর্যা

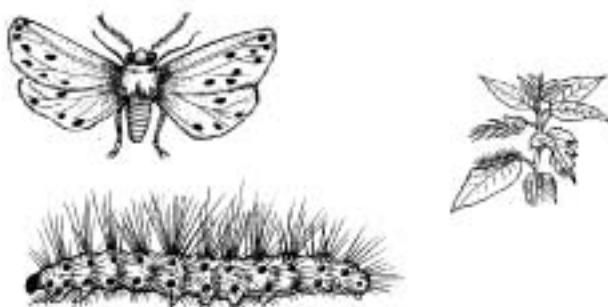
চারা পাতলা করণ ও আগাছা দমন : চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর ঘন চারা থেকে দুর্বল চারাগুলো উঠিয়ে এবং সাথে সাথে জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। ছিতীয় বার ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে এবং শেষবার ৪৫-৫০ দিনের মধ্যে নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।

সেচ ও নিকাশ ব্যবস্থা : পাটের জমিতে ধৰা দেখা দিলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে এবং জমিতে পানি জমে থাকলে তাকে নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

পোকামাকড় দমন : পাট ক্ষেত্রে বিছা পোকা, উচ্চসা, চেলে পোকা, ঘোড়া পোকা, মাকড় ইত্যাদির আক্রমণ হয়ে থাকে। নিচে কয়েকটি পোকার নাম, ক্ষতির লক্ষণ ও দমনের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

ক) বিছাপোকা

লক্ষণ : কচি ও বয়স্ক সব পাতাই খেয়ে ফেলে। জী মথ পাটের পাতার উল্টা পিঠে গাদা করে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাঢ়া বের হওয়ার পর প্রায় ৬-৭ দিন পর্যন্ত বাঢ়াগুলো পাতার উল্টা দিকে দলবদ্ধভাবে থাকে। পরে এরা সব গাছে ছড়িয়ে পড়ে। দল বদ্ধভাবে থাকা অবস্থায় কীড়াগুলো পাতার সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে সাদা পাতলা পর্দাৰ মতো করে ফেলে এবং আক্রমণ পাতাগুলো দূর থেকেই সহজে দৃশ্যমান হয়। আক্রমণ ব্যাপক হলে এরা কচি ডগাও খেয়ে ফেলে।



চিত্র : বিছাপোকা ও পাটগাছ।

দমন পদ্ধতি

- পাটের পাতায় ডিমের গাদা দেখলে ডিমের গাদাসহ পাতা তুলে খবৎস করতে হবে।
- আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে যখন ডিম থেকে বের হওয়া কীড়াগুলো দলবদ্ধভাবে থাকে, তখন গোকাসহ পাতাটি তুলে পায়ে লিষ্যে, গর্তে চাপা দিয়ে অথবা অল্প কেরোসিন মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে মারতে হবে।
- পাট কাটার পর তকনো জমি চাষ করলে মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা পুনরুৎপন্ন গুলো বের হয়ে আসে যা গোকাখাদক পাখি খেয়ে ফেলে।
- বিছা পোকা যাতে আক্রান্ত ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে ছড়াতে না পারে সেজন্য আক্রান্ত ক্ষেত্রে চারদিকে প্রতিবক্ষক নালা তৈরি করে অল্প কেরোসিন মিশ্রিত পানি নালায় রাখতে হবে।
- নির্ধারিত মাত্রায় রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

খ) উরচুঙা

সংক্ষণ

জমিতে গর্ত করে দিনের বেলায় গর্তে বসবাস করে এবং সন্ধ্যা বেলায় গর্ত থেকে বের হয়ে চারা পাটগাছের গোড়া কেটে গর্তে নিয়ে যায়। এতে পাট ক্ষেত্র মাঝে মাঝে গাছশূন্য হয়ে, যায়। অনাবৃষ্টির সময় আক্রমণ বেশি হয় এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের পর আক্রমণ কমে যায়। পূর্ণ বয়স্ক পোকা পাট গাছের শিকড় ও কাণ্ডের গোড়ার অংশ ধায়।



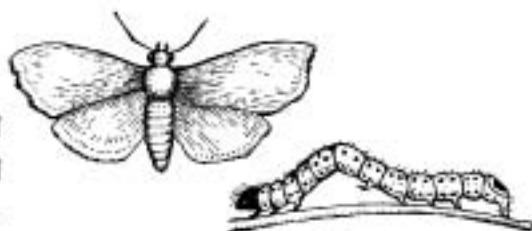
দমন পদ্ধতি

- প্রতিবছর যেসব জমিতে উরচুঙার আক্রমণ দেখা যায় সেখানে সাধারণ পরিমাণের চেয়ে বেশি করে বীজ বপন করতে হবে।
- আক্রান্ত জমিতে চারা ৮-৯ সেমি হওয়ার পর ঘন গাছ বাছাই করে পাতলা করতে হবে।
- সম্ভব হলে নিকটস্থ জলাশয় থেকে আক্রান্ত জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।
- জমি চাষের সময় নির্ধারিত মাত্রায় রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
- গর্তে কীটনাশক প্রয়োগ করে।
- কীটনাশক বালাইনাশকের বিষটোপ প্রয়োগ করে।

গ) ঘোড়া পোকা

লক্ষণ

ঘোড়া পোকা পাট গাছের কঢ়ি ডগা ও পাতা আক্রমণ করে। ফলে কঢ়ি ডগা নষ্ট হয়ে যায় এবং শাখা-প্রশাখা বের হয়। ফলে পাটের ফলন ও আঁশের মান কমে যায়।



চিত্র : ঘোড়া পোকা

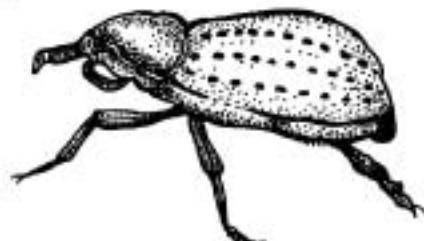
দমন পদ্ধতি

- পোকার আক্রমণ দেখা দিলে কেরোসিন ভেজা দড়ি গাছের উপর দিয়ে টেনে দিলে পোকার আক্রমণ কম হয়।
- শালিক বা ময়না পাখি ঘোড়া পোকা থেতে পছন্দ করে। তাই এসব পাখি বসার জন্য পাট কেতে বাঁশের কঞ্চি এবং গাছের ডাল পুঁতে দিতে হবে।
- নির্ধারিত মাঝায় রাসায়নিক বালাইনাশক ছিটাতে হবে।

ঘ) চেলে পোকা

লক্ষণ

ঞী পোকা চারা গাছের ডগায় ছিদ্র করে তিম পাড়ে। তিম ফুটে বাচ্চা গাছের ভিতরে চলে যায় এবং সেখানে বড় হতে থাকে। ফলে গাছের ডগা মরে যায় এবং শাখা-প্রশাখা বের হয়। গাছ বড় হলে পাতার গোড়ায় কান্দের উপর ছিদ্র করে তিম পাড়ে। ফলে এই জায়গায় পিটের সূচি হয়। পাট পচানোর সময় এই পিটগুলো পচেন। আঁশের উপর কালো দাগ থেকে যায়। এতে আঁশের মান ও দাম কমে যায়।



চিত্র : চেলে পোকা

দমন পদ্ধতি

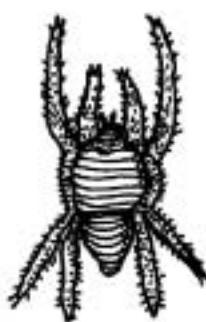
- বীজ বপনের আগে ও পাট কাটার পরে ক্ষেতের আশে পাশে যে সব আগাছা থাকে সেগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।
- আক্রান্ত পাট গাছগুলো তুলে নষ্ট করে ফেলতে হবে।
- গাছের উচ্চতা ৫-৬ সেমি. লম্বা হওয়ার পর নির্ধারিত মাঝায় রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ঙ) মাকড়

পাটক্ষেতে দুই ধরনের মাকড় দেখা যায়। যথা- হলদে ও লাল মাকড়।

লক্ষণ

হলদে মাকড় কঢ়ি পাতায় আক্রমণ করে পাতার রস চুরে থায়। এতে কঢ়ি পাতাগুলো কুঁকড়ে যায় এবং পাতার রং তামাটে হয়ে যায়। হলদে মাকড় ফুলের কুঁড়িকেও আক্রমণ করে। ফলে কুঁড়ি ফুটতে পারে না। ফুলের পাপড়ির রং হলদে থেকে কালচে রঙের হয়ে যায় ও বারে পড়ে। এতে বীজের ফলনশোষণ করে যায়। একটানা থেকা বা অন্তর্বৃত্তির সময় এদের আক্রমণ বেশি দেখা যায়। লাল মাকড় একটু নিচের পাতা আক্রমণ করে।



চিত্র : লাল মাকড়

দমন পক্ষতি

- চূন ও গুৰুক ১৫২ অনুপাতে পানির সাথে মিশিয়ে আক্রান্ত পাট ছেকে ছিটাতে হবে।
- কাঁচা নিমপাতার রস ২৫ অনুপাতে পানির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
- নির্ধারিত মাত্রায় রাসায়নিক বালাইনাশক ছিটাতে হবে।

কাঞ্জ : শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে পাট ফসলের বিভিন্ন উপকারী ও অপকারী কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করে অ্যালবাম তৈরি করবে। একের শিক্ষক কীটপতঙ্গ সংগ্রহের ও অ্যালবাম তৈরির নিয়মগুলো বলে দেবেন।

রোগ দমন : পাটে কাও পচা, কালোপটি, গোড়া পচা, তকানো ক্ষত, ঢলে পড়া, ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়। নিম্নে কয়েকটি রোগের লক্ষণ ও দমন পক্ষতি বর্ণনা করা হলো :

- ক) কাঞ্চপচা রোগ :** লক্ষণ : পাতা ও কাণ্ডে গাঢ় বাদামি রঙের দাগ দেখা দেয়। এ দাগ গাছের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত যে কোনো অংশে দেখা দিতে পারে। দাগগুলোতে অসংখ্য কালো বিন্দু দেখা যায়। এ কালো বিন্দুগুলোতে ছাঁচাক জীবাণু থাকে। কখনো কখনো আক্রান্ত স্থানে গোটা গাছই ভেঙে পড়ে। কেনাফ ও মেষ্টা পাটে এ রোগ দেখা দিতে পারে।
- খ) কালো পটিরোগ :** এ রোগের লক্ষণ প্রায় কাও পচা রোগের মতোই। তবে এতে কাণ্ডে কালো রঙের বেঠনীর মতো দাগ পড়ে। আক্রান্ত স্থানে ঘষলে হাতে কালো গুঁড়ার মতো দাগ সাগে। এ রোগে গাছ ঝরিয়ে মারা যায়।
- গ) শুকনা ক্ষত :** এ রোগটি শুধু দেশি জাতের পাটেই দেখা যায়। চারা অবস্থায় আক্রমণ করলে চারা মারা যায়। বড় গাছের কাণ্ডে কালচে দাগ পড়ে। আক্রান্ত স্থান ফেঁটে যায় এবং ক্ষতস্থানে জীবাণু সৃষ্টি হয়। এ জীবাণুগুলো বাতাসে উড়ে ফল আক্রমণ করে। আক্রান্ত ফল কালো ও আকারে ছোট হয়। এ রোগে গাছ মরে না, তবে আক্রান্ত অংশ শক্ত হয়। তাই পাট পচানোর পরেও আক্রান্ত স্থানের ছাল পাট কাঠির সাথে লেগে থাকে। এর আঁশ নিম্নমানের হয়।

প্রতিকার/দমন ব্যবস্থা : কাও পচা, কালোপটি ও শুকনা ক্ষত এ তিনটি রোগই বীজ, মাটি ও বায়ুবাহী। এদের প্রতিকারের ব্যবস্থাও একই রকমের। যেমন :

- পাট কাটার পর জমির আগাহা, আবর্জনা ও পরিত্যক্ত গাছের গোড়া উপরিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- বীজ বপনের আগে বীজ শোধন করতে হবে।
- নীরোগ পাট গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- জমি থেকে সর্বদা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- রাসায়নিক বালাইনাশক ছিটাতে হবে।

পাট-কটা ও আঁটি বাঁধা

সঠিক সময়ে পাট না কাটলে পাটের গুণ ও ফলন উভয়ই কমে যায়। সাধারণত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে দেশি পাট এবং শ্রাবণ-ভদ্র মাসে তোঢ়া পাট কাটতে হয়। গাছে ফুল আসলে বুঝতে হবে পাট কটার সময় হয়েছে। তাই পাট গাছ কটার পরই এ সমস্ত গাছকে আলাদা করে প্রায় ১০ কেজি ওজনের আঁটি বাঁধা হয়। আঁটি বাঁধার পর সেগুলোকে ৩-৪ দিন জমিতেই স্থুপ করে রাখলে গাছের পাতাগুলো করে যাবে। পাতাগুলো জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। পাটের পাতা ভালো সার।



চিত্র : পাট কটা ও আঁটি বাঁধা।

পাট জাগ দেওয়া

প্রথমে ১০-১৫ টি আঁটি একলিকে গোড়া রেখে তারপর উল্টা দিকে গোড়া রেখে আরও আঁটি পানির উপর সাজাতে হবে একেই পাটের জাগ বলে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে জাগের উপর ৩০ সেমি ও নিচে ৬০ সেমি পানি থাকে। প্রতি ১০০টি আঁটির উপরে ১ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে দিলে পাট তাড়াতাড়ি পচে ও পাটের আঁশের রং ভালো হয়। পাট জাগ দেওয়ার জন্য বিল, খাল বা নদীর মৃদু স্ন্যাতযুক্ত পরিকার পানি সর্বাপেক্ষা উন্নত।



চিত্র : পাট জাগ দেওয়া।

জাগ দ্রুবানোর জন্য মাটির তেলা, কলাগাছ, আমগাছ ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এতে আঁশের রং কালো হয়। বাঁশের খুটির সাথে রশি দিয়ে বেঁধে, কিংবা পাথর দিয়ে চাপা দিয়ে জাগ দ্রুবানো যায়। জাগ ঢাকার জন্য কচুরিপানা, ধানের খড় ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাট পচনের সময় নির্ধারণ

পাট গাছের আঁটি পানিতে দুবানোর ১০-১১ দিন পর থেকেই পাটের পচন পরীক্ষা করতে হবে। সাধারণত জাগ থেকে ৪-৫ টি পাট গাছ টেনে বের করে যদি সহজে ছাল তথা আশ পৃথক করা যায় তবে বুঝতে হবে পাট গাছের পচন শেষ হয়েছে। গরম আবহাওয়ায় ১২-১৪ দিন এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ২০-২৫ দিনের মধ্যেই পাট পচে যায়।

আশ ছাড়ানো ও পরিকারকরণ

পচার পর গাছ থেকে দুইভাবে আশ ছাড়ানো যায়। যথা-

- ১) পানি থেকে প্রতিটি আঁটি উঠিয়ে এবং শুকনো জায়গায় বসে প্রতিটি গাছ থেকে আলাদাভাবে আশ ছাড়িয়ে নেওয়ার পর কক্ষগুলো পাট গাছের আশ একত্র করে খুঁয়ে নেওয়া হয়।
- ২) হাটু বা কোমর পর্যন্ত পানিতে দাঁড়িয়ে পাটের আঁটির গোড়ায় কাঠ বা বাঁশের ঝুঁতির ঘারা পিটানো হয়। পরে গোড়ার অংশ হাতে পেঁচিয়ে নিয়ে পানির উপর সমান্তরালভাবে সামনে পিছনে ঠেলা দিলেই অঙ্গভাগের পাটকাঠি বের হয়ে যায়। পরবর্তীতে আশগুলো ভালোভাবে খুঁয়ে নিয়ে আঁটি বেঁধে রাখা হয়।

আশ শুকানো ও সংরক্ষণ

প্রথম সূর্যালোকে বাঁশের আড় তৈরি করে তাতে পাটের আশ শুকানো হয়। আশ কম শুকালে ভিজা থাকে বিধায় পচন ক্রিয়া শুরু হয়। এতে আশের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সঠিকভাবে পাটের আশ শুকিয়ে নেওয়ার পর সুন্দর করে আঁটি বেঁধে উদামে সংরক্ষণ করতে হয়।

ফলন

জাত ভেদে ফলনের তারতম্য হয়। তোষা পাটের তুলনায় দেশি পাটের ফলন সামান্য বেশি হয়।

বাংলাদেশের পাট ফসলের গুরুত্ব

পাট একটি আশ জাতীয় ফসল। বাংলাদেশে উৎপাদিত অর্থকরী ফসলগুলোর মধ্যে পাটের ছান শীর্ষে। পাটের ব্যবহারিক উপযোগিতা, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করে পাটকে সোনালি আশ বলে অভিহিত করা হয়। পাট ফসলটি যে সময়ে জন্মায় সে সময় বৃষ্টি থাকে। তাই সেচের দরকার হয় না। পাট ফসলটি খরা ও জলাবদ্ধতা দূটোই সহ্য করতে পারে। কাজেই বাংলাদেশের যে সব এলাকায় সেচ ব্যবস্থার অভাব রয়েছে এবং যেখানে যে মাস থেকে সেচের মাস পর্যন্ত জমিতে পানি জমে থাকে, সেখানে ধানের চেয়ে পাট চাষ বেশি হয়। এছাড়া বাংলাদেশের প্রায় ৩০০-৪০০ হাজার হেক্টর জমি আছে যেখানে এগিল থেকে সেচের পর্যন্ত শুধু পাট ছাড়া অন্য কোনো ফসল চাষ সম্ভব নয়। খরা, বন্যা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদির কারণে পাট অন্যান্য ফসলের চেয়ে কম অক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশে দেশি ও তোষা এ দুইজাতের পাটের চাষ হয়। তবে দেশি জাতের তুলনায় তোষা জাতের পাটের চাষ বর্তমানে বেশি হচ্ছে। এর কারণ হলো পূর্বে যে সব এলাকায় দেশি পাটের চাষ হত, তা ছিল নিচু এলাকা। বর্তমানে খাদ্য শস্যের চাহিদার জন্য ঐ সমস্ত এলাকা ধান চাষের আওতায় চলে গেছে। পাট চলে গেছে তুলনামূলকভাবে উচু ভূমি এলাকায় যেখানে বৃষ্টি নির্ভরতা বেশি। যাহোক পাট ফসল শুধু আশ হিসাবেই নয়, কৃষিজ্ঞত শিল্পে, ঔষধিশিল্পে, পরিবেশ সংরক্ষণে ও সবজি হিসাবে পাটের গুরুত্ব অপরিসীম।

কাজ : শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে পাট ফসল চাষের গুরুত্ব বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

সরিষার চাষ

বাংলাদেশে তেল ফসল হিসাবে সরিষা, সয়াবিন, তিল, তিসি, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী প্রভৃতির চাষ হয়ে থাকে। তবে এ দেশের মানুষ সরিষাকেই প্রধান ভোজ্য তেল বীজ ফসল হিসাবে বেশি চাষ করে থাকে।

নিম্নে সরিষা চাষ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

জমি নির্বাচন

সরিষা চাষের জন্য বেলে দোআঁশ অথবা পলি দোআঁশ মাটি উপযোগী। অতএব, সহজে পানি নিকাশ করা যায় একেপ বেলে দোআঁশ বা পলি দোআঁশ মাটির জমি নির্বাচন করতে হবে।

জাত নির্বাচন

অনেক জাতের সরিষার চাষ হয়। নিম্নে সরিষার অনুমোদিত কতকগুলো জাতের নাম, যেমন- টরি-৭, কল্যাণীয়া, সোনালি সরিষা, সম্পদ, রাই সরিষা, বারি সরিষা-৮, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বারি সরিষা-১৬।

বপনের সময়

বাংলাদেশে সরিষা শীতকালীন ফসল। বিভিন্ন অঞ্চলের তারতম্য এবং জমির "জো" অবস্থা অনুসারে টরি-৭, কল্যাণীয়া, সোনালি সরিষা ও বারি সরিষা-৮ এর বীজ মধ্যে আখিন থেকে মধ্য কার্তিক মাস (অক্টোবর) পর্যন্ত বোনা যায়। বারি-১৪, বারি-১৫ ও বারি-১৬ এর বীজ আখিন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বপন করা যেতে পারে।

জমি তৈরি

জমির প্রকারভেদ অনুযায়ী মাটির 'জো' অবস্থায় ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে জমি তৈরি করতে হবে। সরিষার বীজ ছেটি বিধায় চেলা ভেঙে মই দিয়ে মাটি সমান ও হিহি করতে হবে। জমির চারদিকে নালার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে প্রয়োজনে সেচ এবং পানি নিকাশে সুবিধা হয়।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

জাত, মাটি ও মাটিতে রাসের তারতম্য অনুসারে সরিষার জমিতে কমপোস্ট সার, ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিঙ্ক সালফেট, বোরাক্স/বোরিক, এসিড ইত্যাদি সার সঠিক নিয়মে প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া সারের অর্ধেকসহ বাকি সব সার জমি প্রস্তুত করার সময় মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকী অর্ধেক ইউরিয়া ফুল আসার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হয়। সার উপরি প্রয়োগের সময় মাটিতে রস থাকা দরকার।

বীজেরহার

সরিষার জাত টরি-৭, কল্যাণীয়া, সোনালি সরিষা ও বারি সরিষা-৮ এর জন্য প্রতি শতকে ২৮-৩২ গ্রাম বীজ লাগে।

বপন পদ্ধতি

সরিষার বীজ সাধারণত ছিটিয়ে বোনা হয়। বীজ ছেটি বিধায় বোলার সময় জমিতে সমানভাবে ছিটানো কষ্টকর হয়। এজন্য বালি বা ছাই এর যে কোনো একটি বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ



চিত্র : ফুলসহ সরিষা গাছ ও সরিষা বীজ।

ছিটালে জমিতে সমভাবে পড়ে। এতে জমির কোনো জায়গায় গাছ ঘন এবং কোনো জায়গায় পাতলা হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। সারি করে সরিষার বীজ বেলা থায়। এতে সার, সেচ, নিড়ানি প্রভৃতি পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। এ ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব সাধারণত ২৫-৩০ সেমি রাখা হয় ও প্রতি সারিতে ৪-৫ সেমি দূরত্বে এবং ২-৪ সেমি গভীরতার বীজ বপন করা হয়। মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকলে ২-৩ দিনের মধ্যে চারা গজাবে।

কাজ : শিঙ্গারীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ সরিষা ফসলের ক্ষেত্রে পরিদর্শন করবে এবং সরিষা ফসল উৎপাদনের ধাপগুলো লিখে দলীয়ভাবে জমা দিবে।

পরিচর্যা

সরিষার জমিতে নিম্নলিখিতভাবে পরিচর্যা করা হয়।

- ১) **পানিসেচ :** মাটির আর্দ্রতা পর্যাপ্ত থাকলে সরিষার জমিতে সেচের প্রয়োজন হয় না। মাটির আর্দ্রতা বৃক্ষে ২-৩ টি সেচ দিলে বেশ ভালো ফলন হয়। প্রথম সেচ বীজ বপনের ২০-২৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় সেচ গাছে ফল হওয়ার সময় দিলে ভালো হয়। বপনের পূর্বে যদি মাটি শুষ্ক থাকে তবে একটি হালকা সেচ দিয়ে জমি তৈরি করা উচিত। সরিষা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই সেচের পানি জমিতে জমে থাকতে দেওয়া উচিত নয়।
- ২) **গাছ পাতলা করণ :** চারা খুব ঘন হলে পাতলা করে দিতে হবে। জমির কোথাও চারা না গজালে প্রয়োজনে সেখানে বীজ আবার বপন করতে হবে। পাতলাকরণের কাজটি চারা গজাবার ১০-১৫ দিনের মধ্যে করতে হবে।
- ৩) **আগাছা দমন :** সরিষার জমিতে আগাছা দেখা মাত্র নিড়ানি দিয়ে তুলে ফেলতে হবে। চারা পাতলা করার সময়ই আগাছা দমন করা থায়। যে সব জমিতে অরোবাংকির আক্রমণ দেখা যায় সে সব জমিতে পর পর দুই বছর সরিষা চাষ না করাই ভালো।
- ৪) **রোগের কারণ, লক্ষণ ও দমন :** সরিষা ফসলের প্রধান রোগ অস্টারনারিয়া ব্রাইট বা পাতায় দাগ পড়া রোগ অন্যতম। এ রোগ দেখা দিলে গাছের পাতায় প্রথমে বাদামি পরে গাঢ় রঙের গোলাকার দাগ দেখা যায়। এ রোগের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করতে হলে প্রতিরোধ হিসাবে সঠিক নিয়মে বপন করা দরকার।
- ৫) **পোকা মাকড় দমন :** সরিষার প্রধান ক্ষতিকারক পোকা হলো জাবপোকা। বাচ্চা ও পরিণত জাবপোকা সরিষার কাণ, পাতা, পুষ্পমঞ্জরি, ফুল ও ফল থেকে রস চুম্বে থায় ফলে গাছ দুর্বল হয়ে থায়। ফুল ও ফল ধারণ বাধাগ্রস্ত হয়। ফল কুঁচকে ছেট হয়ে থায় এবং শতকরা ৩০-৭০ ভাগ ফলন কম হতে পারে। জানুয়ারি মাসে আক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয়। জাব পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ম্যালারিয়ন-৫-৭ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে সিক্কন যন্ত্রের সাহায্যে সরিষার ক্ষেত্রে ছিটাতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

যখন গাছের শতকরা ৭০-৮০ ভাগ সরিষার ফল খড়ের রং ধারণ করে এবং গাছের পাতা হলদে হয় তখনই ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। সকালে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় শিশিরভেজা অবস্থায় ফসল সংগ্রহ করা উচিত। মূলসহ গাছ টেনে তুলে অথবা কাঁচির ধারা কেটে ফসল সংগ্রহ করা থায়। তবে টেনে তোলাই ভালো।

ফসল মাড়াই

ফসল সংগ্রহের পর ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে মাড়াই করতে হবে। কিন্তু কিন্তু অগুট বীজ থাকতে পারে। অপুট বীজগুলোকে আলাদা করতে হবে।

বীজ তকানো ও সংরক্ষণ

মাড়াই করার পর বীজ বেড়ে রোদে ভালোভাবে ৩-৪ দিন অবস্থায় নেওয়ার পর শক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করা উচ্চম। সংরক্ষিত বীজ মধ্যে শক্তিয়ে আবার সংরক্ষণ করতে হয়। রোদে তকানো বীজ গরম অবস্থায় সংরক্ষণ করলে বীজের অঙ্গুরোদগম ঘটতে নষ্ট হয়ে যায়। তাই রোদে তকানো বীজ ঠাণ্ডা করে প্লাস্টিক পাত্রে, ঢিলে বা ছামে রেখে মুখ ভালোভাবে বক্ষ করতে হবে ফেন পাত্রের ভিতরে বায়ু প্রবেশ করতে না পারে।

ফলন

বাংলাদেশে সরিষার ফলন প্রতি শতকে প্রায় ৩ থেকে ৩.৫ কেজি।

সরিষা ফসলের গুরুত্ব

বাংলাদেশের ৩ প্রকার সরিষার চাষ হয়। যথা- টরি, খেত ও গাই। বিভিন্ন জাতের সরিষার বীজে ৪০-৪৪% তেল থাকে। সরিষার বীজ থেকে তৈল নিষ্কাশনের পর যে বৈল থাকে তাতে প্রায় ৪০% আমিষ এবং ৬৪% নাইট্রোজেন থাকে। সরিষার বৈল গরু, মহিষের জন্য খুবই পুষ্টিকর খাদ্য এবং উৎকৃষ্ট জৈব সার। এছাড়া গাছার কাজে সরিষার তেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার সরিষার জমিতে কৃত্রিম উপায়ে অত্যন্ত অল্প খরচে মৌমাছি পালন করে মধু সংগ্রহ করা যায়। এ জন্য সরিষাকে মধু উত্তিদণ্ড বলা হয়। কাজেই অর্থনৈতিক, ঔষধশিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে সরিষা ফসল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরিষা ফসল চাষের গুরুত্ব বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

মাসকলাই চাষ

বাংলাদেশে চাষকৃত ভাল ফসলের মধ্যে মাসকলাইয়ের ছান চতুর্থ। দেশে মেট উৎপাদিত ভালের ৯-১১% আসে মাসকলাই থেকে। দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাসকলাইয়ের চাষ বেশি হয়ে থাকে। মাসকলাই একটি শক্ত ও খরা-সহিষ্ণু ফসল যা উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। ভাল হিসাবে ছাড়াও এটি কাঁচাগাছ অবস্থায় পণ্ডখাদ্য ও সরুজ সার হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। কাজেই ভাল ফসল হিসাবে মাসকলাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবার আমরা মাসকলাই এর চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।

জমি নির্বাচন

সুনিষ্কাশিত দোআশ ও দোআশ মাটি
মাসকলাই চাষের জন্য উপযোগী। উচু
থেকে নিচু সব ধরনের জমিতে মাসকলাই
চাষ করা যায় যদি পানি জমে থাকার
আশঙ্কা না থাকে। মাসকলাই উচু ও
শকনো জলবায়ুর ফসল।



চিত্র : মাসকলাই

জাতসমূহ

বাংলাদেশে চাষকৃত মাসকলাইয়ের বেশ কিছু উন্নত ও স্থানীয় জাত রয়েছে। নিচে মাসকলাই এর কয়েকটি জাতের নাম দেওয়া হলো :

- ক) উফশী জাত : পাছ, শরৎ, হেমন্ত, বিনামাস-১, বিনা মাস-২
- খ) স্থানীয় জাত : রাজশাহী, সাধুহাটি

জমি তৈরি

মাসকলাই চাষের জন্যে খুব মিহিভাবে জমি তৈরির প্রয়োজন হয় না। জমি ও মাটির প্রকারভেদে ২-৩টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি সহান করে তৈরি করতে হয়।

বীজ ব্যবস্থার সময়

মাসকলাই বীজ ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যবস্থার সময় করা যায়।

বীজ হার: নিচে মাসকলাই চাষের জন্য বীজ হার দেওয়া হলো :

উদ্দেশ্য	ব্যবস্থা	বীজহার (গ্রাম/শতক)
বীজের জন্য	ছিটিয়ে	১৪০-১৬০
	সারিতে	১০০-১২০
পন্থাদান্য বা সরুজ সারের জন্য	ছিটিয়ে	২০০-২৪০

বীজ ব্যবস্থা

মাসকলাইয়ের বীজ ছিটিয়ে বা সারি করে ব্যবস্থা করা যায়। তবে বীজের জন্য সারিতে ব্যবস্থা করা ভালো। সারিতে ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি রাখতে হয়। সারিতে বীজগুলো অবিরতভাবে ২-৩ সেমি গভীরে বীজ ব্যবস্থা করা হয়। ছিটানো পদ্ধতিতে শেষ চাষের সময় মই দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হয়।

বীজ শোধন

বীজ বাহিত রোগ দমনের জন্য বীজ শোধন করে ব্যবস্থা করা দরকার।

সার প্রযোগ

মাসকলাই চাষে হেঁটুর প্রতি সারের পরিমাণ নিম্নরূপ :

সারের নাম	সারের পরিমাণ (গ্রাম/শতক)
ইউরিয়া	১৬০-১৮০
টি এস পি	৩৪০-৩৮০
এম ওপি	১২০-১৬০
অণুবীজ সার	১৬-২০

সার প্রযোগের নিয়মাবলি

জমি তৈরির শেষ চাষের সময় সব সার প্রয়োগ করতে হবে। জীবাণুসার প্রয়োগ করা হলে ইউরিয়া সার প্রযোগের দরকার হয় না। প্রতি কেজি বীজের জন্য ৮০ গ্রাম হারে অণুবীজ সার প্রয়োগ করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ মাসকলাই ফসলের ক্ষেত্র পরিদর্শন করবে এবং মাসকলাই ফসল উৎপাদনের ধাপগুলো লিখে দলীয়ভাবে জমা দিবে।

অর্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

- চারা গজানোর পরে আগাছা দেখা দিলে ১৫-২০ দিন পর নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- জলাবদ্ধতার আশঙ্কা থাকলে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বপনের পর জমিতে রসের পরিমাণ কম বা অভাব হলে হালকা সেচ দিতে হবে।
- সেচের পর 'জো' অবস্থায় মাটির উপরের শক্ত স্তর ভেঙ্গে দিতে হবে।
- ফসলের জমিতে পোকা ও রোগের আক্রমণ দেখা দিলে তা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

রোগ ব্যবস্থাপনা :

ক) মাসকলাইয়ের পাতার দাগ রোগ

রোগের কারণ ও বিভাগ

সারকোস্পোরা নামক ছত্রাক ঘারা এ রোগটি হয়। পরিত্যক্ত ফসলের অংশ, বায়ু ও বৃষ্টির মাধ্যমে এ রোগ বিভাগ লাভ করে। অধিক অর্দ্ধতা ও উচ্চতাপে এ রোগ দ্রুত বিভাগ লাভ করে।

রোগের লক্ষণ

আক্রান্ত পাতার উপর ছোট ছোট লালচে বাদামি গোলাকৃতি হতে ডিখাকৃতির দাগ পড়ে। আক্রান্ত অংশের কোথসমূহ শক্তিয়ে ঘায় এবং পাতা ছিন্ন হয়ে ঘায়। আক্রমণের মাঝা বেশি হলে সম্পূর্ণ পাতা ঝলসে ঘায়।

প্রতিকার

রোগ প্রতিরোধী জাতের (পাঞ্চ, শৰৎ ও হেমন্ত) মাসকলাই চাষ করতে হবে। আক্রমণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ছত্রাকলাশক প্রয়োগ করতে হবে।

খ) পাউডারি মিলভিট রোগ

রোগের কারণ ও বিভাগ

গুইডিয়াম প্রজাতির ছত্রাক ঘারা এ রোগ হয়ে থাকে। সাধারণত শক মৌসুমে এ রোগের অধিক প্রকোপ দেখা ঘায়। বীজ, পরিত্যক্ত গাছের অংশ ও বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ বিভাগ লাভ করে।

রোগের লক্ষণ

পাতার উপর পৃষ্ঠে পাউডারের মতো আবরণ পড়ে। হাতে স্পর্শ করলে পাউডারের উঁড়ার মতো লাগে।

প্রতিকার

বিকল্প পোষক ও গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। টিন্ট বা থিওভিট প্রয়োগ করতে হবে। রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে। ছত্রাকলাশক ঘারা বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।

গ) হলদে মোজাইক ভাইরাস

রোগের কারণ ও বিভাগ

মোজাইক ভাইরাস ঘারা এ রোগ হয়ে থাকে। আক্রান্ত বীজ ও বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ বিভাগ লাভ করে। সাদা মাছি এ রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে।

রোগের লক্ষণ

কচি পাতা প্রথমে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত পাতার উপর হলদে সবুজ দাগ পড়ে। দূর থেকে আক্রান্ত জমি হলদে মনে হয়।

প্রতিকার

রোগমুক্ত বীজ বগন করতে হবে। সামা মাছি দমনের জন্য ম্যালাথিয়ন স্প্রে করতে হবে। আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে। রোগ প্রতিরোধী জাতের মাসকলাইয়ের চাষ করতে হবে।

পোকা ব্যবস্থাপনা

মাসকলাই ফসলে বিষ্ণু পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ পোকা পাতা, অপরিপক্ষ সবুজ ফলের রস খেয়ে ফেলে। পাতাসহ সমস্ত গাছ সামা জালিকার মতো হয়ে যায়। ফলে ফলন কমে যায়। এ পোকার আক্রমণ দেখা দিলে হাত দ্বারা সেভলোকে সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে পরিমাণ মতো সাইপারামেট্রিন ইসি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

এছাড়া গুদামজাত মাসকলাই ডাল পূর্ণবয়স্ক পোকা ও কীড়া উভয়ই ক্ষতি করে থাকে। এ পোকা ডালের খোসা ছিন্ন করে ভিতরে চুকে শীস খেতে থাকে। ফলে দানা হালকা হয়ে যায়। এর ফলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং খাওয়ার অনুপোয়ুক্ত হয়ে পড়ে। গুদামজাত করার আগে ভালোভাবে পরিষ্কার করে দানা উকিয়ে দানার আন্তর্ভুক্তি ১২% এর নিচে আনতে হবে। বীজের জন্য টনপ্রতি ৩০০ গ্রাম ম্যালাথিয়ন বা সেভিন শতকরা ১০ ভাগ গুড়া মিশিয়ে পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

ফসল কাটা, মাড়াই ও গুদামজাতকরণ

থরিপ-১ মৌসুমে যে মাসের শেষ এবং থরিপ-২ মৌসুমে অক্টোবর মাসের শেষে ফসল সংগ্রহ করা হয়। পরিপক্ষ হলে সকালের দিকে ফসল সংগ্রহ করতে হবে। জাতের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একবার বা ২-৩ বার ফসল সংগ্রহ করতে হবে। প্রথম দিকে পরিপক্ষ ফল হাত দিয়ে এবং শেষবারের বেলায় কাঁচি দিয়ে গাছগুলো গোড়া থেকে কেটে নিতে হবে। গাছগুলো রোদে উকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত বীজ রোদে ভালোভাবে উকিয়ে পরিষ্কার ও ঠাণ্ডা করে মাটি বা টিনের পাত্রে মুখ বন্ধ করে গুদামজাত করতে হবে।

ফলন

জাত স্তেপে মাস কলাইয়ের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ১.৫-২ টন হয়ে থাকে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে ধান, পাট, সরিষা ও মাসকলাই ফসলের পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের একটি তালিকা তৈরি করে বিষয় শিক্ষকের নিকট জমা দিবে।

ঘৰ্তীয় পরিচেন্দ

শাকসবজি চাষ পদ্ধতি

আমরা শাক সবজি প্রতিনিয়তই ফসলের জমিতে, বাগানে, হাটে বাজারে দেখতে পাই। আমরা এগুলো নিজের জমি থেকে বা বাজার থেকে সংগ্রহ করে শাকসবজির চাহিদা পূরণ করে থাকি। এবার আমরা এসব শাকসবজির চাষ সম্পর্কে জানব। তবে চাষ পদ্ধতি জানার আগে শাকসবজির গুরুত্ব ও শাকসবজি চাষের বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা করা দরকার।

১) শাকসবজির গুরুত্ব

শাকসবজিতে প্রচুর পুষ্টি বিদ্যমান। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে সবজির উৎপাদন ও ব্যবহার অতি উচ্চ পর্যায়ে পৌছেছে।

আধুনিক পদ্ধতিতে শাকসবজি চাষ করে একদিকে পারিবারিকভাবে চাহিদা মেটানো যায় এবং অন্য দিকে এগুলো বিক্রি করে বাড়তি আয়ও করা যায়। কাজেই খাদ্য, ভিটামিন, খনিজ ও অর্ধকর্মী ফসল হিসাবে শাকসবজি চাষ করা খুবই জরুরি।



চিত্র : বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি।

খাদ্য হিসাবে শাকসবজি

১.১. খাদ্য মান হিসাবে : শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, বি ও সি থাকে। এ ছাড়া আমিষ, ক্যালরি ও খনিজ পদার্থের উৎস হিসাবেও শাকসবজির গুরুত্ব অনেক।

১.২. ভেষজ ক্ষণাঙ্গন হিসাবে শাকসবজি : শাকসবজির ভেষজ ক্ষণাঙ্গন হিসাবে অনেক অবদান রয়েছে। যেমন- শশা হজমে ও কোষ্টকাঠিন্য দূর করার কাজ করে। রসুনে বাত রোগ সারে ইত্যাদি।

১.৩. অর্থনৈতিক দিক থেকে শাকসবজি : মানব দেহের জন্য শাকসবজি অত্যাবশ্যক। সুস্থ ও স্বল্প দেহ নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেককে পর্যাপ্ত পরিমাণে শাকসবজি গ্রহণ করতে হয়। কাজেই শাকসবজি উৎপাদনে একদিকে পরিবারের চাহিদা মেটানো যায় অন্যদিকে এগুলো বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবানও হওয়া যায়। শাকসবজি চাষ করে পতিত জমির ব্যবহার করা যায়, বৈদেশিক মূদ্রা আয়, বেকার সমস্যার সমাধান, নতুন শিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটে এবং মহিলা ও পারিবারিক শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানো যায়।

অতএব উপরের আলোচনা হতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে শাকসবজি উৎপাদন সব দিক দিয়ে বিশেষভাবে লাভজনক এবং গুরুত্বপূর্ণ ।

২. শাকসবজির শ্রেণিবিভাগ

পৃথিবীর অসংখ্য উদ্ভিদ শাকসবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে প্রায় ৬০ জাতের শাকসবজির চাষাবাদ হয়। উৎপাদন মৌসুমের উপর ভিত্তি করে এসব শাকসবজিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

(১) শীতকালীন শাকসবজি (২) গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি (৩) বারমাসি শাকসবজি। যেমন :

শীতকালীন সবজি : টমেটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শিম, গাজর ইত্যাদি।

গ্রীষ্মকালীন সবজি : করলা, কিঙা, পটল, ধূমল, পুইশাক ইত্যাদি।

বারমাসি সবজি : বেগুন, টেক্স, পেপে, কাঁচকলা ইত্যাদি।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শীত, গ্রীষ্ম ও বারমাসি শাকসবজির একটি তালিকা তৈরি করে জমা দিবে।

শিম, টমেটো প্রধানত শীতকালীন সবজি। বর্তমানে দুই একটি জাত বের হয়েছে যা গ্রীষ্মকালেও ফলন দিয়ে থাকে। শিম কলমি নামক কলমিশাক প্রায় সারা বছরই চাষ করা যায়। শসা এবং খিচা মিলিয়ে শসা জাতীয় ফসল সারা বছরই পাওয়া যায়। তাই এসব সবজিকে বারমাসি সবজি বলা হয়।

৩. শাকসবজি উৎপাদনের বিবেচ্য বিষয়

আমরা এতক্ষণ বিভিন্ন শাকসবজির নাম এবং কোনগুলো কোন মৌসুমে জন্মায় তা জেনেছি। এবার শাকসবজি উৎপাদনের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি সম্পর্কে জেনে নেই।

কোনো ফসল তথা শাকসবজি চাষ বা উৎপাদন করার পূর্বে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ভালো বীজ, বীজতলার জমি নির্বাচন ও তৈরি, বীজ বপন ও বীজতলার যত্ন, মূল জমি নির্বাচন ও জমি তৈরি, বীজ বপন ও রোপণ, পানি সেচ ও নিকাশ, আগাছা দমন ও মালচিং, পোকামাকড় দমন, রোগ দমন ও সময় মতো ফসল সংগ্রহ।

৪. শাকসবজি চাষ পদ্ধতি

শাকসবজি চাষাবাদের বেশ কিছু পদ্ধতি দেশে বিদেশে চালু আছে। এগুলোর মধ্যে সচরাচর ব্যবহৃত কয়েকটি পদ্ধতি হলো পর্যায় ক্রমিক চাষ পদ্ধতি, মিশ্র ফসল পদ্ধতি, রিলে ফসল পদ্ধতি, ফালি ফসল পদ্ধতি, সারিতে ফসল চাষ পদ্ধতি।

নিম্নে কয়েকটি শাকসবজির চাষাবাদ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

পালংশাক চাষ

পালংশাক বেশ জনপ্রিয়, পৃষ্ঠিকর ও সুস্বাদু পাতা সবজি। এ সবজি অধিক ভিটামিনসমৃদ্ধ। বাংলাদেশে শীতকালে এর চাষ করা হয়।

পালংশাকের জাত : পুষা জয়ত্বী, কপি পালং, গ্রিন, সবুজ বাংলা ও টকপালং।
এছাড়া আছে নবেল জায়েন্ট, ব্যানার্জি জায়েন্ট, পুল্প জ্যোতি ইত্যাদি।



চিত্র : পালংশাক

মাটি

দোআঁশ উর্বর মাটি বেশি উপযোগী। এছাড়াও এন্টেল, বেলে-দোআঁশ মাটিতেও চাষ করা যায়।

জমি তৈরি

জমি চাষ ও মই দিয়ে মাটি মিহি করে তৈরি করতে হবে।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	শতক প্রতি
গোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১ কেজি
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমওপি	৫০০ গ্রাম

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি

- ক) ইউরিয়া ছাড়া সব সার জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে গোবর জমি তৈরির প্রথম দিকে প্রয়োগ করাই উত্তম।
- খ) ইউরিয়া সার চারা গজানোর ৮-১০ দিন পর থেকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ কিন্তিতে উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

আল নির্বাচন ও তৈরি

জমিতে আইল তৈরি করেও পালংশাক চাষ করা যায়। উচু আইল পালংশাকের জন্য নির্বাচন করা হয়। উচু আইলে কিছুটা আগাম পালংশাক বীজ বপন করা যায়। কোদাল দিয়ে আইলের মাটি কৃপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরি করতে হবে।

সার প্রয়োগ

পালংশাকের জমিতে নিয়ম অনুযায়ী গোবর, ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ বপনের হার

প্রতি আইলে	প্রতি শতকে	প্রতি একরে	প্রতি হেক্টেরে
৩৫-৪০ গ্রাম	১১৭ গ্রাম	৯-১১ কেজি	২৫-৩০ কেজি

বীজ বপনের সময়

সেপ্টেম্বর- জানুয়ারি মাস।

বীজ বপনের দূরত্ব

১০ সেমি দূরে দূরে বীজ বপন করতে হয়। তবে ছিটিয়েও বীজ বপন করা যায়।

অঙ্কুরোদগ্ধমের সময়

বীজ বপনের পর অঙ্কুরোদগ্ধমে প্রায় ৭-৮ দিন সময় লাগে।

বীজ বপন বা চারা রোপণ : জমিতে আইলে সরাসরি বীজ ছিটিয়ে বা গর্ত তৈরি করে মাদায় বীজ বপন করা যায় অথবা বীজতলায় চারা তৈরি করে সে চারা রোপণ করেও পালংশাক চাষ করা যায়। বীজ বপনের পূর্বে বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত তৈরি করে প্রতি মাদায় ২-৩ টি করে বীজ বপন করতে হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি শাকসবজি বাগান পরিদর্শন করবে এবং পালংশাক চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো লিখে দলীয়ভাবে জমা দিবে।

পরিচর্যা

আগাছা নির্ধন

জমিতে আগাছা দেখা দিলেই তা তুলে ফেলতে হবে।

সার উপরিপ্রয়োগ

সময় মতো নিয়মানুযায়ী সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

এ শাবের জন্য প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। তাই সারের উপরিপ্রয়োগের আগে মাটির 'জো' অবস্থা বুঝে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। চারা রোপণের পর হালকা সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

শূন্যস্থান পূরণ

কোনো স্থানের চারা মধ্যে গেলে অথবা বীজ না গজালে সেখানে ৭-১০ দিনের মধ্যে পুনরায় চারা রোপণ করতে হয়।

মাটি আলগাকরণ

গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য মাটিতে বেশি দিন রস ধরে রাখা এবং মাটিতে যাতে সহজে আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে সেজন্য প্রতিবাব পানি সেচের পর আইল/জিহির উপরের মাটি আলগা করে দিতে হয়।

গাছ পাতলা করণ

বীজ গজানোর ৮-১০ দিন পর প্রতি মাদায় ২টি করে চারা রেখে অতিরিক্ত চারা উঠিয়ে ফাঁকা জায়গায় রোপণ করতে হয়।

ক্ষতিকর পোকামাকড়

পালঃশাকে মাঝে মাঝে পিলীলিকা, উরচুকা, উইপোকা এবং পাতাছিন্নকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়। আক্রমণ হলে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হয়।

রোগ ব্যবস্থাপনা

পালঃশাকের প্রধান রোগের মধ্যে রয়েছে- ১) গোড়া পচা রোগ ২) পাতার দাগ রোগ ৩) পাতা খসা রোগ। এছাড়া পালঃশাকে আরও দুইধরনের রোগ দেখা যায়। যেমন- ডাউনি মিলডিউ, পাতায় গোলাকৃতির দাগ।

ফসল সংগ্রহ

বীজ বপনের এক মাস পর থেকে পালঃশাক সংগ্রহ করু করা যায় এবং গাছে ফুল না আসা পর্যন্ত যে কোনো সময় সংগ্রহ করা যায়।

ফসল

প্রতি আলো	প্রতি শতকে	প্রতি একরে	প্রতি হেক্টেরে
৮-১০ কেজি	২৮-৩৭ কেজি	২৮০০-৩৮০০ কেজি	৭-৯ টন

পুইশাক

পুইশাক বাংলাদেশের প্রধান গ্রীষ্মকালীন পাতাজাতীয় সবজি, তবে সারা বছর ধরেই পাওয়া যায়। এতে ভিটামিন এ, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। পুইশাক সাধারণত বসতবাড়ির আঙিনার বেড়ায় বা মাচায় জন্মাতে দেখা যায়। এছাড়া ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ করা হয়।

জাত : পুইশাকের দুইটি জাতের চাষ হয়ে থাকে। যথা-
ক) লাল পুইশাক : পাতা ও কাণ্ড লালচে।
খ) সবুজ পুইশাক : পাতা ও কাণ্ড সবুজ।

এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ২টি জাতে আছে। যেমন বারি-১, বারি-২।

জমি তৈরি

সাধারণত মার্চ-এপ্রিল বা তৈজ মাস পুইশাক লাগানোর ভালো সময় তবে সেচের সুবিধা থাকলে ফালুন মাস হতেই এর চাষ করা যেতে পারে। চারা রোপণের পূর্বে জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরা করে তৈরি করে নিতে হবে। এ সর্বজি চাষের জন্য উর্বর বেলে-দোআশ ও দোআশ মাটি উভয়।

সার প্রয়োগ

পুইশাক চাষে গোবর বা কমপোস্ট সার ব্যবহার করা ভালো। এতে মাটির গুণাগুণ বজায় থাকবে ও পরিবেশ রক্ষা হবে। পুইশাকের জন্য প্রতি শতকে বা ৪০ বগমিটার জমিতে নিম্নজপ সার ব্যবহার করতে হবে।



চিত্র : পুইশাক

সারের নাম	শতক প্রতি
গোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১ কেজি
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমওপি	৫০০ গ্রাম

বীজ বপন ও চারা রোপণ

মার্চ-এপ্রিল মাসে পুইশাকের বীজ বপন করতে হয়। বীজ ও শাখা কলম দিয়ে পুইশাকের চাষ করা যায়। তবে বীজ দিয়ে চারা তৈরি করে এবং তা রোপণ করে চাষ করাই ভালো। পুইশাকের চারা ৬০-৮০ সেমি দূরে দূরে সারি করে ও সারিতে ৫০ সেমি দূরে দূরে রোপণ করতে হবে। বর্ষার সময় পুইশাকের লতার কিছু অংশ কেটে মাটিতে রোপণ করা যায়।

পরিচর্যা

নিডানি দিয়ে জমি আগচ্ছামুক্ত রাখতে হবে। স্থানের সময় নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। সেচের পর নিডানি দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে দিতে হবে। জমিতে ঘাতে পানি না জমে সে দিকে খেজাল রাখতে হবে।

পোকামাকড়

এ শাকের ক্ষতিকর পোকার মধ্যে তুঁয়োপোকা উল্লেখযোগ্য। এ পোকা গাছের পাতা, কচি ডগা খেয়ে ক্ষতি করে থাকে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন

পুইশাকের ডগা লাঘ হতে তবু করলেই ডগা কেটে সংগ্রহ করতে হবে। এভাবে ডগা কেটে সংগ্রহ করলে নতুন ডগা গজাবে। নতুন ডগা কয়েকবার কেটে ফসল সংগ্রহ করা যায়। ভালোভাবে চাষ করলে প্রতি শতকে ১৩০-১৫০ কেজি পুইশাকের ফলন পাওয়া যায়।

বেগুন চাষ

বেগুন অতি পরিচিত একটি সবজি। যা সারা বছর পাওয়া যায়। এদেশ ছাড়াও ভারত, চীন, জাপান, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ ইউরোপীয় দেশসহ প্রতিতি দেশে এর চাষ হয়ে থাকে।

জাত

ইসলামপুরী, শিলাধ, উত্তরা, নয়নকাঞ্জল, মুক্তকেশী, খটখটিয়া, তারাপুরী, নয়নতারা উল্লেখযোগ্য। বারামাসী কালো ও সাদা বর্ণের জাত (ডিম বেগুন) রয়েছে। বিদেশি জাতের মধ্যে ঝ্যাক বিউটি, ক্লোরিড বিউটি, উল্লেখযোগ্য।

বীজবপন ও চারা উৎপাদন

বেগুন চাষের জন্য চারা উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শীতকালীন বেগুন চাষের জন্য শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি হতে আশ্বিন মাস এবং বর্ষাকালীন বেগুন চাষের জন্য চৈত্র মাস পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। বালি, কমপোস্ট ও মাটি সম্পরিমাণে মিশিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হয়।

বীজ গজানোর ৮-১০ দিন পর চারা তুলে ছিতীয় বীজতলায় রোপণ করতে হবে।

জমি নির্বাচন

দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি বেগুন চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো। তবে পানি অপসারণের ভালো ব্যবস্থা থাকলে এন্টেল ও দোআঁশ মাটিতেও বেগুনের চাষ করা যায়।

জমি তৈরি

জমি তৈরির জন্য ৪-৫ বার আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরবুরা করে তৈরি করতে হবে। ভালো ফসল পেতে হলে জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে।

সারের নাম	শতক প্রতি
গোবর	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১ কেজি
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমওপি	৫০০ গ্রাম

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি

- ক) ইউরিয়া ছাড়া সব সার জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে গোবর জমি তৈরির প্রথম দিকে প্রয়োগ করাই উত্তম।
- খ) ইউরিয়া সার চারা গজানোর ৮-১০ দিন পর থেকে ১০-১২ দিন পর ২-৩ কিলিটে উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

চারা রোপণ

এক মাস বয়সের সবল চারা কাঠির সাহায্যে তুলে নিতে হবে। চারা গাছের শিকড়ের ঘেন ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এর পর ৭৫ সেমি দূরত্বের সারিতে ৬০ সেমি দূরে দূরে চারা রোপণ করতে হবে।

কাজ : শিক্কার্থীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি শাকসবজি বাগান পরিদর্শন করবে এবং বেগুন চাষ পদ্ধতির উপর একটি দলীয় প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।



চিত্র : বেগুনসহ বেগুনগাছ

পরিচর্বা

মাটিতে রাসের অভাব হলে বা মাটি শুকিয়ে গেলে ১০-১৫ দিন পর পানি সেচ দিতে হবে। সেচের পর নিড়ানি দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে দিতে হবে। আগাছা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।

বেগনের বালাই ব্যবহারণা

এ দেশে কমপক্ষে ১৬ প্রজাতির পোকা এবং একটি প্রজাতির মাকড় বেগন ফসলের ক্ষতি করে থাকে। এর মধ্যে বেগনের প্রধান শত্রু ডগা ও ফল ছিন্নকারী পোকা এই পোকা বেগনের ডগা ও ফল ছিন্ন করে। আক্রান্ত ডগা ও ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এছাড়াও ম্যালাথিয়ন বা সুমিথিয়ন নামক কীটনাশকের যে কোনো একটি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি মিলিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। এছাড়া নিম্নলিখিত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বেগনের বালাই দমন করা যায়-

- ক) কলম চারা ব্যবহারের মাধ্যমে বেগনের উইল্টরোগ দমন করা যায়।
- খ) ফেরোমন ও মিষ্টিকুমড়ার ফাঁদ ব্যবহারের মাধ্যমে বেগন জাতীয় ফসলের মাছি পোকা দমন করা যায়।
- গ) মূরগির পচনকৃত বিষ্ঠা ও সরিষার খেল ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন সবজি দেমন- বেগন, টমেটো, শশা, বাধাকপি ফসলের মাটি বাহিত রোগ দমন করা যায়।
- ঘ) সঠিক সময়ে আগাছা দমন ও মালচিং করলে ফলন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।
- ঙ) পোকা প্রতিরোধী জাত ব্যবহারের মাধ্যমে বেগনের ডগা ও ফলের মাজরা পোকা দমন করা যায়।
দেমন- বারি বেগন-১ (উত্তর), বারিবেগন-৫ (নয়নতারা), বারিবেগন-৬, বারিবেগন-৭ ইত্যাদি
পোকা প্রতিরোধী জাত।
- চ) পোকার আক্রমণমুক্ত চারা ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) সুস্থ সার ব্যবহার করে।
- জ) শস্য পর্যায় অনুসরণ করে

ফসল সংগ্রহ ও ফলন

চারা রোপণের ৩০-৪০ দিনের মধ্যে গাছে ফুল আসে। বেগনের ফল বীজ শক্ত হওয়ার আগেই সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত প্রতি শতকে বা ৪০ বগমিটার জমিতে ১৪০ কেজি বেগন উৎপন্ন হয়। উত্তরা বেগন
২৫০ কেজি পর্যন্ত ফলন দেয়।

বিপর্যন

বেগন ফসল সংগ্রহের পর ঠাণ্ডা ও খোলা জায়গায় কঁকেক দিন সংরক্ষণ করা যায়। তবে বন্তায় বেশিক্ষণ রাখা ঠিক হবে না। এতে বেগন তার স্বাভাবিক রং হারাতে পারে এবং পচে যেতে পারে।

কুমড়া চাষ

কুমড়া অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি সবজি। এ জাতীয় সবজির কিছু শীতকালীন ও কিছু শীতকালীন জাত আছে যা বাংলাদেশে জন্মায়। আবার কিছু জাত আছে সারা বছরই সংরক্ষণ করে সবজির চাহিদা পূরণ করা যায়।
কুমড়া জাতীয় সবজির মধ্যে মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া ও লাউ প্রধান। আমরা এখন মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া ও লাউ সবজিঙ্গলো সম্পর্কে জানব।

ক) মিষ্টি কুমড়া চাষ

ভূমিকা

মিষ্টি কুমড়ায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' থাকে। এর ফল কোঠা ও পাকা উভয় অবস্থায়ই খাওয়া যায়। তবে এর প্রধান ব্যবহার পাকা অবস্থায়। কুমড়ার পাতা ও কচি ডগা খাওয়া যায়। মিষ্টিকুমড়া সচরাচর বৈশাখী, বর্ষাতি ও মাঘী এ তিনি শ্রেণিতে বিভক্ত।

চাষের সময়

বৈশাখী কুমড়ার বীজ মাঘ মাস, বর্ষাতি কুমড়ার বীজ বৈশাখ এবং মাঘী কুমড়ার বীজ শ্রাবণ মাসে বপন করতে হয়।

মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ

মাদার জন্য সাধারণত ৩-৪ মিটার দূরত্বে ৮০-১০০ ঘন সেমি আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। প্রতি গর্তে গোবর বা কমপোস্ট ৫ কেজি, ইউরিয়া ১৩০ গ্রাম, টিএসপি ২০০ গ্রাম, এমওপি ১৫০ গ্রাম, জিপসাম ৯০ গ্রাম ও দস্তা সার ৫ গ্রাম দিতে হবে। ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার বীজ বোনার ৮-১০ দিন আগে গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া দুইভাগে বীজ বোনার ১০ দিন পর প্রথমবার ও ৩৫ দিন পর দ্বিতীয়বার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। মাদার চারপাশে অগভীর একটি নালা কেটে সার নালার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

বীজ বপন

মাদা তৈরি হতে ১০-১২ দিন পর প্রতি মাদায় ২-৩ টি বীজ মাদার মাঝখানে রোপণ করতে হবে।

পরিচর্বা

আগাছা থাকলে তা পরিষ্কার করে চারা গাছের গোড়ায় কিছুটা মাটি তুলে দিতে হবে। মাঝে মাঝে নিড়ানি দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে হবে। গোড়ার কাছাকাছি কিছু খড় ১৫-২০ দিন পর বিছিয়ে দিতে হবে। ফল ধরা শুরু করলে ফলের নিচেও খড় বিছিয়ে দিতে হবে। বৈশাখী কুমড়া মাটিতে হয়, অন্যান্য কুমড়ার জন্য মাচার ব্যবস্থা করতে হয়। গাছের লতাপাতা বেশি হলে কিছু লতাপাতা ছেঁটে দিতে হবে।

পোকা ও রোগ দমন

কুমড়া জাতীয় গাছের বিভিন্ন পোকার মধ্যে লাল পোকা, কঁটালে পোকা এবং ফলের মাছি উল্লেখ্য রোগ্য। এ পোকা দমনের জন্য সেভিন ডায়াজিনল প্রয়োগ করা যেতে পারে। আর এ জাতীয় সবজির রোগের মধ্যে পাউডারি মিলডিও, ডাউনি মিলডিও ও এন্থ্রাকনোজ প্রধান। দুই সঙ্গাহ পর পর ডায়াথেন এম ৪৫ প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল সঞ্চাহ ও ফলন

মিষ্টিকুমড়া কচি অবস্থা থেকে শুরু করে পরিপূর্ণ পাকা অবস্থায় খাওয়া যায়। তাই কচি অবস্থা থেকেই ফসল সঞ্চাহ শুরু হয়। কুমড়া বেশ পাকিয়ে সঞ্চাহ করলে অনেকদিন ঘরে রাখা যায়। শতক প্রতি ফলন ৮০-১০০ কেজি হতে পারে।



চিত্র : মিষ্টি কুমড়াসহ গাছের কিছু অংশ

খ) চালকুমড়া চাষ

জুমিকা

গ্রামবাংলায় ঘরের চালে এ সবজি গাছ উঠানে হয় বলে এটি চাল কুমড়া নামে পরিচিত। তবে জমিতে মাচায় ফলন বেশি হয়। কচি ফল (জালি) তরকারি হিসাবে এবং পরিপন্থ ফল মোরকা ও হালুয়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

চাল কুমড়ার জাত

বাংলাদেশে কুমড়ার কোনো অনুমোদিত জাত নেই। তবে বারি কর্তৃক উন্নতিকৃত বারি চালকুমড়া-১ নামের জাতটি বাংলাদেশের সব অঞ্চলে চাষ করা যায়।

মাটি

দোআশ মাটিতে এটি চাষ করা হয়। তবে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কানা মাটি ছাড়া যে কোনো মাটিতে চাষ করা যায়।

চাষের সময় : ফেব্রুয়ারি-মে

মাদা তৈরি

জমি ভালোভাবে চাষ করে মই দিয়ে ঢেলা ভেঙে সমান করতে হবে। জমিতে মাদার উচ্চতা হবে ১৫-২০ সেমি প্রয় হবে ২.৫ মিটার এবং লম্বা জমির সুবিধামতো নিতে হবে। এভাবে পর পর মাদা তৈরি করতে হবে। একপ পাশাপাশি দুইটি মাদার মাঝখানে ৬০

সেমি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা খাকবে। পারিবারিক বাগানে চাল কুমড়ার চাষ করতে হলে মাদায় বোনার পর চারা গজালে তা মাচা, ঘরের চাল কিংবা কোনো বৃক্ষের উপর ভূলে দেওয়া হয়।

মাদায় সার প্রয়োগ

প্রতি মাদায় গোবর ১০ কেজি, টিএসপি ২০০ গ্রাম, এমওপি ৫০ গ্রাম দিতে হবে।

মাদায় গর্ত তৈরি

মিটিকুমড়া চাষের নিয়মের অনুসরণ।

মাদার গর্তে বীজবপন

প্রতি মাদায় সারিতে ৪-৫ টি বীজ বপন করতে হবে। ৫-৭ দিনের মধ্যেই বীজগুলো গজাবে। চারা গজানোর কয়েকদিন পর প্রতি মাদায় ২-৩ টি সবল গাছ রাখতে হবে।



চিত্র : চালকুমড়াসহ গাছের কিছু অংশ

কাজ : শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি শাকসবজি বাগান পরিদর্শন করে চালকুমড়া মিটি কুমড়ার চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো লিখে জমা দিবে।

পরিচর্যা

মাদা শুকিরে গেলে সেচ দিতে হবে। বর্ষার পানি জমলে তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। গাছের বৃদ্ধির জন্য মাচা দিতে হবে। মাদার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। গাছের গোড়ায় মাটি উঠিয়ে দিতে হবে।

বালাই ব্যবস্থাপনা

ফলের মাছি পোকা, রেড পামকিন বিটল, ইপিল্যাকলা বিটল, লাল মাকড় প্রভৃতি পোকা ফলের ক্ষতি করে থাকে। কীটনাশক প্রয়োগ করে এসব পোকা দমন করা যায়। এছাড়া পাউডারি মিলডিও পাতার উপরে সাদা পাউডার এবং ডাউনি মিলডিউ পাতার নিচে ধূসর বেগুনি রং প্রভৃতি রোগ পাতার ক্ষতি করে গাছকে দুর্বল করে ফেলে। ছুরাক নাশক বা বোর্দো মিস্কার প্রয়োগ করে এসব রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

লাউ চাষ

ভূমিকা

বাংলাদেশে লাউ একটি জনপ্রিয় সবজি। লাউয়ের চেয়ে এর শাক বেশি পুষ্টিকর।

লাউয়ের জাত

বাংলাদেশে লাউয়ের অনেক জাত চোখে পড়ে। ফলের আকার-আকৃতি এবং গাছের লতানোর পরিমাণ থেকেও জাতগুলো পার্থক্য করা যায়। যাহোক দেশীয় উন্নত এবং গবেষণালক্ষ কিছু জাতের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ক) দেশীয় জাত : গাঢ় সবুজ থেকে হালকা সবুজ
- খ) উন্নত জাত : বারিলাউ ১, বারিলাউ ২
- গ) হাইব্রিড জাত : গোলাকার বা লম্বা হালকা সবুজ

মাটি

প্রায় অনেক মাটিতেই লাউ ভালো উৎপাদিত হয়। তবে দোআঁশ মাটিতে লাউয়ের ফলন ভালো হয়। বেলে মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ করে প্রয়োজনীয় সেচ দিয়ে সহজে লাউ চাষ করা যায়।

বীজ ব্যবহারের সময়

আগস্ট-নভেম্বর

মাটি তৈরি, মাদা তৈরি, মাদায় সার প্রয়োগ ও মাদায় গর্ত তৈরি প্রভৃতি চালকুমড়া চাষের বর্ণনার অনুরূপ।

বীজ ব্যবহার

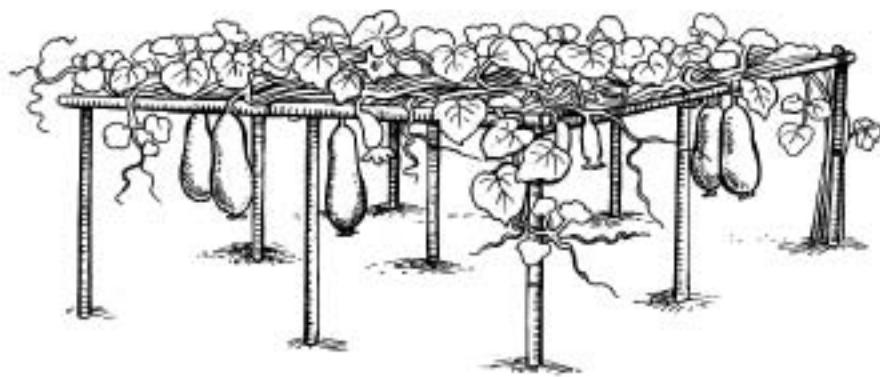
প্রতিমাদায় ৪-৫টি বীজ ব্যবহার করতে হবে। ৪-৫ দিনের মধ্যেই বীজ অঙ্গুরিত হবে।

বাউনি ও মাচা তৈরি

গাছ ঘৰ্খন ১৫-২০ সেন্টিমিটার বড় হয় তখন গাছের গোড়ার পাশে বাঁশের ডগা কঢ়িসহ মাটিতে পুঁতে দিতে হয়।

পরিচর্যা

চারা একটু বড় হলে প্রতি মাদায় ২টি করে চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে। মাটি নিড়ানি দিয়ে আলগা করে ঝুরঝুরা করতে হবে। লাউগাছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি প্রতিদিন দিতে হবে।



চিত্র : মাচায় লাউসহ লাউগাছ

বালাই ব্যবস্থাপনা

এ সবজিতে রেড পামকিন বিটল পোকার আক্রমণ হতে পারে। এ পোকা দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ধরে মেরে ফেলতে হবে। এছাড়া কিছু প্রজাতির ঘাসের মাধ্যমে লাউয়ের 'মোজাইক ভাইরাস' রোগ হতে পারে।

ফসল সঞ্চাহ

ফল তোলা বা সঞ্চাহ করার উপযুক্ত পর্যায় হবে যখন-

- ফলের গায়ে প্রচুর ওঁৎ এর উপস্থিতি থাকবে।
- ফলের গায়ে নখ দিয়ে চাপ দিলে খুব সহজেই নখ ঢেবে থাবে।
- পরাগায়ণের ১২-১৫ দিন পর ফল সঞ্চাহের উপযোগী হয়।

ফলন

বারি লাউ-১ এবং বারি লাউ-২ চাষ করলে যথাক্রমে হেক্টর প্রতি ৩৫-৪৫ টন (১৪০-১৮০ কেজি/শতক) পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

শিম চাষ

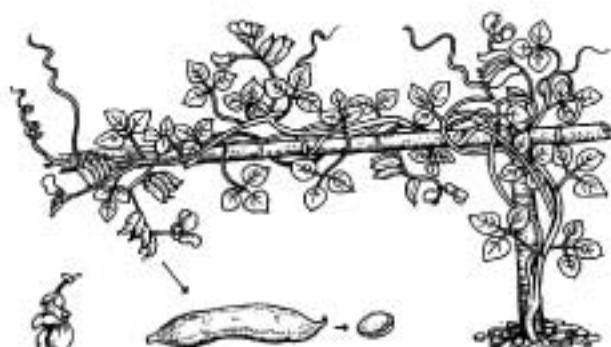
শিম বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় সবজি। শিমে প্রচুর পরিমাণে আমিষ থাকে। এটি শীতকালীন সবজি।

মাটি

দোআঁশ মাটি শিম চাষের জন্য উত্তম। তবে উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সব ধরনের মাটিতে শিম চাষ করা যায়।

জাত

বারি শিম-১, বারি শিম-২, বারি শিম-৩, বারি শিম-৪, ইপসা শিম, ঘৃত কাঠগুল, কার্তিকা, নলডক, বাঘনখা, বারমাসি প্রভৃতি শিমের জনপ্রিয় জাত।



চিত্র : শিমসহ শিমগাছ

বীজ বপনের সময় : মধ্য জুন থেকে সেল্টেবর পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়।

জমি তৈরি

বেশি জমিতে আবাদ করলে জমি কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে চেলা ক্ষেত্রে সমান করতে হবে। তবে বস্তুতাড়ির আশে পাশে, পুরুর পাড়ে, পথের ধারে ও জমির আলে সাধারণত শিমের চাষ করা হয়।

মাদা তৈরি

জমিতে মাদা (গর্ত) ৪৫ সেমি × ৪৫ সেমি × ৪৫ সেমি আকারে তৈরি করতে হবে। এক মাদা থেকে আরেক মাদার দূরত্ব ২.৫-৩ মিটার।

সার প্রয়োগ

প্রতিটি মাদা পচা আবর্জনা সার দিয়ে পূরণ করতে হবে। তারপর প্রতিটি মাদায় খেল গুঁড়া, ছাই, টিএসপি, মিউরেট অব পটাশ মাটির সাথে মিলিয়ে দিতে হবে। মাদাটি এমনভাবে ভরতে হবে যেন মাটি থেকে ভরাটকৃত মাদার উচ্চতা ১০ সেমি হয়। শিম ফসলটিতে নাইট্রোজেন সারের দরকার হয় না। কারণ এটি লিভেন পরিবারের ফসল। এদের শিকড়ে নডিউল বা গুটি তৈরি হয় যাতে প্রচুর বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন জমা থাকে।

বীজ বপন

সার প্রয়োগের ৭-৮ দিন পর প্রতি মাদায় ৫-৬ টি বীজ বপন করতে হবে। চারা গজানোর পর প্রতি মাদায় ২টি সুষু ও সবল চারা রেখে বাকিঙ্গলো তুলে ফেলতে হবে।

পরিচর্যা

গাছ ঠিকমতো বাড়ার জন্য মাচা দিতে হবে। গাছের গোড়ার মাটি শক্ত হলে নিড়ানি দিয়ে তা আলগা করতে হবে। মাটিতে রাসের অভাব হলে পানি সেচ দিতে হবে। বর্ষায় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না জমে সে জন্য গোড়ায় মাটি উঠিয়ে দিতে হবে। চারা বড় হতে থাকলে ১৫-২০ দিন পর পর ২-৩ কিস্তিতে ৬০ গ্রাম টিএসপি ও ৬০ গ্রাম এমওপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

বালাই ব্যবহারণ

শিম গাছে জাব পোকা, প্রিপস, পড় বোরার ইত্যাদির আক্রমণ হতে পারে। জাব পোকা নতুন ডগা, পাতা, ফুল ও ফল ইত্যাদির রস চুয়ে থায়। নিমের বীজের শীস পিসে পানিতে মিলিয়ে স্প্রে করে এদের দমন করা যায়। ভাইরাস আক্রান্ত গাছগুলো মাটিসহ উঠিয়ে গভীর গর্তে পুঁতে দিতে হবে।

ফসল সঞ্চাহ

জাত ক্ষেত্রে বীজ বপনের ১৫-১৪৫ দিন পর শিম গাছ থেকে শিম উঠানো যায়। বীজ হিসাবে শিম সঞ্চাহ করতে শিম যখন গাছে ঝকিয়ে হলদে বর্ণ হয়, তখন সঞ্চাহ করা হয়। শিম থেকে বীজ বের করে পরিষ্কার ও শক্ত পাওয়ে নিমের উকলা পাতার গুঁড়াসহ সংরক্ষণ করতে হবে।



চিত্র : শিম গাছের জাবপোকা।

ফলন

জাতক্ষেত্রে শিমের ফলনের তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন- বারি শিম-১ জাতের শিমের বীজ হেটেরপ্রতি ২-৩ টন (৮-১২ কেজি/শতক) উৎপাদিত হয়। সবজি হিসাবে শিম পুরা মৌসুমে উঠানো যায়। আর্দ্র-কার্তিক মাসে শিম ধরে। শিম গাছ ৪ মাসেরও বেশি ফলন দেয়।

কাজ : শিমার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে পালং, পুই, কুমড়া, শিম ও বেগনের রোগ বালাইয়ের একটি তালিকা তৈরি করে জমা দিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ফুল-ফল চাষ পদ্ধতি

ফুলের চাষ

বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ফুলের চাষ হয় না। তবে ক্ষুদ্র পরিসরে বাণিজ্যিকভাবে ফুলের চাষ হয়ে থাকে। সম্প্রতি রজনীগঙ্গা, গোলাপ ও প্রাডিগলাসের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ শুরু হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে বেলি, ঘুই, চামেলি, পক্ষরাজ, অপরাজিতা, শেফালি, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি নানা ধরনের ফুল জন্মে। বাণিজ্যিকভাবে এসব ফুলের চাষ করে লাভবান হওয়া সম্ভব। আমরা এবার ক্ষুদ্র গোলাপ ও বেলি ফুল চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।

গোলাপ চাষ

গোলাপকে ফুলের রানি বলা হয়। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে বছজমিতে গোলাপের চাষ হচ্ছে এবং দিন দিন গোলাপের চাষ বৃক্ষি পাচ্ছে। এবং গোলাপ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতপূর্ণ অবদান রাখছে।

জাত সমূহ

পৃথিবীজুড়ে গোলাপের অসংখ্য জাত রয়েছে। জাতগুলোর কোনোটির গাছ বড়, কোনোটি খোপালো, কোনোটি লাতানো। জাত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গোলাপ সাদা, লাল, হলুদ, কমলা, গোলাপি এবং মিশ্রিত রঙের হয়ে থাকে। এ ছাড়াও রানি এলিজাবেথ (গোলাপি), ব্র্যাক প্রিস (কালো), ইরানি (গোলাপি), মিরিস্তা (লাল), দুই রঞ্জ ফুল আইক্যাচার চাষ করা হয়।

বংশবিক্রিতা

গোলাপের বংশ বিকারের জন্য অবস্থাভেদে শাখা কলম, দাবা কলম, উটি কলম ও চোখ কলম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নতুন জাত উদ্ভাবনের জন্য বীজ উৎপাদন করে তা থেকে চারা তৈরি করা হয়।

জমি নির্বাচন

গোলাপ চাষের জন্য উর্বর দোআশ মাটির জমি নির্বাচন করা উচ্চম। ছায়াবিহীন উচু জায়গা যেখানে জলাবদ্ধতা হয় না, একপ জমিতে গোলাপ ভালো জন্মে।

জমি তৈরি

নির্বাচিত জমি ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা ও সমতল করতে হবে। এরপর মাটি কুপিয়ে ৫ সেমি উচু করে ৩ মি \times ১ মি আকারের বেড বা কেয়ারি তৈরি করতে হবে। এভাবে কেয়ারি তৈরির পর নির্দিষ্ট দূরত্বে ৬০ সেমি \times ৬০ সেমি আকারের এবং ৪৫ সেমি গভীর গর্ত খনন করতে হবে। গর্তের উপরের মাটি ও নিচের মাটি আলাদা করে রাখতে হবে। চারা রোপণের ১৫ দিন আগে গর্ত করে খোলা রাখতে হবে। এ সময়ে গর্তের জীবাণু ও পোকামাকড় মারা যায়।

সার প্রয়োগ

প্রতি গর্তের উপরের মাটির সাথে ছকে প্রদত্ত সারগুলো মিশিয়ে গর্তে ফেলতে হবে। এরপর নিচের মাটির সাথে ৫ কেজি পচা গোবর, ৫ কেজি পাতা পচা সার ও ৫০০ গ্রাম ছাই ভালোভাবে মিশিয়ে গর্তের উপরের স্তরে নিতে হবে। এভাবে গর্ত সম্পূর্ণ ভরাটি করার পর ১৫-২০ দিন ফেলে রাখলে সারগুলো পচবে ও গাছ লাগানোর উপযুক্ত হবে। বর্ষাকালে যাতে গাছের গোড়ায় বৃষ্টির পানি জমে না থাকে, সে জন্য নালা তৈরি করতে হবে।



চিত্র : ফুলসহ গোলাপের ডাল

চারা বা কলম রোপণ

আধিন মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে পৌষ মাস পর্যন্ত চারা লাগালে বেড়ের গর্তের মাঝখানে সুস্থান্তির গর্ত খুঁড়ে চারা লাগাতে হয়। প্রথমে পলিথিন ব্যাগ বা মাটির টব থেকে চারা বের করে দুর্বল শাখা, রোগাক্রান্ত শিকড় ইত্যাদি কেটে ফেলতে হয়। চারা লাগিয়ে গোড়ায় শঙ্খভাবে মাটি চেপে দিতে হবে। চারা রোপণের পর চারাটি একটি খুঁটি পুতে খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। চারা লাগিয়ে গোড়ায় পানি দেওয়া উচিত। ২-৩ দিন ছায়ার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

পরিচর্ষা

- আগাছা দমন : গোলাপের কেয়ারিতে অনেক আগাছা হয়। আগাছা তুলে ফেলতে হবে।
- পানি সেচ : মাটির অর্দ্ধতা ঘাটাই করে গাছের গোড়ায় এমনভাবে সেচ দিতে হবে যেন মাটিতে রসের হারাতি না হয়।
- পানি নিকাশ : গোলাপের কেয়ারিতে কোনো সময়ই পানি জমতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ গোলাপ গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।
- ভাল-পালা ছাঁটাইকরণ (Prunning) : গোলাপের নতুন ভালে বেশি ফুল হয়। তাই পুরাতন ও রোগাক্রান্ত ভালপালা ছাঁটাই করা প্রয়োজন। প্রতিবছর গোলাপ গাছের ভালপালা ছাঁটাই করলে গাছের গঠন কাঠামো সুন্দর ও সুসূচ হয় এবং অধিক হারে বড় আকারের ফুল ফোটে।
- ফুলের কুঁড়ি ছাঁটাই : অনেক সময় ছাঁটাই করার পর মূলগাছের ভালে অনেক কুঁড়ি জন্মায়। সবগুলো কুঁড়ি ফুটতে দিলে ফুল তেমন বড় হয় না। তাই বড় ফুল ফোটার জন্য আসল কুঁড়ি রেখে পাশের কুঁড়িগুলো ধারালো চাকু দিয়ে কেটে দিতে হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি ফুলের বাগানে বিভিন্ন ধরনের ফুল গাছ পরিদর্শন শেষে গোলাপ ফুলের চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো সঙ্গীয়ভাবে পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পোকা মাকড় ব্যবস্থাপনা

গোলাপ গাছে যেসব পোকা দেখা যায় তন্মধ্যে রেড ক্ষেল ও বিটল প্রধান।

- রেড ক্ষেল : এ পোকা দেখতে অনেকটা মরা চামড়ার মতো। গরমের সময় বর্ষাকালে এর আক্রমণ বেশি পরিলক্ষিত হয়। এ পোকা গাছের বাকলের রস চুরে থায়। ফলে বাকলে ছোট ছোট কালো দাগ পড়ে। প্রতিকার না করলে আক্রান্ত গাছ মারা যায়। গাছের সংখ্যা কম হলে দাঁত মাজার ত্রাশ দিয়ে আজন্ত স্থানে ত্রাশ করলে পোকা পড়ে যায়। ম্যালাথিয়ন বা ডায়াজিনল জাতীয় কীটনাশক প্রয়োগ করে এ পোকা দমন করা যায়।
- বিটল পোকা : শীতকালের শেষে এ পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এ পোকা গাছের কচি পাতা ও ফুলের পাপড়ি ছিন্ন করে থায়। সাধারণত রাতের বেলা আক্রমণ করে। আলোর ফাঁদ পেতে এ পোকা দমন করা যায়। ম্যালাথিয়ন জাতীয় কীটনাশক ছিটিয়ে এ পোকা দমন করা যায়।

রোগ ব্যবস্থাপনা

গোলাপ গাছে অনেক রোগ হয়। তন্মধ্যে কালো দাগ পড়া রোগ, ভাইব্যাক ও পাউডারি মিলতিউ প্রধান।

- ক) কালো দাগ পড়া রোগ : এটি একটি ছ্বাকজনিত রোগ। রোগাক্রমের পাছের পাতায় গোলাকার কালো রঙের দাগ পড়ে। আক্রান্ত গাছের পাতা বারে দিয়ে গাছ পত্রশূন্য হয়ে যায়। চৈত্র থেকে তরু করে কার্তিক মাস পর্যন্ত এ রোগের আক্রমণ ঘটে। এ রোগের প্রতিকারের জন্য গাছে সুধর সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের গোড়ায় যেন পানি জমে না থাকে সে নিকে খেয়াল করতে হবে। এ ছাড়া ছ্বাকলাশক প্রয়োগ করে এ রোগ দমন করা যায়। আক্রান্ত পাতাগুলো কেটে পুঁড়িয়ে ফেলতে হয়।
- খ) ভাইব্যাক : ভাল ছাঁচাইয়ের কাটা স্থানে এ রোগ আক্রমণ করে। এ রোগ হলে গাছের ভাল বা কাও মাথা থেকে কালো হয়ে নিচের দিকে ঝরতে থাকে। এ লক্ষণ ক্রমে কাণের মধ্য দিয়ে শিকড় পর্যন্ত পৌছে এবং সম্পূর্ণ গাছ মারা যায়। এ রোগ দমন করতে হলে আক্রান্ত কাও বা ভালের বেশ নিচ থেকে কেটে পুঁড়ে ফেলতে হবে। ভাল ছাঁচাইয়ের চাকু জীবাণুনাশক দিয়ে মুছে ভাল ছাঁচাই করা উচিত। কর্তিত স্থান স্পিরিট দিয়ে মুছে দিতে হবে।
- গ) পাউডারি মিলভিট : এটি একটি ছ্বাক জনিত রোগ। শীতকালে কুয়াশার সময় এ রোগের বিস্তার ঘটে। এ রোগে আক্রান্ত হলে পাতা, কচিফুল ও কলিতে সাদা পাউডার দেখা যায়। ফলে কুঁড়ি না ফুটে নষ্ট হয়ে যায়। এ রোগ দমন করতে হলে আক্রান্ত ডগা বা পাতা তুলে পুঁড়িয়ে দিতে হবে। অছাড়া থিওভিট বা সালফার, ভাইথেন এম-৪৫ যে কোন একটি পানিতে মিশিয়ে সঞ্চাহে একবার স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

ফুল সংগ্রহ

ফুল ফোটার পূর্বেই গাছ হতে ফুল সংগ্রহ করতে হয়। সংগ্রহের পর ফুলের ডাটার নিচের অংশ পরিষ্কার পানিতে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা জ্বায়গায় রাখলে ফুল ভালো থাকে। মাঝে মাঝে ফুলে পানির ছিটা দেওয়া ভালো।

বেলি ফুল চাষ

বাংলাদেশের অধিকাংশ উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ফুলের তোড়া, ফুলের মালাতে সুগন্ধীফুল হিসাবে বেলির কদর আছে। উৎসব ও অনুষ্ঠানে বেলিফুল ব্যবহৃত হয়। এটি একটি অর্ধকর্মী ফুল।

জাত

তিন জাতের বেলি ফুল দেখা যায়। যথা : ১। সিঙ্গল ধরনের ও অধিক গন্ধযুক্ত। ২। মাঝারি আকার ও ডবল ধরনের। ৩। বৃহৎসাকার ডবল ধরনের।



চিত্র : ফুলসহ বেলিফুল গাছ

বংশ বিস্তার : বেলি ফুল ডটি কলম, দাবা কলম ও ডাল কলম পদ্ধতির মাধ্যমে বংশবিস্তার করা হয়।



চিত্র : টবে সারা কলম



চিত্র : মাটিতে সারা কলম

জমি চাষ ও সার প্রয়োগ

বেলে মাটি ও ভারী এণ্টেল মাটি ব্যাক্তিত সব ধরনের মাটিতে বেলি ফুল চাষ করা যায়। জমিতে পানি সেচ ও পানি নিকাশের ব্যবস্থা থাকা ভালো। জমি ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরা ও সমান করতে হবে। জমি তৈরির সময় জৈব সার, ইউরিয়া, ফসফেট এবং এমওপি প্রয়োগ করতে হবে। প্রায় ১ মিটার অন্তর চারা রোপণ করতে হবে। চারা লাগানোর পর ইউরিয়া প্রয়োগ করে পানি সেচ দিতে হবে।

কলম বা চারা তৈরি

গ্রীষ্মের শেষ হতে বর্ষার শেষ পর্যন্ত বেলি ফুলের কলম বা চারা তৈরি করা যায়। চারা থেকে চারা ও সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি হতে হবে। চারা লাগানোর জন্য গর্ত খুড়ে গর্তের মাটি রোদ লাগিয়ে, জৈব সার ও কাঠের ছাই গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। এরপর প্রতি গর্তে বেলির কলম বসাতে হবে। বর্ষায় বা বর্ষার শেষের দিকে কলম বসানোই ভালো। তবে সেচের ব্যবস্থা ভালো হলে বসন্তকালেও কলম তৈরি করা যায়।

টবে চারা লাগানো

জৈব পদার্থ মুক্ত দোআশ মাটিতে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার পরিমাণমতো মিশিয়ে টবে বেলি ফুলের চাষ করা যায়। টব ঘরের বারান্দা বা ঘরের ছান্দে রেখে দেওয়া যায়।

পরিচর্চা

- সেচ দেওয়া : বেলি ফুলের চাষে জমিতে সবসময় রস থাকা দরকার। গ্রীষ্মকালে ১০-১২ দিন পর পর, শীতকালে ১৫-২০ দিন পর পর ও বর্ষাকালে বৃটি সময়মতো না হলে জমির অবস্থা বুঝে ২-১ টি সেচ দেওয়া দরকার।
- আগাছা দমন : জমি বা টব থেকে নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। খড় কেটে কুচি করে জমিতে বিছিয়ে রাখলে সেচের প্রয়োজন কম হয় এবং আগাছাও বেশি জন্মাতে পারে না।
- অঙ্গ ছাঁটাইকরণ : প্রতিবছরই বেলি ফুলের গাছের ডাল-পালা ছাঁটাই করা দরকার। শীতের মাঝামাঝি সময় ডাল ছাঁটাই করতে হবে। মাটির উপরের স্তর থেকে ৩০ সেমি উপরে বেলি ফুলের গাছ ছাঁটাই করতে হবে। অঙ্গ ছাঁটাইয়ের কয়েকদিন পর জমিতে বা টবে সার প্রয়োগ করতে হবে।

রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা

বেলি ফুল গাছে ক্ষতিকারক কীট তেমন দেখা যায় না। তবে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। এদের আক্রমণে পাতায় সাদা আক্তরণ পড়ে, আক্রান্ত পাতাগুলো কুঁকড়ে যায় ও গোল হয়ে পাকিয়ে যায়। গুরুক গুঁড়া বা গুরুক ঘাটিত মাকড়নাশক যেমন- সালট্যাফ, কেলথেন ইত্যাদি পাতায় ছিটিয়ে মাকড় দমন করা যায়।

বেলি ফুলের পাতায় হলদে বর্ণের ছিটে ছিটে দাগযুক্ত এক প্রকার ছাঁক রোগ দেখা যায়। ট্রিসেল-২ প্রয়োগ করে এ রোগ নমন করা যায়।

ফলন

ফেনুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে। ফলন প্রতি বছর বাঢ়ে। লভানো বেলিতে ফলন আরও বেশি হয়। সাধারণত ৫-৬ বছর পর গাছ কেটে ফেলে নতুন চারা লাগানো হয়।

কাজ : “গোলাপ ও বেলি ফুলের চাষ করে বেকারত্ব দূর করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব”-এ বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীরা একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

ফলের চাষ

বাংলাদেশে নানা ধরনের ফল জন্মায়। এ দেশের মাটি ও আবহাওয়া ফল চাষের জন্য খুবই উপযুক্ত। আমরা কলা ও আনারস চাষ সম্পর্কে জানব।

কলা চাষ

কলা বাংলাদেশের সব জেলায়ই কম বেশি জন্মে। তবে নরসিংহী, মুঙ্গীগঞ্জ, বগুড়া, যশোর, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ এসব জেলায় কলার ব্যাপক চাষ হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে কলার চাষ হয় যা থেকে বছরে ছয় লক্ষাধিক টন কলা পাওয়া যায়। কলা ভিটামিন ও অনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। অন্যান্য ফসলের তুলনায় কলায় ক্যালরির পরিমাণও বেশি। বাংলাদেশের প্রায় সর্বজ্ঞই কলার চাষ হয়ে থাকে। কলা কঁচা অবস্থায় তরকারি হিসাবে এবং পোকা অবস্থায় ফল হিসাবে কলা খাওয়া হয়। রোগীর পথ্য হিসাবে কলার ব্যাপক চাহিনা রয়েছে।

কলার জাত

বাণিজ্যিকভাবে বাংলাদেশ যেসব কলার জাত চাষ করা হয় সেগুলো হচ্ছে অমৃতসাগর, সবরি, চাপা, মেহেরসাগর, করবী ইত্যাদি। এ ছাড়াও কলার আরও অনেক জাত আছে যেমন : এঁটে কলা, বাঙ্গলা কলা, জাহাজি কলা, কাঁচকলা বা আলজি কলা ইত্যাদি। তবে বারি কলা-১, বারিকলা-২ ও বারিকলা-৩ নামে তিনটি উন্নত জাত চাষের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে বারিকলা-২ জাতটি কাঁচকলার।

কলার উৎপাদন প্রযুক্তি : কলার উৎপাদন প্রযুক্তিগুলো হচ্ছে মাটি ও জমি তৈরি, রোপনের সময় ও চারা রোপণ, সার প্রয়োগ পদ্ধতি, অক্তবর্তীকালীন পরিচর্যা ইত্যাদি।

মাটি ও জমি তৈরি

উর্বর দোআশ মাটি কলা চাষের জন্য ভালো। জমিতে প্রচুর সূর্যের আলো পড়বে এবং পানি নিকাশের ব্যবস্থা থাকবে। গভীরভাবে জমি চাষ করে দুই মিটার দূরে দূরে ৫০ সেমি \times ৫০ সেমি \times ৫০ সেমি আকারের গর্ত খুড়তে হবে। চারা রোপনের প্রায় একমাস আগে গর্ত করে গর্তে গোবর ও টিএসপি সার মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত পূর্ণ করতে হবে।

চারা রোপণের সময়

বছরে তিন মৌসুমে কলার চাষ করা হয় বা কলার চারা রোপণ করা হয় যথা :

- ১। আশ্বিন-কার্তিক
- ২। মাঘ-ফালুন
- ৩। চৈত্র-বৈশাখ

কলার চারা নির্বাচন

কলার চারাকে তেউড় বলা হয়।

দুই রকমের তেউড় দেখা যায়। যথা :

- ১। অসি তেউড় (Sword Sucker)

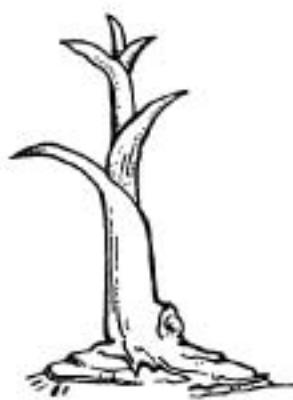
- ২। পানি তেউড় (Water Sucker)

১। অসি তেউড় : কলা চাষের জন্য অসি তেউড় উভয়। অসি তেউড়ের পাতা সরু, সুচালো এবং অনেকটা তলোয়ারের মতো। গোড়ার দিকে মোটা এবং ক্রমশ উপরের দিকে সরু হতে থাকে।

২। পানি তেউড় : পানি তেউড় দুর্বল। এর আগা-গোড়া সমান থাকে। কলা চাষের জন্য এই চারা উপযুক্ত নয়। এ দুই ধরনের চারা ছাড়াও সম্পূর্ণ মূলঝাহি বা তার ক্ষম্তি অংশ থেকেও কলা গাছের বংশবিস্তার সম্ভব। তবে এতে ফল আসতে কিছু বেশি সময় লাগে। ফলস্ত ও অফলস্ত দুইধরনের গাছেই মূলঝাহি চারা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।



চিত্র : কাসিমহ কলাগাছ



চিত্র : অসি চারা



চিত্র : পানি চারা



চিত্র : মূলঝাহি

চারা রোপণ

চারা রোপণের জন্য প্রথমত অসি তেউড় বা তলোয়ার তেউড় নির্বাচন করতে হবে। খাটো জাতের ৩৫-৪৫ সেমি আর লম্বা জাতের ৫০-৬০ সেমি দৈর্ঘ্যের তেউড় ব্যবহার করা হয়। অতঃপর নির্দিষ্ট গর্তে যাতে প্রয়োজনীয় গোবর ও টিএসপি সার দিয়ে পূর্ণ করা হয়েছে সেখানে চারা লাগাতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যেন চারার কাও মাটির ভিতরে না ঢুকে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

কলা গাছে ব্যবহৃত সারের নাম ও গাছ প্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো :

সারের নাম	গাছ প্রতি পরিমাণ	প্রয়োগ করার সময়
ইউরিয়া	৫০০-৬৫০ গ্রাম	চারা রোপণের ১ মাস পূর্বে গর্ত করে গোবর/ আবর্জনা সার ও ৫০% টি এস পি মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। রোপণের ২ মাস পর বাকি ৫০% টি এস পি, ৫০% এমওপি ও ২৫% ইউরিয়া গাছের গোড়ার চারদিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এর ২ মাস পর বাকি ৫০% এমওপি ও ৫০% ইউরিয়া এবং ফুল আসার সময় বাকি ৫০% ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	২৫০-৪০০ গ্রাম	
এমওপি	২৫০-৩০০ গ্রাম	
গোবর/আবর্জনা সার	১৫-২০ কেজি	

পরিচর্যা

সেচ ও নিকাশ

কলার জমিতে অর্দ্ধতা না থাকলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। শুক মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দেওয়া দরকার। বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি নিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় নালা কেটে দিতে হবে। কারণ কলাগাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

অতিরিক্ত চারা কাটা

ফুল বা মোচা আসার পূর্ব পর্যন্ত গাছের গোড়ায় যে তেউড় জন্মাবে তা কেটে ফেলতে হবে। মোচা আসার পর গাছপতি ১টি তেউড় রাখা ভালো।

খুঁটি দেওয়া

কলাগাছে ছড়া আসার পর বাতাসে গাছ ভেঙে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাঁশ বা গাছের ডাল দিয়ে খুঁটি বেঁধে দিতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

কলাগাছ ফল ও পাতার বিটল পোকা, রাইজম উইভিল, ত্রিপস এসব পোকা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। ডায়াজিন হো ইসি পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

রোগ ব্যবস্থাপনা

কলা ফল চাষের সময় প্রধানত তিনটি রোগের আক্রমণ দেখা যায়। যথা-

- ১। পানামা রোগ
- ২। সিগাটোগা
- ৩। কচু মাখা রোগ।

১। পানামা রোগ : এটি একটি ছাইকজনিত রোগ। এ রোগের আক্রমণে গাছের পাতা হলদে হয়ে যায়। পাতা বেঁটির কাছে ভেঙে ঝুলে যায় এবং কাণ্ড অনেক সময় ফেঁটে যায়। আক্রান্ত গাছ ধীরে ধীরে মরে যায় অথবা ফুল-ফল ধরে না। রোগের প্রতিকার হিসাবে রোগমুক্ত গাছ লাগাতে হবে, রোগক্রান্ত গাছ ঝুলে ফেলে দিতে হবে এবং প্রতিরোধী জাত রোপণ করতে হবে। এ ছাড়া টিন্ট-২৫০ ইসি ছাইকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় আক্রান্ত গাছে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যাবে।

২। সিগাটোগা : এটি একটি ছাইকজনিত রোগ। এ রোগের আক্রমণে পাতার উপর গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির গাঢ় বাদামি রঙের দাগ পড়ে। আক্রমণ ব্যাপক হলে পাতা ঝলদে যায় ও সমস্ত পাতা আঙ্গনে পোড়ার মতো দেখায়। ফল ছোট হয় এবং ফলন কম হয়। রোগের প্রতিকার হিসাবে আক্রান্ত গাছের পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৩। গুচ্ছ মাথা রোগ : এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। জাব পোকার মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। ম্যালার্থিয়ন বা অন্য ষে কোনো অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগে জাব পোকা দমন করে এ রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।



চিত্র : পানামা রোগক্রান্ত কলাগাছ



চিত্র : সিগাটোগা রোগক্রান্ত কলাগাছ



চিত্র : গুচ্ছ মাথা রোগক্রান্ত কলাগাছ

কাজ : শিক্ষার্থীরা কলার বিভিন্ন রোগের নাম, রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে।

ফলন সংগ্রহ

- ১। চারা রোপণের পর ১১-১৫ মাসের মধ্যে সব জাতের কলা সংগ্রহের উপযুক্ত হয়।
- ২। ধারালো দা দিয়ে কলার ছড়া কাটতে হবে।

ফলন

ভালোভাবে কলার চাষ করলে গাছপ্রতি প্রায় ২০ কেজি বা প্রতি হেক্টেরে প্রায় ২০-৪০ টন কলা উৎপাদিত হবে।

আনারস চাষ

বাংলাদেশে প্রায় ১৪ হাজার হেক্টর জমিতে আনারস চাষ করা হয়। সিলেট, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং টাঙ্গাইলের মধ্যপুরে ব্যাপক আনারসের চাষ হয়। ঢাকা, নরসিংহনী, কুমিল্লা, দিনাজপুর জেলাতেও প্রচুর আনারস জন্মে। তবে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবার (জুস, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি) তৈরির কাজে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে পৃথিবীর সর্বজাতি আনারসের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বাণিজ্যিক ফল হিসাবেও আন্তর্জাতিক বাজারে আনারস একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। বর্তমানে বাংলাদেশে এটি একটি অর্থকরী ফসল। আনারস রঞ্জনিপণ্য হিসাবে আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ অবদান রাখছে।

আনারসের জাত : বাংলাদেশে আনারসের তিনটি জাত দেখা যায়। স্থান : হানিকুইন, জায়েথ কিউ ও ঘোড়াশাল।

আনারসের উৎপাদন প্রযুক্তি : আনারসের প্রযুক্তিগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

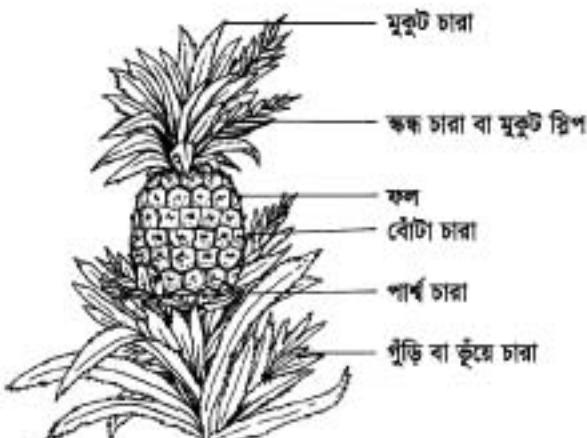
মাটি ও জমি তৈরি

দোআশ বা বেলে দোআশ মাটি আনারস উৎপাদনের জন্য ভালো। জমি চাষ ও মই এমনভাবে দিতে হবে যাতে মাটি ঝুরঝুরা ও সমতল হয় এবং জমিতে বৃক্ষের পানি জমে না থাকে। চারা রোপণের জন্য চাষকৃত জমিতে ১৫ সেমি উচ্চ এবং ১ মিটার প্রশস্ত বেড তৈরি করতে হবে। এক বেড থেকে আর এক বেডের দূরত্ব হবে ৫০-১০০ সেমি। পাহাড়ের ঢালে আনারস চাষ করার জন্য এমন জমি নির্বাচন করতে হবে যা বেশি খাড়া নয়। পাহাড়ের ঢালু জমি কোনোভাবেই চাষ বা কোদাল দিয়ে মাটি আলগা করা যাবে না, শধু আগাছা ভালোভাবে পরিষ্কার করে চারা রোপণের উপযোগী করতে হবে।

চারা নির্বাচন ও তৈরি

আনারস গাছের বশবিস্তার অঙ্গ পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে। আনারস গাছে সাধারণত চার ধরনের চারা উৎপন্ন হয় যাদেরকে সাকার বা তেউড় বলা হয়। সাকার বা তেউড়ের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

- ফলের মাথায় দুই ধরনের চারা উৎপন্ন হয়। ফলের মাথায় সোজাভাবে যে চারাটি উৎপন্ন হয় তাকে মুকুট চারা বলে। আর মুকুট চারার গোড়া থেকে যে চারা বের হয় তাকে ক্ষক চারা বা মুকুট স্ট্রিপ বলে।
- ফলের গোড়া বা বৈঠার উপর থেকে যে চারা বের হয় তাকে বৈঠা চারা বলে।
- বৈঠার নিচের কিন্তু মাটির উপরে কাণ থেকে যে চারা বের হয় তাকে পার্শ্চচারা বা কাণের কেকড়ি বলে।
- গাছের গোড়া থেকে মাটি ভেদ করে যে চারা বের হয় তাকে গোড়ার কেকড়ি বা ভুঁয়ে চারা বলে। আনারস চাষের জন্য ভুঁয়ে চারা ও পার্শ্চচারা সবচেয়ে ভালো।



চিত্র : আনারসের বিভিন্ন ধরনের চারা

চারা রোগণ

মধ্য আর্থিন হতে মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত এই এক মাস আনারসের চারা রোগণের সঠিক সময়। সেচের ব্যবস্থা থাকলে চারা রোগণের সময় আরও এক / দেড় মাস পিছানো যায়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩০-৪০ সেমি বজায় রেখে চারা রোগণ করতে হবে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : ১। সার প্রয়োগ পদ্ধতির প্রথম কাজ হলো পরিমাণ নির্ধারণ। আনারসের জন্য গাছ প্রতি নিম্নোক্তভাবে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	গাছ প্রতি সারের পরিমাণ (গ্রাম)
পচা গোবর	২৯০-৩১০
ইউরিয়া	৩০-৩৬
টিএসপি	১০-১৫
এমওপি	২৫-৩৫
জিপসাম	১০-১৫

২। (ক) গোবর, টিএসপি ও জিপসাম বেড তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

(খ) ইউরিয়া ও এমওপি (পটাশ) চারার বয়স ৪-৫ মাস হলে ৫ কিলিটে প্রয়োগ করতে হবে। সার ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শুক হৌসুমে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি নিকাশের জন্য নালা কেটে দিতে হবে। চারা অতি লব্ধ হলে ৩০ সেমি রেখে আগার পাতা সমান করে কেটে দিতে হবে। আনারসের জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। আনারস ফসলে তেমন কোনো ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগ সহজে আক্রমণ করে না। তাই বালাই ব্যবস্থাপনা আলোচনা করা হলো না।

ফল সংরক্ষণ

চারার বয়স ১৫/১৬ মাস হলে মাঘ মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত সময়ে আনারসের ফুল আসা তরু করে। জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত সময়ে আনারস পাকে। গাছ থেকে আনারসের বেঁটা কেটে সংরক্ষণ করতে হবে।

ফলন

প্রতি হেক্টেরে হানিকুইন ২০-২৫ টন এবং জায়েট কিউ গ্রাম ফলন দিয়ে থাকে।

কাজ :	শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের নিকটস্থ একটি ফলের বাগানে বিভিন্ন ধরনের ফল গাছ পরিদর্শন শেষে আনারস চাষ পদ্ধতির ধাপগুলো দলীয়ভাবে পোস্টারে লিখে প্রেসিটে উপস্থাপন করবে।
--------------	--

চতুর্থ পরিচ্ছন্দ

মাছ চাষ পদ্ধতি

আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক জলাশয় যেমন- খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, ডোবা-নালায় শিং, মাঞ্চর, পাবদা ও টেঁরো মাছ এক সময় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এরা অঁশবিহীন ক্যাটফিশ জাতীয় মাছ। সিলুরিফরমিস বর্গের অন্তর্ভুক্ত মাছ ঘাদের শরীরে অঁশ নেই এবং মুখে বিড়ালের ন্যায় লম্বা গৌফ বা পাঁড় আছে তাদেরকে ক্যাটফিশ বলে। প্রাকৃতিক জলজ পরিবেশ বিপর্যয় ও অত্যাধিক আহরণের কারণে বর্তমানে এসব মাছের প্রাপ্যতা অনেক কমে গেছে। চাষের মাধ্যমে এদের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। শিং ও মাঞ্চর মাছের চাষ পদ্ধতি প্রায় একই রকম। আবার টেঁরো ও পাবদার চাষ পদ্ধতিতেও যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের দেশে কয়েক ধরনের টেঁরো মাছ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে গুলশা টেঁরোর পোনা উৎপাদন ও চাষ পদ্ধতি উল্লিখিত হয়েছে। নিচে শিং, মাঞ্চর, পাবদা ও গুলশা টেঁরোর চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

ক) শিং ও মাঞ্চর মাছ চাষ পদ্ধতি

শিং ও মাঞ্চর মাছের পরিচিতি

শিং ও মাঞ্চর মাছের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছুটা মিল রয়েছে। এদের দেহ লম্বাটে, সামনের দিক নলাকার, পিছনের দিক চ্যাপ্টা ও অঁশ বিহীন এবং মাথার উপর নিচ চ্যাপ্টা। মুখে চার জোড়া পাঁড় ও মাথার দুই পাশে দুইটি কঁটা আছে। কিন্তু শিং মাঞ্চর মাছের চেয়ে আকারে ছোট হয় এবং মাথা তুলনামূলক সরু হয়। শিং মাছের পার্শ্বিয় কাটা দুইটি বিষাঙ্গ হয়। এজন্য শিং মাছের কঁটা খেলে আক্রান্ত হ্রানে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব হয়। শিং মাছের দেহের রং ছোট অবস্থায় বাদামি লাল এবং বড় অবস্থায় ধূসর কালচে। অন্যদিকে মাঞ্চরের দেহের রং ছোট অবস্থায় বাদামি খয়েরি ও বড় হলে ধূসর বাদামি হয়। শিং ও মাঞ্চর মাছের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফুলকা ছাড়াও এদের অতিরিক্ত শ্বসনতন্ত্র আছে যার মাধ্যমে এরা বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন নিতে পারে। ফলে এরা অল্প অক্সিজেন যুক্ত পানিতে বা পানি ছাড়াও নীরঙ্কণ বেঁচে থাকতে পারে। এজন্য শিং ও মাঞ্চর মাছকে জিগল মাছ বলা হয়। শিং ও মাঞ্চর মাছ সর্বত্তুক জাতীয় মাছ। এরা জলাশয়ের তলদেশে থাকে এবং সেখানকার বিভিন্ন স্ফুর স্ফুর প্রাণী ও পচা জৈব আবর্জনা থায়। এরা বছরে ১ বার প্রজনন করে থাকে। এদের প্রজনন কাল হচ্ছে মে থেকে সেপ্টেম্বর। তবে জুন-জুলাই মাসে এদের সর্বোচ্চ প্রজনন হয়ে থাকে।



চিত্র: শিং মাছ



চিত্র: মাঞ্চর মাছ

শিৎ ও মাত্রের চাষের সুবিধা

বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে তাই এ মাছ চাষে অধিক মূলাফা লাভ করা যায়। চাষ পক্ষতি সহজ। যে কোনো ধরনের জলাশয়ে এমনকি টৌবাচ্চা ও বাঁচাতেও চাষ করা যায়। প্রতিকূল পরিবেশে যেমন-অঙ্গীজেন স্বষ্টতা, পানির অত্যাধিক তাপমাত্রা, এমনকি পচা পানিতেও এরা বেঁচে থাকে। অল্প পানিতে ও অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়। রোগবালাই খুব কম হয় ও অধিক সহনশীল। অল্প পানিতে এমনকি পানি ছাড়াও এরা দীর্ঘকণ বেঁচে থাকে বলে জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায়। সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে অল্প সময়েই (৬-৮ মাস) বাজারজাত করার উপযোগী হয়। একক মাছ চাষ ছাড়াও অন্যান্য কার্প মাছ, তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছের সাথে পুরুরে মিশ্র চাষ করা যায়।

শিৎ ও মাত্রের মাছের পুষ্টিগত গুরুত্ব

বড় অনেক প্রজাতির তুলনায় শিৎ ও মাত্রের মাছের পুষ্টিগত অনেক বেশি। এসব মাছে শরীরের উপযোগী লোহ অধিক পরিমাণে আছে। এসব মাছে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি ও তেল কম থাকে। এজন্য সহজে হজম হয়। অসুস্থ ও রোগ মুক্তির পর স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতির জন্য পথ্য হিসাবে এসব মাছ সমাদৃত। শিৎ ও মাত্রের মাছ রক্ত স্বষ্টতা রোধে ও বল বর্ধনে সহায়তা করে।

চাষের জন্য পুরুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি

শিৎ ও মাত্রের মাছ চাষের জন্য পুরুর ১-১.৫ মিটার গভীর হওয়া দরকার। পুরুরের আয়তন ১০ শতক থেকে ৩০ শতক হলে ভালো হয়। চাষের জন্য নির্বাচিত পুরুরটির পাড় ভাঙ্গা থাকলে তা মেরামত করতে হবে। পুরুরে কচুরিপানা সহ অন্যান্য জলজ আগাছা থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। পাড়ে বড় গাছপালা থাকা উচিত নয়। পুরুরে রাঙ্কুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। পুরুর শক্তিয়ে, বার বার জাল টেনে বা পুরুরের পানিতে রোটেন প্রয়োগ করে তা করা যায়। শীতকালে ষাখা পুরুরের পানি অনেক কমে যায় তখন পুরুর শক্তিয়ে ফেলে পুরুর প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করলে ভালো হয়। পুরুর শক্তান্বিত হলে তলায় চুন, গোবর বা হাঁসমুরগির বিষ্টা, ইউরিয়া, টিএসপি সার প্রতিশতকে নির্ধারিত হারে ষাখাযথ নিয়মে প্রয়োগ করতে হবে। পুরুরে যদি পানি থাকে তাহলে পানিতেই চুন ও সার প্রয়োগ করতে হবে।

নেটের বেষ্টনী/বেঢ়া নির্মাণ

শিৎ ও মাত্রের মাছ চাষে পুরুর প্রস্তুতির সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পুরুরের চারদিকে পাড়ের উপর অন্তর্ভুক্ত ৩০ সেমি উচ্চ করে নেটের বেষ্টনী বা বেঢ়া নির্মাণ করা। বেষ্টনী দেওয়ার সুবিধা হচ্ছে এতে করে বৃষ্টির সময় মাছ পুরুরের বাহিরে চলে যেতে পারে না। বিশেষত মাত্রের মাছকে সামান্য বৃষ্টি বা বন্যা হলে প্রায়ই “হেঁটে” (গড়িয়ে) পুরুর থেকে বাহিরে যেতে দেখা যায়। অন্যদিকে বেষ্টনী দেওয়ার ফলে মাছের শরু যেমন-সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি পুরুরে প্রবেশ করতে পারে না। নাইলনের নেট খুটির সাথে বেঁধে পাড়ের চারদিকে ঘিরে দিতে হবে। নেটের নিচের দিক মাটির ভিতর কিছুটা দুকিয়ে আটকে দিতে হবে যেন মাটি ও নেটের মাঝে ফাঁক না থাকে। পুরুর শক্তান্বিত হলে শক্তান্বিত পর পরই এ কাজ করতে হবে। কারণ শক্তান্বিত পর পর পুরুরে কোনো ক্ষতিকর প্রাণী যেমন-ব্যাঙ, সাপ থাকে না। পানি থাকা অবস্থায় পুরুরে এসব প্রাণী থাকে বিধায় তখন বেষ্টনী দিলে এরাও পুরুরে আটকা পড়ে যায়। সেক্ষেত্রে ভিতরে সেগুলোকে মারার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন- কোচ দিয়ে বা বিষ টোপ দিয়ে।



চিত্র: মানুর মাছের পুরুরে নেটের বেঁটনী

পোনা মজুদ

পুরুর প্রস্তুতির ৫-৭ দিন পর পুরুরে প্রতি শতাংশে ১৫০-২০০ টি মানুর মাছের পোনা মজুদ করতে হবে। শিখ মাছ যেহেতু আকারে ছোট তাই এ মাছ কিছু বেশি যেমন- ৩০০-৪০০টি পর্যন্ত মজুদ করা যেতে পারে। শতকে ৩-৪টি সিলভার কার্পের পোনা ছাড়া যেতে পারে যা পুরুরে উৎপাদিত অতিরিক্ত ফাইটোপ্লাকটন থেকে পরিবেশ ভালো রাখবে। পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা ধাকলে শতকে মানুরের পোনা ২৫০-৩০০টি এবং শিখ মাছের পোনা ৪০০-৫০০টি মজুদ করা যাবে। কার্প বা ঝুই জাতীয় মাছের সাথে শিখ/মানুর এর মিশ্রচাষ করতে চাইলে শতকে শিখ/মানুর এর পোনা ৫০টি এবং ঝুই জাতীয় মাছের পোনা ৪০টি মজুদ করা যায়। পোনা ছাড়ার আদর্শ সময় হচ্ছে সকাল বা বিকাল (ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়)। দুপুরে রোদে বা মেছলা দিনে পোনা মজুদ করা উচিত নয়। পুরুরে পোনা ছাড়ার পূর্বে পটাশ বা লবণ পানিতে পোনা শোধন ও পুরুরের পানিতে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এ সম্পর্কে কৃষি উপকরণ অধ্যায়ে ২য় পরিচ্ছেদে আমরা বিস্তারিত জেনেছি।

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

১. খাদ্য ব্যবস্থাপনা

মানুর ও শিখ মাছ চাষে মাছকে সম্পূরক খাবার সরবরাহ করতে হবে। নিচে মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন খাদ্য উপাদান ও এগুলোর মিশ্রণের হার দেওয়া হলো-

শিখ ও মানুরের সম্পূরক খাদ্য তৈরির উপাদান ও মিশ্রণ হার

খাদ্য উপাদান	নমুনা মিশ্রণ হার (%)
ফিশমিল	২০
মূরগির নাড়ি ঝুঁড়ি ও হাড় চূর্ণ (মিট ও বোন মিল)	
সরিখার বৈঞ্চ	২০
চালের কুঁড়া	৩০
গমের কুসি	১২
আটা/ চিটাগড়	৫
ভিটামিন ও বনিজ মিশ্রণ	১ গ্রাম/কেজি
সমাবিন চূর্ণ	৮
ভূঁটা চূর্ণ	৫

শিৎ/মাত্র মাছের দৈহিক ওজনের সাথে খাদ্য প্রয়োগের মাঝা নিচে দেওয়া হলো-

মাছের গড় ওজন (গ্রাম)	দৈহিক খাদ্যের পরিমাণ (%)
১-৩	১৫-২০
৪-১০	১২-১৫
১১-৫০	৮-১০
৫১-১০০	৫-৭
> ১০০	৩-৫

খাবার প্রয়োগ পদ্ধতি: প্রতিদিনের খাবার ২ ভাগ করে দিনে ২ বার (সকাল ও বিকালে) দিতে হবে। খাবার অল্প পানিতে মিশিয়ে ছেট ছেট বল করে পুরুরের নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে পানির নিচে স্থাপিত ট্রেতে দেওয়া যাবে। খাদ্য প্রস্তরের ২৪ ঘণ্টা পূর্বেই সরিষার বৈল পানিতে ডিজিয়ে রাখতে হবে। বাজার থেকে কেনা বাণিজ্যিক খাবারও মাছকে প্রদান করা যায়। এতে তৈরিকৃত খাদ্যের চেয়ে নাম কিছুটা বেশি পড়তে পারে।

২. ব্যবস্থাপনা

চাষকালীন মাছ নিয়মিত বাড়ছে কিনা এবং মাছ রোগান্ত হচ্ছে কিনা জাল টেনে মাঝে মাঝে তা পরীক্ষা করতে হবে। শিৎ ও মাত্র মাছে সাধারণত কোনো রোগ হয় না। তবে মাঝে মাঝে শীতকালে ক্ষত রোগ, লেজ ও পাখনা পচা রোগ এবং পেট ফোলা রোগ দেখা যায়। নিচে এদের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দেওয়া হলো:

ক্ষত রোগ: মূলতঃ এ্যাফানোমাইসিস ইনভাইল নামক একধরনের ছত্রাকের আক্রমণ এ রোগ হয়। এতে মাছপেশিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। পুরুরে ১-১.৫ মিটার পানির গভীরতায় শতকে ১ কেজি হারে চুন ও ১ কেজি লবণ প্রয়োগ করলে আক্রান্ত মাছগুলো ২ সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে। আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে শীতের শুরুতে একই হারে পুরুরে চুন ও লবণ প্রয়োগ করলে শীতকালে এ রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

লেজ বা পাখনা পচা রোগ: এ্যারোমোলাইস ও মিক্রোব্যাকটের জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়। প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট মিশ্রিত করে আক্রান্ত মাছকে ৩-৫ মিনিট গোসল করতে হবে। পুরুরে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। প্রতি শতক পুরুরে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পেট ফোলা রোগ: এটি একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। এ রোগ হলে মাছের পেট ফুলে যায়। মাছ ভারসাম্যহীন ভাবে চলাচল করে ও পরিশেষে মৃত্যু ঘটে। আক্রান্ত মাছের পেট হতে খালি সিরিজ দিয়ে পানি বের করে নিতে হবে। প্রতি কেজি খাবারের সাথে ২০০ মি গ্রাম ক্লোরামফেনিকল পাউডার মিশিয়ে সরবরাহ করতে হবে। আক্রান্ত পুরুরে প্রতি শতকে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যায়।

মাছ আহরণ

সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে ৭-১০ মাসে শিৎ ও মাত্র মাছ বাজারজাতকরণের উপযোগী হয়। উক্ত সময়ে শিৎ মাছ গড়ে ১০০-১২৫ গ্রাম ও মাত্র মাছ ১২০-১৪০ গ্রাম হয়ে থাকে। পুরুরে জাল টেনে বেশির ভাগ মাছ ধরতে হবে। সম্পূর্ণ মাছ আহরণ করতে হলে পুরুর শকিয়ে ফেলতে হবে।

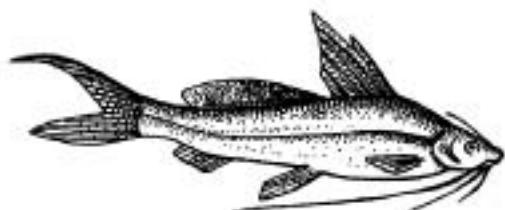
কাজ : শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে এক একটি পুরুরে শিখান্তর চাষের সম্ভাব্য উৎপাদন ও আয়ব্যয়ের হিসাব বিশ্লেষণের মাধ্যমে খাতায় লিখে জমা দিবে।

খ) পাবদা ও গুলশা মাছের চাষ পদ্ধতি

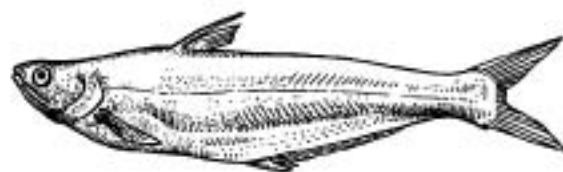
পাবদা ও গুলশা মাছের পরিচিতি

বিল, হাওর, নদী, পুরুর এবং দিঘিতে পাবদা ও গুলশা মাছ পাওয়া যায়। পাবদা ও গুলশা মাছ খেতে অত্যন্ত সুস্থানু। এ কারণে এদের চাহিদা ও বাজার মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি। পাবদা মাছ ১৫-৩০ সেমি লম্বা হয়ে থাকে। দেহ চ্যাপ্টা ও সামনের দিকের চেয়ে পেছনের দিক অন্ধাগত সরু। এ মাছের মুখ বেশ বড় ও বীকানো। নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালের চেয়ে বড় মুখের সামনের দিকে দুইজোড়া লম্বা গৌফ আছে। পৃষ্ঠ পাখনা ছোট। পায় পাখনা বেশ লম্বা ও লেজ দুই ভাগে বিভক্ত। দেহের রং সাধারণত উপরিভাগে ধূসর রূপালি ও পেটের দিক সাদা। ঘাড়ের কাছে কানকোর পিছনে কালো কোঁটা আছে। শিরদীঢ়া রেখার উপরিভাগে হলুদাভ ডোরা দেখতে পাওয়া যায়। পাবদা মাছ মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত প্রজনন করে থাকে। জুন-জুলাই মাসে সর্বোচ্চ প্রজনন সম্পর্ক হয়।

গুলশা মাছের দৈর্ঘ্য ১৫-২০ সেমি হয়ে থাকে। মাছের দেহ পার্শ্বীয় ভাবে চাপা। পিঠের অংশ বীকানো। মুখ বেশ ছোট, উপরের চোয়াল সামান্য বড়। মুখে ৪ জোড়া গৌফ বা পঁড় আছে। পৃষ্ঠ ও কানকো পাখনা লম্বা কোঁটা যুক্ত। শরীরের রং জলপাই ধূসর, নিচের দিক কিছুটা হার্কা। শিরদীঢ়া রেখা বরাবর নীলাভ ডোরা দেখা যায়। এরা বছরে একবার ডিম দেয়। গুলশা মাছের প্রজননকাল জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। জুলাই-আগস্ট মাসে সর্বোচ্চ প্রজনন করে থাকে।



চিত্র : গুলশা



চিত্র : পাবদা

পাবদা ও গুলশা মাছ চাষের ক্রুতি

১. বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে এবং মূল্য অন্যান্য মাছের তুলনায় বেশি। তাই এদের চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি সম্ভব।
২. এদের দেহে প্রচুর পরিমাণে আমিষ ও মাইক্রোনিউট্রিট বিদ্যমান থাকে।
৩. খেতে খুবই সুস্থানু।
৪. চাষ পদ্ধতি সহজ।
৫. কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করা যায়। ফলে সহজে পোনা পাওয়া সম্ভব।
৬. বার্ষিক পুরুর ছাড়াও মৌসুমি পুরুর ও অন্যান্য অগভীর জলাশয়েও চাষ করা যায়।
৭. দ্রুত বৰ্ধনশীল ৫-৬ মাসেই বিপণনযোগ্য হয়।

চাষের জন্য পুকুর নির্বাচন

সাধারণত ১৫-২০ শতাংশের পুকুর যেখানে ৭-৮ মাস পানি থাকে এমন পুকুরে এ মাছ দুইবার চাষ করা যায়। পুকুরে পানির গভীরতা ১-১.৫ মিটার হলে ভালো।

পুকুর প্রস্তুতি

পুকুরের পাড় মেরামত ও জলজ আগাহা পরিষ্কার করে দিতে হবে। পাড়ে বড় গাছপালা থাকা উচিত নয়। থাকলে তা ছেটে দিতে হবে যেন পুকুরে পাতা ও ছায়া না পড়ে। পুকুরে রাঙ্কুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ থাকলে তা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর পুকুরে শতাংশপ্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরে প্রতি শতাংশে ৬-৮ কেজি হারে গোবর, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে।

পোনা মজুদ

সার প্রয়োগের ৩-৪ দিন পর ৩-৫ গ্রাম গজনের পোনা শতক প্রতি ২৫০ টি হারে মজুদ করা যেতে পারে। সকালে বা বিকালে বা দিনের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পুকুরে পোনা ছাড়া উচিত। পোনা আনার সাথে সাথে সেঙ্গলে সরাসরি পুকুরে ছাড়া উচিত নয়। পোনা ছাড়ার পূর্বে পটাশ বা লবণ পানিতে শোধন করে নিতে হবে এবং পোনাকে পুকুরের পানির সাথে খাপ থাইয়ে নিতে হবে।

কাজ : দলগতভাবে পাবনা ও গুলশা মাছ চাষের আয়-ব্যয়ের একটি হিসাব তৈরি কর ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

খাদ্য প্রয়োগ

পাবনা ও গুলশা মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরির উপাদান ও মিশ্রণ হার:

খাদ্য উপাদান	মিশ্রণ হার (%)	খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি
ফিশমিল	৩০	২-৩ টি দ্রুবস্ত ট্রেতে করে প্রতিদিন দেহ গজনের শতকরা ৫-৬ ভাগ হারে দৈনিক ২ বার (সকালে ও বিকালে) প্রয়োগ করতে হবে।
মিট ও বোন মিল	১০	
সরিধার খৈল	১৫	
সয়াবিন খৈল	২০	
চালের কুঁড়া	২০	
আটা	৮	
ভিটামিন ও খনিজ লবণ মিশ্রণ	১	

সার প্রয়োগ

সম্পূরক খাদ্যের পাশাপাশি প্রাকৃতিক খাবার তৈরি হওয়ার জন্য ৭-১৫ দিন পর প্রতক্রিয়া ৪-৫ কেজি হারে পচা গোবর, বৌদ্ধোজ্জ্বল দিনে গুলিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

ব্যবহারপনা

মাছ নিরাহিত খাবার থাই কিনা তা লক্ষ রাখতে হবে। ট্রেতে খাবার দেওয়ার আগে পূর্ববর্তী দিনের খাবার সম্পূর্ণ খেয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যে পরিমাণ খাদ্য থেকে থাবে তার সমপরিমাণ খাদ্য কম সরবরাহ করতে হবে। প্রতি মাসে ২ বার জাল টেমন দৈরিক বৃক্ষি পর্যবেক্ষণ করে খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। সঙ্গাহে একবার পুরুরে হররা টানতে হবে। পুরুরে পানি কমে গেলে বাইরে থেকে পানি সরবরাহ করতে হবে। পানির স্বচ্ছতা (সেক্সিডিক্স গভীরতা) ২৫ সেমি মধ্যে থাকলে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।

মাছ আহরণ

গুলশা মাছ ৬ মাসে ৪০-৪৫ প্রাম এবং পাবদা মাছ ৭-৮ মাসের মধ্যে ৩০-৩৫ প্রাম উজ্জনের হয়ে থাকে। এই আকারের পাবদা মাছ বেড়ে জাল দিয়ে ও গুলশা মাছ পুরুর তকিয়ে আহরণ করা যায়।

নতুন শব্দ : জিওল মাছ, এ্যাফনোমাইসিস ইনভার্স, মাইক্রোনিউট্রেন্ট

মাছ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

আমাদের পৃষ্ঠির চাহিদা পূরণ, কাজের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং সামাজিক উন্নয়নে মাছ চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে মাছ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করা হলো।

১. পৃষ্ঠির চাহিদা পূরণ : আমাদের প্রতিদিনের খাবার তালিকায় আমিষের প্রধান উৎস হচ্ছে মাছ। এটি একটি সুস্থান ও পৃষ্ঠিকর খাবার। আম দের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রায় ৬০% আমিষের যোগান দেয় মাছ। একজন পূর্ববর্ক লোকের দৈনিক ৮০ প্রাম আমিষ জাতীয় খাবারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বর্তমানে আমরা পড়ে মাত্র ৬০ প্রাম আমিষ খেয়ে থাকি। মাছ চাষের মাধ্যমে আমিষের চাহিদা ঘটানো সম্ভব। তাই মাছ চাষ শুরুই গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া মাছের তেল দেহের জন্য উপকারী। বিভিন্ন জাতের ছোট মাছ ঘেমন- মলা, ঢেলা, কাচকি মাছে প্রচুর ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যয়। ভিটামিন ‘এ’ রাতকানা রোগ দূর করে। মাছের কাঁটায় প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পাওয়া যায় যা দেহের হাত গঠনে সাহায্য করে।

২. কাজের সুযোগ সৃষ্টি : বাংলাদেশে মোট জলগোষ্ঠীর প্রায় ১১% বা অধিক প্রায় ১৬৫ লক্ষ লোক মৎস্য সেচ্চের থেকে বিভিন্ন ভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। ঘেমন- মাছ চাষ, মাছ ধরা, বিক্রয় ইত্যাদি। জনসংখ্যা বৃক্ষির ফলে আমাদের দেশে কাজের সুযোগ কমে যাচ্ছে। মাছ চাষের মাধ্যমে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

৩. রপ্তানি আয় বৃক্ষি : মাছ বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। দেশে রপ্তানি আয়ের ২.৪৬% আসে মৎস্য খাত হতে। মাছ চাষ বৃক্ষি করে এ আয় আরও বাঢ়ানো সম্ভব।

৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : বাংলাদেশে অনেক পতিত পুরুর, ডোবা ও নালা রয়েছে যেখানে মাছ চাষ করা হয় না। এসব জলাশয়ে মাছ চাষ করে আমের গরিব ও বন্ধু আয়ের লোকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমন্বিত মাছ চাষ পদ্ধতি

সমন্বিত চাষের ধারণা

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের আমের প্রায় বাড়িতেই ইঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন করা হয়। আবার সে সাথে অনেকের বাড়িতে রয়েছে পুকুর যেটি ধোয়ামোছা, রান্নাবান্না, গোসল ইত্যাদি গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত হয়। সন্তান পদ্ধতিতে এই সব পুকুরে মাছও লালন করা হয়। এসব ইঁস-মুরগি, মাছ পরিবারের আদের চাইদা মেটাতে ভূমিকা রাখে। পুকুরের উপর ঘর করে যদি ইঁস-মুরগি রাখা যায় তবে এদের জন্য অতিরিক্ত জায়গার দরকার হয় না। আবার গরুর গোবর ও ইঁস-মুরগির বিষ্ঠা পুকুরে সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সেইসাথে ইঁস-মুরগির উচ্চিষ্ট খাদ্য পুকুরে ফেলে দিলে তা মাছের সম্পূরক খাদ্যের হোগান দেয়। অব্যবহৃত পুকুরের পাড়ে ফল-মূল এবং শাকসবজির চাষও করা যায় যেখানে পুকুরের তলার অতিরিক্ত কাদা (পচা জৈব পদার্থ সমূক) সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। অন্যদিকে ফলমূল ও শাকসবজির বরাপাতা কমপ্লেক্স সার হিসাবে পুকুরে ব্যবহার করা হয়। আবার কৃষকের ধানের জমিতে যে কয়েকমাস পানি থাকে সে সময়ে ধানের পাশাপাশি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে মাছের বিষ্ঠা ক্ষেত্রের উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে। এই মাছ ধানের কঠিকারক পোকামাকড় থেঁথে ফেলে এবং মাছের চলাচল জমিতে আগাছ জন্মাতে বাধা দেয়। এভাবে যখন একই জমিতে একই সময়ে একাধিক ফসল উৎপাদন করা হয় তাকে সমন্বিত চাষ বলে। সমন্বিত চাষে যখন মাছের সাথে অন্য ফসলের চাষ করা হয় তখন তাকে সমন্বিত মাছ চাষ বলে।

সমন্বিত চাষের উন্নতি

একই জমিতে একই সময়ে অল্প খরচে একাধিক ফসল পাওয়া যায়। ফলে বাড়তি খাদ্য উৎপাদিত হয়। একই ফসল অপর ফসলের সহায়ক হিসাবে কাজ করে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। সার ব্যবহারের খরচ কমে। শ্রমের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয় (একটি ফসলের জন্য যে শ্রম প্রয়োজন, সেই একই শ্রমে একাধিক ফসল উৎপাদিত হয়)। সমস্লের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয় ও অপচয় রোধ হয়। ঝুঁকি কম থাকে অর্থাৎ কোনো কারণে একটি ফসলের উৎপাদন ব্যাহৃত হলে অন্য উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে সে ক্ষতি অনেকটা পুর্যিয়ে নেওয়া যায়।

নিচে আমরা দুইটি উন্নতপূর্ণ সমন্বিত মাছ চাষ পদ্ধতি (সমন্বিত মাছ-ইঁস/মুরগি চাষ এবং ধানক্ষেতে মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষ) সম্পর্কে জানব।

ক) সমন্বিত মাছ ও ইঁস/মুরগি চাষ

মাছ ও ইঁস মুরগির সমন্বিত চাষের সূবিধা

১. পুকুরের উপর ইঁস/মুরগির ঘর তৈরি করা হয় বলে আলাদা জায়গায় প্রয়োজন হয় না। ২. ইঁস/মুরগির বিষ্ঠা সরাসরি পুকুরে পড়ে যা মাছ চাষের জন্য উৎকৃষ্ট জৈব সার, এই পদ্ধতিতে পুকুরে বাইরে থেকে কোনো সার দেওয়ার দরকার নেই। ৩. ইঁস/মুরগির উচ্চিষ্ট খাদ্য সরাসরি পুকুরে পড়ে যা মাছ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে ফলে মাছের জন্য আলাদা কোনো সম্পূরক খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ৪. ইঁস পুকুরের পোকামাকড় ও ব্যাঙাটি থেঁথে পুকুরের পরিবেশ ভালো রাখে। ৫. ইঁস পুকুরের পানিতে সীতার কাটে বলে বাতাস থেকে অঙ্গীজেন পানিতে যেশে ফলে পানিতে অঙ্গীজেনের সমস্যা হয় না। ৬. একই জায়গা থেকে মাছ, ইঁস ও ডিম পাওয়া যায় ফলে অধিক খাদ্য উৎপাদন ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।



চিত্র : সমর্থিত মাছ ও হাঁস চাষ



চিত্র : সমর্থিত মাছ ও মূরগি চাষ

পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি : পুর ছোট আকারের পুকুর সমর্থিত মাছ ও হাঁস/মূরগি চাষের জন্য তেমন উপযোগী নয়। পুকুরের আয়তন ন্যূনতম ৩০ শতক হলে ভালো হয়। বছরে কমপক্ষে ৮-১০ মাস ১.২ থেকে ১.৮ মিটার (৪-৬ ফুট) পানি থাকে এমন পুকুর নির্বাচন করাতে হবে। এরপর যথাযথ নিয়মে মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুত করে নিতে হবে। তবে সমর্থিত হাঁস-মূরগি ও মাছ চাষে পুকুর প্রস্তুতিকালীন সময়ে সার প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। চুন দেওয়ার ৭ দিন পর পুকুরের উপর বালানো ঘরে হাঁস/মূরগির বাচ্চা মজুদ করাতে হবে। হাঁস/মূরগির বাচ্চা মজুদের ৭-১০ দিন পর পুকুরে মাছের পোনা ছাড়তে হবে।

হাঁস-মূরগির ঘর নির্মাণ : ঘরচ কমানোর জন্য স্থানীয়ভাবে প্রাক্ত বাঁশ, কাঠ ও ছন দিয়ে এক চালা বা দো-চালা ঘর তৈরি করা যায়। ঘরটি পাঢ় থেকে ১.২ থেকে ১.৫ মিটার (৪-৫ ফুট) ভিতরে পানির উপর হবে যেন তকনো মৌসুমে পানি কমে গেলেও বিষ্ঠা ও উচ্চিষ্ঠ খাদ্য মাটিতে না পড়ে পানিতে পড়ে। পানির উপরিভাগ থেকে ঘরের মেঝের দূরত্ব ০.৪৬-০.৬ মিটার (১.৫-২ফুট) এবং মেঝে থেকে ঘরের চালার উচ্চতা হবে ১.২-১.৫ মিটার (৪-৫ ফুট)। ঘরের ভিতরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের জন্য চালা ও ঘরের বেঢ়ার মাঝের জালের মতো বেঢ়া বা জাল দিয়ে ঘরে দিতে হবে। ঘরের মেঝে বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। এক বাতা থেকে অন্য বাতার দূরত্ব হবে ১ সেমি। এতে করে মূরগির বিষ্ঠা ও উচ্চিষ্ঠ সরাসরি পড়বে কিন্তু মূরগির পা বাতার ফাকে তুকে আঘাত প্রাপ্ত হবে না। হাঁস/মূরগির ঘর অনেকসময় পুকুরের পাড়েও তৈরি করা হয়।

হাঁস-মূরগির জাত ও সংখ্যা নির্ধারণ : প্রতি শতাংশ পুকুরের জন্য উন্নতজাতের ২টি হাঁস বা মূরগি (ত্রয়লার বা লেয়ার) পালন করা যায়।

হাঁস-মূরগির খাদ্য : বাচ্চা অবস্থায় ৯০ দিন পর্যন্ত প্রতিটি হাঁসের জন্য প্রতিদিন ৬০-৯০ গ্রাম এবং প্রতিবর্তীতে ১১০-১২৫ গ্রাম সুষম খাদ্য দিতে হবে। হাঁসকে খাদ্য খাওয়ানোর সময় প্রয়োজনমতো পানি মিশিয়ে দিতে হবে। ত্রয়লার মূরগিকে প্রয়োজন অনুযায়ী সব সময় খাবার প্রদান নিশ্চিত করাতে হবে। প্রতিটি লেয়ার মূরগির জন্য ৪ সঙ্গাহ পর্যন্ত ৮০-৯০ গ্রাম এবং প্রতিবর্তীতে ১১০-১২০ গ্রাম হারে দৈনিক খাবার প্রদান করাতে হবে। খাদ্য ও পানি খাওয়ানোর জন্য পৃথক পাত্র ব্যবহার করাতে হবে।

হাঁস-মূরগির রোগবালাই দমন : হাঁস/মূরগির রোগ হতে পারে। রোগ হলে নিকটস্থ পতঙ্গ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য হাঁস-মূরগির ঘর সবসময় তকনো রাখাতে হবে। ঘরের মেঝে

এবং খাদ্য ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিকার রাখতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত টিকা ও ইনজেকশন দিতে হবে। অসুস্থ হাঁস-মূরগিকে যতদ্রুত সম্ভব ভালোগলোর কাছ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

মাছের প্রজাতি নির্বাচন ও মজুদ ঘনত্ব : পুরুরে ৮-১২ সেমি আকারের বিভিন্ন কার্পজাতীয় মাছের পোনা শতক প্রতি ৩৫-৪০টি নিম্নলিখিত অনুপাতে ছাড়া যায় তার মধ্যে শতক প্রতি কাতলা/বিগহেড ৪টি, সিলভার কার্প ৯টি, বুই ৮টি, মুগেল ও কার্পিও ৪টি করে, প্রাস কার্প ১টি এবং সরপুটি ৫-১০টি ছাড়তে হবে।

প্রাসকার্প ঘাসজাতীয় খাদ্য যায়। তাই পুরুর পাড়ে জমানো ঘাস, নরম পাতা, কলা পাতা ইত্যাদি নিয়মিত পুরুরে দিতে হবে। অন্য জাতের মাছের জন্য বাইরে থেকে কোনো খাদ্য দেওয়ার দরকার নেই। পানিতে পড়া হাঁস/মূরগির উচ্চিষ্ঠ খাদ্যাই এরা গ্রহণ করবে।

মাছ মজুদোভর যত্ন : প্রতিমাসে একবার জাল টেনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। পুরুরে অঙ্গিজনের অভাব হলে নতুন পানি সরবরাহ বা বাঁশ পিটিয়ে বা সাঁতার কেটে পানিতে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। পুরুরের তলদেশে গ্যাস জমা হলে হররা টেনে পুরুর থেকে গ্যাস দূর করা যেতে পারে। অফ রোগের আশঙ্কা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শীতের তরুতে শতক প্রতি ১ কেজি হারে চুল প্রয়োগ করা যায়।

উৎপাদন : সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছ ও হাঁস/মূরগির সমন্বিত চাষ করা হলে পুরুরে কোনো সার বা খাদ্য প্রয়োগ ছাড়াই শতক প্রতি ১৮ থেকে ২১ কেজি মাছ উৎপাদন করা যায়। খাকি ক্যাম্পকেল বা ইভিয়ান রানার জাতের হাঁস বছরে ২৫০-৩০০ টি ডিম দেয়। একটি ব্রয়লার মূরগি ২ মাসে প্রায় ১.৫-২ কেজি প্রজননের হয় এবং সেয়ার মূরগি বছরে ২০০-২৫০ টি ডিম দিয়ে থাকে।

খ) ধানক্ষেতে মাছ ও গলদা চিহ্নিত চাষ

ধান চাষের সময় অনেক জমিতেই দীঘনিন পানি ধরে রাখার দরকার হয়। এসব ধানক্ষেত একটু পরিকল্পনা মাফিক তৈরি করে নিলে একই জমিতে এক বছরে ধান এবং মাছ ও গলদা চিহ্নিত একাধিক ফসল ফলানো সম্ভব। বিশেষজ্ঞের মতে বাংলাদেশে বর্তমানে ২.০০ লক্ষ হেক্টর জমি ধানক্ষেতে মাছ বা চিহ্নিত চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী যা এখনই ব্যবহার করা যায়। আরও ৩.০ লক্ষ হেক্টর ধানের জমি ভবিষ্যতে গলদা ও মাছ চাষের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

ধানক্ষেতে মাছ ও গলদা চিহ্নিত চাষের সূবিধা : একই জমিতে অভিযোগ্য ফসল হিসাবে মাছ ও গলদা চিহ্নিত উৎপাদন হয়। এতে জমির সর্বোন্তম ব্যবহার হয়। মাছ ধানের অক্ষতিকর কীট পতঙ্গ ও পোকামাকড় থেরে ফেলে। তাই ধানক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহারের দরকার হয় না। মাছ ও চিহ্নিত চলাফেরার কারণে ক্ষেত্রে আগাছা জন্মাতে বাধা সৃষ্টি হয়। মাছ ও চিহ্নিত বিষ্টা ক্ষেত্রের উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে ফলে সারের খরচ তুলনামূলক কম হয়। গবেষণায় দেখা গেছে এ পক্ষত্বতে ধানের ফলন গড়ে শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

জমি নির্বাচন : যেসব জমিতে কমপক্ষে ৪-৬ মাস পানি ধরে রাখা সম্ভব এবং চাষকালীন সময়ে ক্ষেত্রের সব অংশে কমপক্ষে ১২-১৫ সেমি পানি থাকে সেসব জমিতে ধান এবং মাছ ও গলদার সমন্বিত চাষ সম্ভব। যে সব জমি উচু অর্ধাংশ পানি ধরে রাখতে পারে না, আবার যে সমস্ত জমি বেশি নিচু অর্ধাংশ সহজে প্রাপ্তি হয় এদের কোনোটিই মাছ চাষের জন্য উপযোগী নয়।

মাছ ও গলদা চাষের জন্য ধানক্ষেত প্রস্তুতকরণ

জমির আইল তৈরি/ মেরামত : জমির আইল শক্ত, মজবুত করে তৈরি বা মেরামত করতে হবে। সাধারণ বন্যায় যে পরিমাণ পানি হয় তার চেয়ে ৩০-৬০ সেমি উচু করে আইল তৈরি করা ভালো। আইল পর্যাপ্ত চওড়া হতে হবে। এতে আইল তাড়াতাড়ি ভাঙবে না ও আইলে কিছু শাকসবজি ও চাষ করা যাবে।

ধানক্ষেতে ডোবা ও খাল/নালা খনন : মাছ ও চিংড়ির আশ্রয় ও চলাচলের সুবিধার জন্য ধান ক্ষেতের আলের চারপাশে ভিতরের দিকে নালা খনন করা হয় অথবা আলের এক বা দুইপাশে নালা বা ডোবা খনন করা হয়। আবার অনেকস্থে ধান ক্ষেতের মাঝখানে বা কোনায় ডোবা খনন করা হয়। কোনো কোনো স্থেতে নালা ও ডোবা দুই-ই-খনন করা হয়। সেক্ষেত্রে ডোবার সাথে নালার সহযোগ থাকে। মোট জমির শতকরা ১৫ ভাগ জায়গা ডোবা ও নালা হলেই চলে। এদের গভীরতা ০.৫-০.৮ মিটার হলে ভালো হয়। জমির ঢালু বা নিচু অংশে ডোবা তৈরি করা হয়।

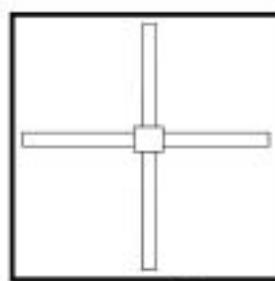
ধানক্ষেতে ডোবা ও নালা তৈরির সুবিধা হচ্ছে- (১) ক্ষেতের পানি কমে গেলে বা খুব গরম হয়ে গেলে চিংড়ি ও মাছ গর্ত ও নালার অপেক্ষাকৃত গভীরে ঠাণ্ডা পানিতে আশ্রয় নিতে পারে। (২) আগাছা পরিকার বা মাছ ধরার প্রয়োজন হলে জমির পানি শুকিয়ে মাছ গুলোকে নালা বা ডোবায় এনে তা সহজেই করা যায়।

গলদা চিংড়ির আশ্রয়স্থল সূচি : চিংড়ির জন্য ডোবা বা খালে কৃতিম প্রাস্টিক বা শকনো কঞ্চি দিয়ে গলদার আশ্রয়স্থল তৈরি করতে হবে। চিংড়ি এখানে খোলস বদলের সময় নাঞ্জুক অবস্থায় আশ্রয় নিতে পারবে।

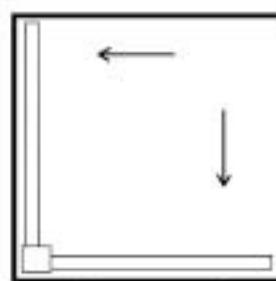
ধানের জমি তৈরি : জমিতে ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে প্রচলিত নিয়মে সার, গোবর ইত্যাদি প্রয়োগ করে ধান রোপণ করতে হবে।

ধানের জাত নির্বাচন : ধানের সাথে মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য বি আর-৩ (বিপুব), বি আর-১১ (মুক্তা), বি আর-১৪ (গাজী), বি আর-২ (মালা) ইত্যাদি উচ্চ ফলনশীল ধান নির্বাচন করা উচিত।

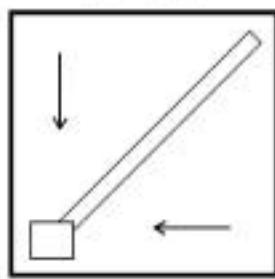
ধান রোপণ পদ্ধতি : ধানের চারা সারিবদ্ধভাবে রোপন করতে হবে। সেক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২৫ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-২০ সেমি রাখতে হবে। পর পর ৫-৬ সারি লাগানোর পর ৩৫-৪০ সেমি ফাঁকা রাখতে হবে। এতে মাছ ও চিংড়ির চলাচলে সুবিধা হয় এবং পানিতে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পড়তে পারে ফলে দুট মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হতে পারে।



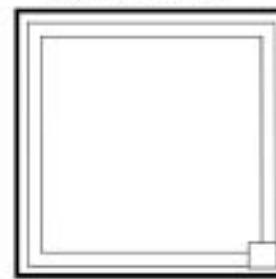
সমতল জমি



দুই দিকে ঢালু জমি



দুই দিকে ঢালু জমি



সমতল জমি

চিত্র: ধানক্ষেতে ডোবা ও নালা তৈরির করোকৃতি নকশা

মাছের প্রজাতির নির্বাচন : যেহেতু ধানক্ষেতে খুব বেশি পানি থাকে না তাই কম পানিতে ও কম অঙ্গিজনে বাঁচতে পারে, উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে এবং সেইসাথে ধান চাষকালীন সময়ের মধ্যে খাণ্ডয়ার উপযোগী হয় এক্ষেত্রে দ্রুত বর্ধনশীল মাছ নির্বাচন করতে হবে যেমন- কার্পিও, সরপুটি, তেলাপিয়া। তবে এগুলোর সাথে অল্পসংখ্যক রুই, কাতলা দেওয়া হেতে পারে। আবার মাছের মাছের পোনা ও ছাঁড়া যায়। তবে গ্রাস কার্প ছাঁড়া যাবে না কারণ এরা ধান গাছ থেয়ে ফেজতে পারে।

পোনা মজুদ : ধান রোপনের ১০-১৫ দিন পর যখন ধান গাছ শক্তভাবে মাটিতে লেপে যাবে তখন চিহ্নি ও মাছ মজুদ করতে হবে। শতাংশপ্রতি মাছের পোনা ১৫-২০টি ও চিহ্নির পোনা ৪০-৫০টি মজুদ করা হেতে পারে।

সম্পূর্ণ খাদ্য তৈরি ও প্রয়োগ : চালের কুঁড়া, বৈল, ফিশমিল ১৪১:১ অনুপাতে নিয়ে এর সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ আটা পানিতে ফুটিয়ে আঠালো করে উচ্চ উপকরণগুলোর সাথে মিশিয়ে কাই করে হোট হোট বল বানিয়ে মাছ ও চিহ্নিকে সরবরাহ করতে হবে। প্রতিদিন দেহের ওজনের ৩-৫% খাবার তিন ভাগ করে সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় প্রয়োগ করতে হবে।

ব্যবস্থাপনা : ধানের সাথে মাছ চাষ করলে কীটনাশক দেওয়া উচিত নয়। তবে কীটনাশক ব্যবহার অত্যাবশ্যক হলে ক্ষেতের পানি কমিয়ে মাছকে ডোবা/নালায় আটকিয়ে তা করতে হবে। কীটনাশক ব্যবহারের অন্তত ৫ দিন পর সেচ দিয়ে পুনরায় মাছকে সমস্ত জরিমাতে চলাচলের সুযোগ করে দিতে হবে। ক্ষেতের পানি কমে গেলে দ্রুত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। মাছে রোগ বালাই এর লক্ষণ দেখা দিলে মাছগুলোকে ডোবার মধ্যে নিয়ে শতক প্রতি ১ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে।

ধান, মাছ ও চিহ্নি আহরণ : ধান কাটার সময় হলে ক্ষেতের পানি কমিয়ে চিহ্নি ও মাছগুলোকে নালা বা ডোবায় এনে ধান কাটতে হবে। ধান কাটার পরও যদি ক্ষেতে পানি থাকে বা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে পরবর্তী ফসল তরু করার পূর্ব পর্যন্ত মাছ চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গৃহপালিত পশুপাখি পালন পদ্ধতি

গৃহপালিত পশুর আবাসন

সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং অধিক উৎপাদনের জন্য অধিকতর আরামদায়ক পরিবেশে পশুকে আশ্রয় প্রদানকে গৃহপালিত পশুর আবাসন বলা হয়। পশুকে থাকা, খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য যে আরামদায়ক ঘর তৈরি করে দেওয়া হয় তাকে বাসস্থান বা গোয়াল ঘর বলে। পশুর বাসস্থান বা গোয়াল ঘরের অনেক সুবিধা রয়েছে। গোয়াল ঘরে একক বা দলগতভাবে পশু পালন করলে ব্যবহার্পনা অনেক সহজ হয় ও উৎপাদন খরচ কমে আসে। গোয়াল ঘরে সব সময় পশুকে আবক্ষ না রেখে মাঝে মধ্যে বাইরে সুরিয়ে আনা পশুর স্বাস্থ্যের জন্য উত্তম।

আবাসনের উদ্দেশ্য

- | | |
|--|--|
| ১। আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা। | ৬। পশুকে শান্ত করা। |
| ২। পশুকে আশ্রয় ও বিশ্রাম দেওয়ার জন্য। | ৭। গর্ভবতী, প্রসূতি ও বাচ্চার সঠিক পরিচর্যা করা। |
| ৩। খারাপ আবহাওয়া থেকে রক্ষা করা। | ৮। পশু থেকে অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদন করা। |
| ৪। পোকা-মাকড় ও বন্য পশুপাখি থেকে রক্ষা করা। | ৯। দক্ষতার সাথে দুর্ভ দোহন করা। |
| ৫। চোরের হাত থেকে রক্ষা করা। | ১০। খাদ্য ও পানি সরবরাহ সঠিক ও সহজ করা। |
| ১১। পশুর একক ও নিবিড় যত্ন নেওয়া। | ১৪। রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা। |
| ১২। সময়মতো চিকিৎসা দেবা দেওয়া। | ১৫। গোবর ও অন্যান্য বর্জ্য স্তরক্ষণ করা। |
| ১৩। সহজে গোয়াল ঘর পরিষ্কার করা। | ১৬। উৎপাদন খরচ কমানো। |

পশুর আবাসনের স্থান নির্বাচন করা

পশুর আবাসনের জন্য স্থান নির্বাচন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থান নির্বাচন সঠিক না হলে খামার লাভজনক করা যায় না। পশুর আবাসন মূলধন ও পশুর সংখ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত। গৃহপালিত পশুর আবাসন বা বাসস্থান এমন জায়গায় তৈরি করতে হবে, যেখানে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো বিদ্যমান থাকে।

- ১। উচ্চ, তকনো ও বন্যামুক এলাকা হতে হবে।
- ২। বাজার, মহাসড়ক ও বসতি থেকে একটু দূরে হবে।
- ৩। দুধ ও মাংস বাজারজাত করার সুবিধা থাকতে হবে।
- ৪। ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা থাকবে।
- ৫। বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের সুবিধা থাকতে হবে।
- ৬। গোয়াল ঘর বা খামার এলাকা থেকে সহজে পানি নিষ্কাশন হতে হবে।

- ৭। গোয়াল ঘরে ঘেন সূর্যালোক পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে ।
- ৮। গোয়াল ঘরের চার পাশ পরিষ্কার রাখতে হবে ।
- ৯। পশুর জন্য খাদ্য ও পানি সরবরাহের বিষয়টি মনে রাখতে হবে ।
- ১০। ভবিষ্যতে খামার বড় করার সুযোগ থাকতে হবে ।

গুরুর আবাসন

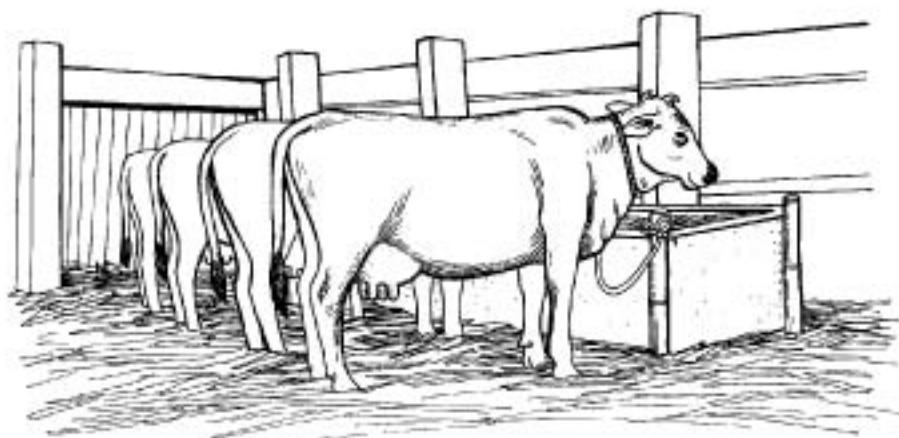
গুরুর আবাসনের জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো গোশালা বা গোয়াল ঘরে বেঁধে পশু পালন করা । গোয়াল ঘরের আকার পশুর সংখ্যার উপর নির্ভর করে । পশুর সংখ্যা ১০ এর কম হলে ১ সারি বিশিষ্ট ঘর এবং ১০ বা তার অধিক হলে ২ সারি বিশিষ্ট ঘর তৈরি করতে হবে ।



চিত্র: গুরুর আবাসন

গাড়ী পালন

কৃষির অঙ্গগতি ও বিকাশের সাথে পশু ও গাড়ী পালন অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত । বলা হয়ে থাকে একটি জাতির মেধার বিকাশ নির্ভর করে মূলত ঐ জাতি কতটুকু দুধ পান করে তার উপর । আজকের বিশে যেখানেই কৃষি বিকাশ লাভ করেছে গাড়ীর দুধ উৎপাদন ও ব্যবহার সেখানে শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত লাভ করেছে । আমাদের দেশেও মোটামুটিভাবে বলা যায় যে গাড়ী পালন একটি শিল্প হিসাবে পড়ে উঠেছে । আমাদের দেশে পীচ ধরনের উন্নত জাতের গাড়ী দেখা যায় সেগুলো হলো-হলস্টেইন ক্রিজিয়ান, জার্সি, শাহিওয়াল, সিন্ধি, রেড চিটাগাং প্রভৃতি । এই সমস্ত জাতের গাড়ীর দুধ উৎপাদনক্ষমতা মোটামুটি ভালো । বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লালনপালন ও প্রজনন করালে এদের উৎপাদন ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে ।



চিত্র : খামারের দুর্ভবতী গাভী

গাভীর পরিচর্যা

গাভীর পরিচর্যার লক্ষ হলো গাভী থাকে অধিক কর্মক্ষম থাকে। গাভীর গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও দুর্ভদোহন কালের পরিচর্যার দিকে বিশেষ ভূমত্ত দিতে হবে। গাভীকে নিয়মিত গোসল করানো, শিং কাটা, ঘূর কাটা ইত্যাদির দিকে বিশেষ ভূমত্ত দিতে হবে। এসব পরিচর্যায় গাভীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং উৎপাদনে ভালো প্রভাব পড়ে। গর্ভকালীন সময়ে গাভীর দিকে বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত কারণ এই সময়ে গাভীর ভিতরের বাচ্চা বড় হয়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে গাভীকে প্রচুর পরিমাণে দানাদার জাতীয়খাদ্য দিতে হবে। প্রসবকালীন সময়ে এবং প্রসবের কয়েক দিন আগে গাভীকে আলাদা জায়গায় রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এই গাভীকে সমতল জায়গায় রাখতে হবে। গর্ভধারণ ও প্রসবকালে গাভীকে সঠিকভাবে যত্ন ও পরিচর্যা করতে হবে। গর্ভকালীন অবহেলা করলে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া গাভী প্রজনন ও গর্ভধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। প্রসবের লক্ষণ দেখা দিলেই গাভীকে শান্ত পরিবেশে রেখে ২-৩ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রসব অগ্রসর না হলে ভেটেরিনারি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। প্রসবের পর বাচ্চুরকে অবশ্যই শাল দুধ খাওয়াতে হবে, কারণ এই শাল দুধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সঠিক ভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। বাচ্চা প্রসবের পর ফুল পড়ে গেলে তা সাথে সাথে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে। গাভী প্রসবের ৫-৭ দিন পর্যন্ত শাল দুধ দেয় এর পরে স্বাভাবিক দুধ পাওয়া যায়। দুধ দোহনের সময় গাভীকে উত্তেজিত করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং দ্রুততার সাথে দোহনের কাজ শেষ করতে হবে। গাভীর বাচ্চা প্রসবের ৯০ দিনের মধ্যে গাভী গরম না হলে ডাঙ্গারি পরীক্ষা করে গরম করতে হবে। গাভী পরিচর্যার আরও একটি লক্ষ্য হচ্ছে, গাভীকে পোকামাকড় ও মশামাছি থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা।

গাভীর খাদ্য

গাভীর শারীরিক বৃদ্ধি ও কোষকলার বিকাশ ও ক্ষয়পূরণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, মেহ পদার্থ সংরক্ষণ, দুধ ও মাংস উৎপাদন, প্রজননের সক্ষমতা অর্জন, গর্ভবস্থায় বাচ্চার বিকাশ সাধন প্রতীক্ষিক কাজের জন্য উপযুক্ত

খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য পরিবেশনে শর্করা আমিষ ও চর্বিজাতীয় খাদ্যের প্রতুলতার দিকে বিশেষ ভুক্ত দিতে হবে। কারণ গাভীর শারীরিক বিকাশের জন্য সব ধরনের খাদ্য উপাদানের উভয় অপরিসীম। এসব খাদ্য মিশ্রণে পতঙ্গ দৈহিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ও অনুপাতে সব রকম পুষ্টি উপাদান থাকতে হবে। গাভীর পরিপূর্ণ বিকাশ ও উৎপাদনের জন্য তাই সুস্থ খাদ্যের প্রয়োজন। গাভীর খাদ্যদ্রব্য সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-আঁশযুক্ত খাদ্য, দানাদার খাদ্য ও ফিউ অ্যাভিটিভস। আঁশযুক্ত খাদ্যের মধ্যে খড়বিচালি, কঁচাঘাস, লতাপাতা, হে, সাইলেজ ইত্যাদি প্রধান। দানাদার খাদ্যের মধ্যে শস্যদানা, গমের ভুসি, চালের কুঁড়া, খেল ইত্যাদি প্রধান। তাছাড়া খনিজ ও ভিটামিন এর মধ্যে হাঁড়ের কুঁড়া, বিভিন্ন ভিটামিন - খনিজ প্রিমিয়া পদার্থ রয়েছে। এসব পতঙ্গ খাদ্য প্রয়োজন মতো সংগ্রহ করে গাভীকে পরিবেশন করতে হবে। গাভীকে যে পরিমাণ খাদ্য পরিবেশন করতে হয় তা একধরনের খাদ্যবুল পদ্ধতির মাধ্যমে নিরূপণ করা যায়। যেমন-

- ১। প্রতিদিন একটি গাভী যে পরিমাণ মোটা আঁশযুক্ত খড় ও সরুজ ঘাস থেতে পারে তা তাকে থেতে দিতে হবে।
- ২। গাভীর শরীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১.৫ কেজি দানাদার এবং প্রতি ১.০ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য গাভীকে খড় ও সরুজ ঘাসের সাথে ০.৫ কেজি দানাদার খাদ্য দিতে হবে।
- ৩। গাভীকে ৪০-৫০ আম হাঁড়ের কুঁড়া ও ১০০ - ১২০ আম খাদ্য লবণ সরবরাহ করতে হবে।
- ৪। তাছাড়া দুর্ঘটনা গাভীকে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ জীবাণুযুক্ত খাবার পানি সরবরাহ করতে হবে।

গাভীর স্বাস্থ্যসম্বত্ত লালন-পালন ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

স্বাস্থ্যসম্বত্ত লালনপালন বলতে এমন কর্তৃতো স্বাস্থ্যগত বিধিব্যবস্থাকে বোঝায় যা এ যাবতকাল পতঙ্গসম্পদ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এগুলো হলো-

- বাসস্থান নির্মাণে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা ও দুর্যোগ নিরামণ করা।
- খাদ্য ও পানির পাত্র পরিকার পরিচ্ছন্ন রাখা।
- পচা, বাসি ও ময়লাযুক্ত খাদ্য ও পানি পরিহার করা।
- সর্বদা তাজা খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা।
- প্রজনন ও প্রসবে নিজীবাণু পদ্ধতি অবলম্বন করা।
- দ্রুত মলমৃত্র নিষ্কাশন করা।
- অসুস্থ গাভীর পৃথক্কীরণ ও মৃত গাভীর সংরক্ষণ করা।
- নিয়মিত কৃমিনাশক ব্যবহার করা।
- সংক্রামক ব্যাধির প্রতিশেষক টিকা প্রয়োগ করা ইত্যাদি।

গাভীকে প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণ ও রোগ চিকিৎসা

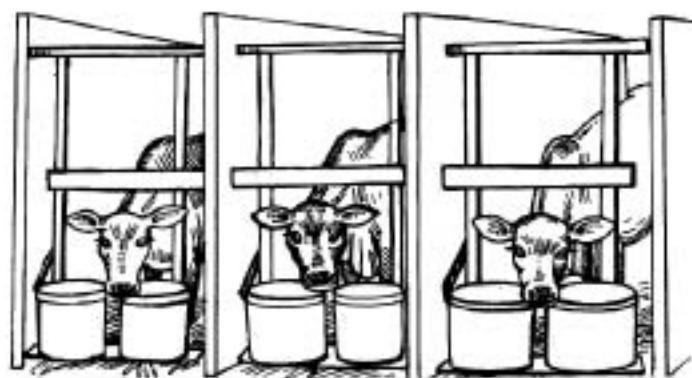
নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে অসুস্থ গাভী শনাক্ত করা যায়। গাভীর বিভিন্ন রোগ বালাই যেন না হয় সেই জন্য সময়মতো টিকা দিতে হবে। গাভী তড়কা, বাদলা, কুরা রোগ, গলাফোলা, রিভারপেস্ট, ম্যাস্টাইটিস, পরজীবী ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হতে পারে। গাভীর ঘেকোনো রোগ দেখা দিলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

বাছুর পালন

গরু মহিষের শৈশবকালকে বাছুর বলে। সাধারণত জন্মের পর থেকে এক বছরের বেশি বয়সের গরু মহিষের বাচ্চাই বাছুর নামে পরিচিত। দুর্ঘ খামারের ভবিষ্যত বাছুরের সংক্ষেপজনক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কারণ আজকের বাছুরই ভবিষ্যতের দুধ উৎপাদনশীল গাভী, উন্নত মানের প্রজনন উপযোগী ঝাড় বা মাংস উৎপাদনকারী গরু। তাই পশ্চালন বিজ্ঞানে বাছুর পালন একটি অত্যন্ত উন্নতপূর্ণ বিষয়। অঙ্গ বয়সের এই গরু বা মহিষের বাচ্চা অত্যন্ত রোগ সংবেদনশীল হয়। আমাদের দেশে যে সংস্কৃত গবাদিপত্র পালিত হয় তার মধ্যে শতকরা ২৪ ভাগেরও বেশি বাছুর। তাই সুস্থ সবল বাছুর পেতে হলে একদিকে যেমন-গভর্বস্থায় গাভীর সুস্থি ও পর্যাপ্ত সুষম খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন প্রসরকালীন ও নবজাত বাছুরের সঠিক যত্ন।

বাছুরের বাসস্থান

দেশীয় জাতের একটি বাছুরের জন্মকালীন গড় ওজন সাধারণত ১৫-২০ কেজি হয়। অবশ্য উন্নত ও সংকর জাতের বাছুরের জন্মকালীন ওজন প্রায় ২৫-৩০ কেজি হয়। একটি বাছুরের বাসস্থানের জায়গা কতটুকু হয় বাছুরের আকারের উপর তা মূলত নির্ভর করে। প্রতিটি বড় বাছুরের জন্য ৩৫ বর্গফুট (৩.২৫ ব.মি.) জায়গার ভিত্তিতে বাছুরের বাসস্থান তৈরি করা হয়।



চিত্র : ঘরের ছেট খোপে বাছুর

বাছুরের বাসস্থানের জায়গা এমন হতে হবে যে ঘরে প্রচুর পরিমাণ আলো ও বাতাস প্রবেশ করে। বাছুরের বাসস্থান কাঁচা বা পাকা হতে পারে, তবে এতে মলমৃত্ত নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে। একটি ছেট বাছুরের জন্য ১২ বর্গফুট (১.১১ ব.মি.) জায়গার প্রয়োজন। বাছুরের খোপে খড় বিচালি দিয়ে বিছানা তৈরি করতে হবে। ঘেঁৰো পাকা হলে তা যেন কর্মসূক্ষ ও সৈতেসৈতে না হয় সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

বাচ্চুরের পরিচর্যা

বাচ্চুরের পরিচর্যা বলতে এদের খাদ্য পরিবেশন, রোগবালাই মুক্ত রাখা, দেখাশোনা করা ইত্যাদি বোঝায়। আমাদের দেশে বাচ্চুরের আলাদা যত্ন নেওয়ার তেমন কোনো পরিকল্পনা নেই। তবে এটি একটি অভ্যন্তরীণ পূর্ণ বিষয়। বাচ্চুর জন্মের পর থেকে দৈহিক পরিপন্থতা অর্জন না করা পর্যন্ত এদের পালন করা বা এদের দিকে বিশেষ ঘন্টবান হওয়া অভ্যন্তরীণ জন্ম।

বাচ্চুর জন্মের পরবর্তী করণীয়

বাচ্চুর জন্মের পর পরই ছালার উপর রেখে নাক মুখ পরিস্কার করার পর শরীর পরিকার করার জন্য গাড়ীর সামনে দিতে হবে। বাচ্চুরের নাভি রক্ষা করে না গেলে নাভি থেকে ৫ সেমি দূরে ডেড দিয়ে কেটে স্যান্ডল বা টিংচার আয়োডিন সাগাতে হবে।

বাচ্চুরকে গাড়ীর দুধ পান করা শেখানো

জন্মের পর পরই বাচ্চুরকে শাল দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। জন্মের পর পরই অনেক বাচ্চুর মাঝের বাট থেকে দুধ চুম্ব খেতে পারে না। তাই বাচ্চুরের মুখের ভিতর বাট দিয়ে দুধ খাওয়ার অভ্যাস করাতে হয়। গাড়ীর উৎপাদন ক্ষমতা কম হলে অনেক সময় অন্য গাড়ীর দুধ পান করানোর প্রয়োজন হতে পারে। শৈশবে বাচ্চুরকে ৩৭.৫ সে. তাপমাত্রার দুধ পান করানো হয়। সাধারণত বোতলে বা বালতিতে করে বাচ্চুরকে দুধ খাওয়ানো হয়। বিতর্ক দুধ ও পানি ১ : ২ অনুপাতে মিশিয়ে পাতলা করে পান করানো উচ্চম। দুধ খাওয়ানোর পর বোতল অবশ্যই ভালোভাবে পরিকার করতে হবে।



চিত্র : বাচ্চুর মাঝের দুধ পান করছে



চিত্র : বাচ্চুরকে বোতলে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে

খামার পর্যায়ে বাচ্চুর চিহ্নিকরণ বা ট্যাগ নথর লাগানো

এটি হ্রোট খামারের জন্য তেমন প্রয়োজন না হলেও বড় খামারের জন্য জরুরি। পশ্চর জাত উন্নয়ন ও তথ্য সংগ্রহের জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। সাধারণত কালে ট্যাগ নথর লাগিয়ে পশ্চ চিহ্নিকরণ করা হয়।

পরিমিত খাদ্য পরিবেশন, মলমূত্র ও বিছানা পরিকার রাখা

বাচ্চুরের সঠিকভাবে বৃক্ষির জন্য পরিমিত খাদ্য পরিবেশনের কোনো বিকল্প নেই। সাধারণত দৈহিক ওজন অনুসারে খাবার প্রদান করা হয়। বৰ্ধিত বাচ্চুরের চাহিদা অনুসারে জন্ম থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যতালিকা অনুসারে নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্ভাবনার প্রতিপালনের জন্য বাচ্চুরের থাকার ঘরটিতে মলমূত্র নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে। নিয়মিত বাচ্চুরের থাকার ঘরের বিছানা

বাছুর সময়মতো ঘরে তোলা ও বের করা

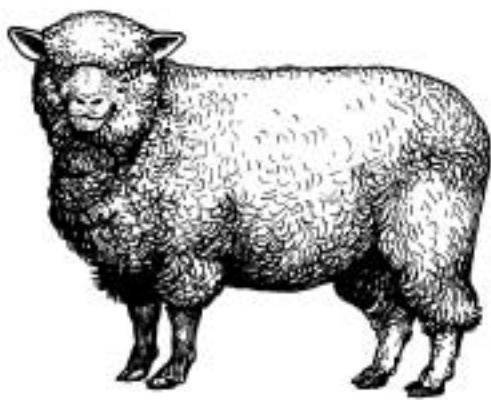
বাছুরকে সময়মতো ঘরে তুলতে হয় এবং ঘর থেকে বের করতে হয়। বাছুরকে সারা দিন ঘেমন ঘরে আবক্ষ রাখা ঠিক নয় এবং তেমনি দিনভর খোলা জায়গায় রাখা ও ঠিক নয়। বৃষ্টিতে ভেঙ্গা বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় থাকলে বাছুরের ফুসফুস প্রদাহ রোগ হতে পারে।

বাছুরের প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণ ও রোগ চিকিৎসা

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও রোগব্যাধিতে নিয়মিত ঔষধ সেবন বাছুর পরিচর্যার অন্যতম করণীয়। এই সময়ে বাছুরের শারীরিক বৃদ্ধি ভালোভাবে না হলে পরবর্তীতে ভালো উৎপাদনশীল গরু হিসাবে গড়ে উঠতে পারে না। বাছুরের বিভিন্ন রোগবাদাই যেন না হয় সেই জন্য সময়মতো টিকা দিতে হবে। বাছুরের ক্ষয়ার, নিউমোনিয়া, ছাইক, বাদলা রোগ, কৃমি ও আঁচিল রোগ দেখা যায়। বাছুরের যেকোনো রোগ দেখা দিলে পশ্চিম চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ভেড়া পালন

ভেড়া একটি নিরীহ প্রাণী। এরা চারপথ ঘাস খেতে খুব পছন্দ করে এবং দলগতভাবে ঘুরে বেড়ায়। এদের প্রজনন ক্ষমতা বেশি, ১৫ মাসে ২ বার বাচ্চা দেয়। তাই ভেড়া পালন শুরু করলে কয়েক বছরের মধ্যে খামারের আকার বড় হয়ে উঠে এবং ব্যবসায় লাভবান হওয়া যায়। এরা শুধু ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তবে কিন্তু দানাদার খাদ্য সরবরাহ করলে ভালো উৎপাদন পাওয়া যায়। ভেড়া পশম (Wool) ও মাংসের জন্য পালন করা হয়। এদেশে ভেড়ার তেমন কোনো ভালো জাত নেই। বাংলাদেশের ভেড়া মোটা পশম উৎপাদন করে। তাই এরা পশমের জন্য জনপ্রিয় নয়। এখানে ভেড়া মাংসের জন্য উৎপাদন করা হয়ে থাকে। তবে পৃথিবীর শীতপ্রধান দেশগুলোতে ভেড়ার পশম খুব মূল্যবান ও জনপ্রিয়। ভেড়ার পশম দিয়ে কম্বল, শাল, সোয়েটার, জ্যাকেট তৈরি করা হয়। মোটা পশম কাপেট তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। ভেড়ার এত গুণাঙ্গ থাকলেও চারণভূমি ও উদ্যোগের অভাবে এদেশে এর পালন জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি।



চিত্র : সূক্ষ্ম পশমের মেরিনো ভেড়া



চিত্র : মোটা পশমের কারাকুল ভেড়া

ভেড়ার বাসস্থান

ভেড়ার বাসস্থান তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ এরা খাবারের জন্য সারাদিন মাঠে ঘুরে বেড়ায়। তবুও নিম্ন লিখিত কারণে এদের বাসস্থান প্রয়োজন হয়।

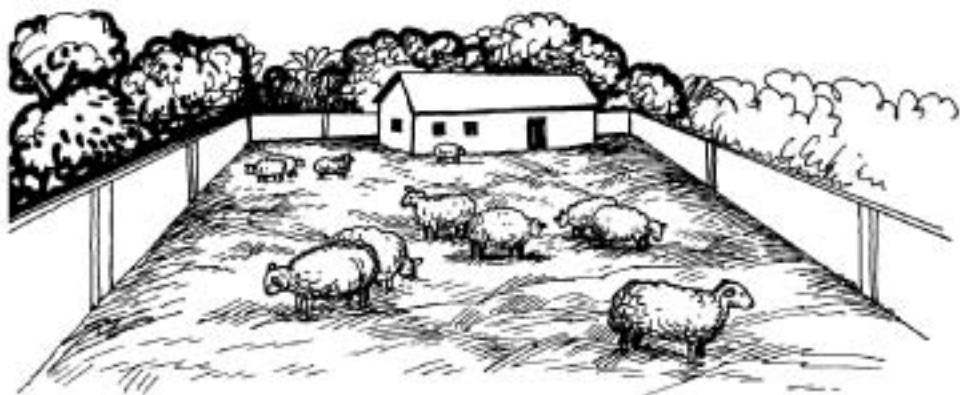
- রাতের বেলায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য।
- বন্য প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।
- বড় ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য।
- বেশি উৎপাদনক্ষম ভেড়ার দুর্ঘট দোহন করার জন্য।
- গর্ভবতী, প্রসূতি ও বাচ্চা ভেড়ার পরিচর্যার জন্য।
- ভেড়ার পশম কাটার জন্য।
- চোরের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

ভেড়া পালনের জন্য তিনি ধরনের ঘর ব্যবহার করা হয়। যথা :

ক. উন্নুক ঘ. আধা উন্নুক ও গ. আবক্ষ ঘর। আবহাওয়া ও জলবায়ুর কথা চিন্তা করে রাতে আশ্রয়ের জন্য ভেড়ার ঘর তৈরি করা হয়। ভেড়ার ঘরের মেঝে ভূমি সমতলে বা মাটার তৈরি হয়ে থাকে।

ক. উন্নুক ঘর: যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয় সেখানে এ ধরনের ঘর উপযোগী। একটি নিমিট জায়গার ঢারিদিকে বেড়া দিয়ে উন্নুক ঘর তৈরি করা হয়। এধরনের ঘরে কোনো ছাদ থাকে না। সারাদিন ঢরে খাওয়ার পর রাতে ভেড়ার পাল এখানে আশ্রয় নেয়। এখানে মেঝেতে খড় ব্যবহার করা হয়।

খ. আধা উন্নুক ঘর: উন্নুক ঘরের নিমিট স্থানের এক কোণে কিছু জায়গা যখন ছাদসহ তৈরি করা হয় তখন তাকে আধা উন্নুক ঘর বলে। যেসব এলাকায় মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হয় সেখানে আধা উন্নুক ঘর ব্যবহার করা যেতে পারে।



চিত্র : ভেড়ার আধা উন্নুক ঘর

গ. আবক্ষ ঘর: যেসব অঞ্চলে প্রচুর বাড়বৃষ্টি হয়, সেখানে এ ঘর বেশি উপযোগী। আবক্ষ ঘরের পুরা অংশেই ছাদ থাকে। ঘরের পাশ দিয়ে প্রচুর আলো বাতাস প্রবাহের ব্যবস্থা থাকে। আবক্ষ ঘরের মেঝে পাকা ও আধা পাকা হয়ে থাকে।

বয়স্ক ভেড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাপ-

মাচার মেঝে (বর্গমিটার)	ভূমিসমতলে খড়ের মেঝে (বর্গমিটার)
০.৪৫-০.৫৫	০.৬৫-০.৯৫

ভেড়ার পরিচর্যা

ভেড়াকে সুস্থ, সবল ও কর্মকুম রাখার জন্য এবং এদের থেকে বেশি উৎপাদন পেতে হলে সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে হবে। নিয়মিত ত্রাশ দিয়ে ভেড়ার পশম পরিকার করতে হবে। এতে পশমের অচলা বেরিয়ে আসবে। ভেড়ার দেহে মাঝে মধ্যে বহিপ্ররজীবীনাশক প্রয়োগ করতে হবে। ভেড়ার পশম কাটার পূর্বে গোসল করাতে হবে।

ভেড়ার খাদ্য

ভেড়া যে কোনো ধরনের খাদ্য থেকে বেঁচে থাকতে পারে। এটি গরু, মহিষ ও ছাগলের মতোই জাবরকটা প্রাণী। ভেড়ার খাদ্যের শ্রেণিবিন্যাস গরু ছাগলের মতোই। এদের রেশনে আঁশঘুড় খাদ্যের পরিমাণ দানাদার খাদ্যের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। গর্ভবতী ভেড়ির তুলনায় প্রসূতির খাদ্য তালিকায় অধিক পরিমাণে দানাদার খাদ্য প্রদান করা হয়। বাচ্চা প্রসবের একমাস পূর্ব থেকে ভেড়ির খাদ্য তালিকায় দৈনিক ২০০-২৫০ গ্রাম হারে দানাদার খাদ্য যোগ করতে হয়। একটি বয়স্ক ভেড়ার দৈনিক ২.০-২.৫ কেজি সবুজ ঘাস এবং ২৫০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

মাস উৎপাদনকারী ভেড়ার খাদ্য তালিকা-

উপাদান	পরিমাণ (%)
ভূট্টার গুঁড়া	৪০
চিটা গুড়	৫
গমের ভূসি	১০
বৈল	৯
তকানো লিগিউম ঘাস	৩৬
মোট	১০০

কাজ :

পাঁচটি মাস উৎপাদনকারী ভেড়ার প্রতিদিন কী পরিমাণ আঁশ ও দানাদার খাদ্যের প্রয়োজন হবে তা হিসাব করে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাও।

গর্ভবতী ভেড়ির খাদ্য তালিকা

উপাদান	পরিমাণ (%)
ভূট্টার গুঁড়া	৪৫
বৈল	১০
চিটা গুড়	৫
ভূট্টার সাইলেজ	২০
তকানো লিগিউম ঘাস	২০

প্রসূতি ভেড়ির খাদ্য তালিকা

উপাদান	পরিমাণ (%)
তালো মানের তকানো লিগিউম ঘাস	৮০
ভূট্টার গুঁড়া	১০
বৈল	৪
গমের ভূসি	৩

নবজাতকের যত্ন

নবজাত মেষ শাবককে জন্মের পর ৩-৪ দিন পর্যন্ত ওজন অনুগাতে শালদুধ পান করাতে হয়। এতে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে।

ভেড়ার রোগব্যাধি প্রতিরোধ ও দমন

ভেড়াকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখতে হবে। সকল বয়সের ভেড়াকে নিয়মিত কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে ও সময়মতো টিকা প্রদান করতে হবে। ভেড়া বাদলা, তড়কা, ম্যাস্টাইটিস, খুরা রোগ, চর্মরোগ, কৃমি, বহিঃপ্রজীবী ইত্যাদিতে বেশি আক্রান্ত হয়। রোগাক্রান্ত ভেড়াকে পশ্চ চিকিৎসাকের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা দেবা দিতে হবে।

ইঁস পালন পদ্ধতি

বাংলাদেশ নদীমার্ত্তক দেশ। এ দেশের আবহাওয়া এবং জলবায়ু ইঁস পালনের উপযোগী। এখানে অনেক ধালবিল, ডোবানালা, হাওর-বাঁওড়, পুকুর ও নদী রয়েছে। বাংলাদেশের সিলেট, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, যশোরসহ অনেক জেলায় বালিজ্যিক ভিত্তিতে ইঁসের খামার গড়ে উঠেছে। গ্রামের ইঁসের খামারিয়া প্রচলিত পদ্ধতিতে ইঁস পালন করে থাকে। কিন্তু ইঁস পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

১। উন্নুক পদ্ধতি

৩। অর্ধ-আবন্ধ পদ্ধতি

২। আবন্ধ পদ্ধতি

৪। ভাসমান পদ্ধতি

১। উন্নুক পদ্ধতি

ইঁস পালনের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে উন্নুক পদ্ধতি। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এ পদ্ধতিতে ইঁস পালন করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে সকাল বেলায় ইঁসগুলোকে বাসা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং রাতে নির্দিষ্ট ঘরে আবন্ধ থাকে। এখানে ইঁসকে সাধারণত কোনো খাবার দেওয়া হয় না। কারণ, এরা সারাদিন প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য যেমন, ছোট শাহ, শামুক, জলজ উদ্ভিদসহ বিভিন্ন দানাখস্য ও কীটপতঙ্গ নিজেরাই সংগ্রহ করে থায়। ইঁস সকাল বেলায় ডিম পাড়ে। তাই এই পদ্ধতিতে ইঁস পালনের সময় ডিমপাড়া ইঁসকে সকাল হঠা পর্যন্ত ঘরে আবন্ধ করে রাখতে হবে। আমাদের দেশের যেসব অঞ্চলে পতিত জমি, হাওর-বাঁওড় ও নদী রয়েছে, সেখানে এ পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি উন্নত ও লাভজনক। কিন্তু উন্নুক পদ্ধতিতে ইঁস পালনের বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

উন্নুক পদ্ধতিতে ইঁস পালনের সুবিধা

- শ্রমিক কম লাগে।
- খাদ্য খরচ কম।
- বাসন্ত তৈরিতে খরচ কম হয়।
- পরিবেশের সাথে অভিযোগন ভালো হয়।
- এদের দৈহিক বৃদ্ধি ও উৎপাদন ভালো হয়।



চিত্র : উন্নুক পদ্ধতিতে ইঁস পালন

উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস পালনের অসুবিধা

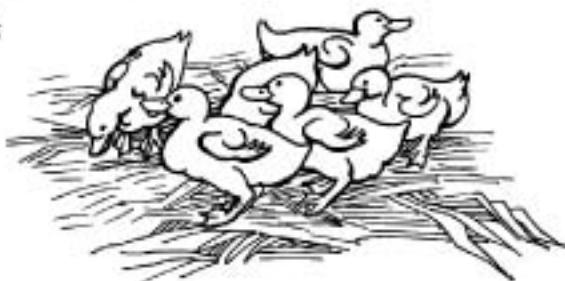
- অনেক পতিত জমি ও জলমহলের প্রয়োজন হয়।
- বন্য পত্তপাখি দ্বারা হাঁসের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- অনেক সময় খারাপ আবহাওয়ায় হাঁসের ক্ষতি হয়ে থাকে।
- সর্বসময় পর্যবেক্ষণ করা যায় না।
- অনেক সময় জমির ফসল নষ্ট করে থাকে।

২। আবক্ষ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে হাঁসকে সব সময় আবক্ষ অবস্থায় রাখা হয়। বাচ্চা হাঁস পালনের জন্য এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী। আবক্ষ পদ্ধতি আবার দুইধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

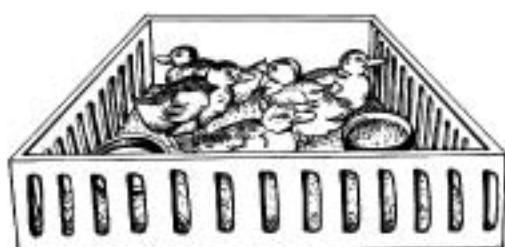
i) মেঝে পদ্ধতি ii) খাঁচা পদ্ধতি বা ব্যাটারি পদ্ধতি

i) মেঝে পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চা আবক্ষ অবস্থায় মেঝেতে পালন করা হয়। এ ধরনের মেঝেতে বিছানা হিসাবে খড়ের লিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খাবার এবং পানি দিয়ে বিছানা যাতে নষ্ট না হয় সোনিকে লক্ষ রাখতে হবে।

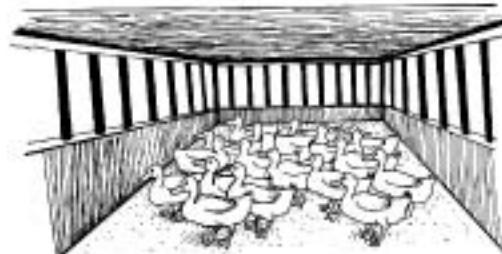


চিত্র : মেঝেতে হাঁসের বাচ্চা পালন

ii) ব্যাটারি বা খাঁচা পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চাকে খাঁচায় পালন করা হয়ে থাকে। প্রতিটি বাচ্চার জন্য ০.০৭ বর্গমিটার জায়গার প্রয়োজন হয়। বাচ্চা পালনের জন্য এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী।



চিত্র : খাঁচায় হাঁসের বাচ্চা



চিত্র : আবক্ষ পদ্ধতিতে ব্যাক্ষ হাঁস পালন

আবক্ষ পদ্ধতির সুবিধা

- খাদ্য গ্রাহণ সম্ভাবনে হয়।
- সহজে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
- শ্রমিক কম লাগে।
- বন্য পত্তপাখি হাঁসের ক্ষতি করতে পারে না।
- প্রতিটি হাঁসের জায়গা কম লাগে।

আবক্ষ পদ্ধতির অসুবিধা

- বেশি পরিমাণ খাবার সরবরাহ করতে হয়।
- ঘর নির্মাণ খরচ বেশি হয়।
- হাঁসের মুক্ত আলোবাতাসের অভাব হয়।
- নিবিড় যত্ন নিতে হয়।
- এখানে হাঁস সাঁতার কাটার সুযোগ পায় না।

৩। অর্ধ-আবক্ষ পদ্ধতি

অর্ধ-আবক্ষ পদ্ধতিতে হাঁসকে রাতে ঘরে রাখা হয় এবং দিনের বেলায় ঘরসংলগ্ন একটি নির্দিষ্ট জলাধার বা জায়গার মধ্যে বিচরণের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। এ নির্দিষ্ট জায়গার ভিতরে প্রতিটি হাঁসের জন্য প্রায় ০.৯৩ বর্গফুটের (প্রায় ১০ বর্গফুট) জায়গার প্রয়োজন হয়। জায়গাটি জলাধার না হলে হাঁসকে সীতার কাটার জন্য কৃত্রিম জলাধার, মালা বা চৌবাচ্চা তৈরি করে দিতে হয়। এখানে হাঁসগুলো সীতার কাটতে পারে ও খাবার পানি খেতে পারে।

অর্ধ-আবক্ষ পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধা

- এখানে হাঁস সীতার কাটার সুযোগ পায়।
- দৈহিক বৃক্ষ স্বাভাবিক থাকে।
- শ্রমিক কম লাগে।
- খাদ্য গ্রহণ সম্ভাবে হয়।

অর্ধ-আবক্ষ পদ্ধতিতে হাঁস পালনের অসুবিধা

- হাঁস পালন অর্ধ বেশি।
- নিরিড যত্ন নিতে হয়।
- খাদ্য অর্ধ বেশি।
- খাদ্য গ্রহণ সম্ভাবে হয় না।



চিত্র : অর্ধ-আবক্ষ পদ্ধতিতে হাঁস পালন

এ পদ্ধতিতে হাঁসের জন্য ভাসমান ঘর তৈরি করা হয়। এ পদ্ধতি বাড়ত ও বয়ক হাঁস পালনের উপযোগী। বড় পুরুর, দিয়ি বা নদীর কিনারায় পানির উপর হাঁসের সংখ্যা বিবেচনায় রেখে ঘর নির্মাণ করা হয়। এখানে নির্মাণ ঘরচ একটি বেশি হলেও খাদ্য অর্ধ কম। ভাসমান ঘর তৈরির জন্য ড্রাম ব্যবহার করা হয়। হাঁসগুলো সারাদিন ঘাড়ের সঙ্গানে ঘুরে বেড়ায় এবং রাতে ঘরে আশ্রয় নেয়। সাধারণত নিচু এলাকা যেখানে বন্যা বেশি হয়, সেখানে এ পদ্ধতিতে হাঁস পালন খুবই সুবিধাজনক।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ভাসমান পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধা ও অসুবিধা লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

হাঁসের রোগব্যাধি প্রতিরোধ ও দমন

হাঁসকে পরিকার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখতে হবে। হাঁসকে সহযোগতো টিকা দিতে হবে ও কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। হাঁস ডাক প্রেগ, কলেরা ও পরজীবী ইত্যাদিতে বেশি আক্রান্ত হয়। রোগান্ত হাঁসকে পশ্চ চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা সেবা দিতে হবে।

মন্তব্য : হাওর-বাঁওড়, ভাসমান পদ্ধতি, অভিযোজন, জলমহল, কৃত্রিম জলাধার, ডাক প্রেগ

সপ্তম পরিচ্ছন্দ

শিল্পের কাঁচামাল : কৃষিজ দ্রব্যাদি

কৃষি মানবজাতির বেঁচে থাকার একটি অনল্য নিয়ামত এবং সভ্যতা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের প্রধান ভিত্তি। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সঙ্গে কৃষি শিল্পের কাঁচামালও ঘোগান দিয়ে থাকে। আবার গৃহের সৌন্দর্য বৃক্ষের জন্য কাঁচামাল হিসাবে কাঠ, গুল্ম ও ঘাস জাতীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে। চা, কফি, চিনি, ভূলা, ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ কৃষিজ দ্রব্যাদি ছাড়াও বাঁশ, বেত, কাঠ, নারিকেলের ছোবড়া, আর ইত্যাদি শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে অবদান রাখছে। বাংলাদেশের কৃতির শিল্পের উত্থান হচ্ছে বাঁশ-বেতের মাধ্যমে। অতএব, আমাদের সবারই জানা থাকা দরকার বাঁশ-বেত দ্বারা কিসব জিনিস তৈরি হয়, নারিকেলের ছোবড়া কী উপকারে আসে- আর আম দ্বারা কি ধরনের খাদ্য পণ্য তৈরি হয়। নিচে কয়েকটি কৃষিজ পণ্যের ব্যবহার আলোচনা করা হলো।

আমজাত খাদ্যসামগ্রী ও ব্যবহার

আমকে ফলের রাজা বলা হয়। বাংলাদেশে যত ফল আছে তন্মধ্যে স্বাদের দিক থেকে আমের অবস্থান প্রথম। আম নাভিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল। এশিয়ায় বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ এবং আফ্রিকার অনেক দেশেই আম উৎপাদন হয়। তবে উৎপাদনের দিক থেকে ভারত প্রথম স্থান দখল করে আছে। আর বাংলাদেশের স্থান অষ্টম। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায়ই কমবেশি আম জন্মে। তবে বেশি আম উৎপাদনকারী জেলাগুলো হচ্ছে- বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও খুলনা। মোট আমের শতকরা ৮০ ভাগের বেশি বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় উৎপাদন হয়।

কাঁচা আম, পাকা আম প্রক্রিয়াজাতকরণ করে আমের মোরক্বা, আমের চাটনি, আমের আচার, আমচূর, আমসসু, পাকা আমের বোতলজাত ভুস ইত্যাদি মুখরোচক খাদ্য তৈরি হচ্ছে।

নারিকেলজাত দ্রব্য ও ব্যবহার

নারিকেল একটি অর্ধকারী ও তেলজাতীয় ফসল। নারিকেল গাছ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের ফলের ভিতরের অংশ মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং তা হতে তেলও পাওয়া যায়। নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে নড়ি, মাদুর প্রস্তুতি তৈরি হয়। নারিকেল গাছের পাতা দ্বারা বাঁটাও তৈরি হয়।

নারিকেলের কচি ফলকে ডাব বলা হয়। ডাবের পানি সুস্থানু এবং পুষ্টিকর। রোগীর পথ্য হিসাবেও ডাবের পানির ব্যবহার হয়। উপর্যুক্ত অঞ্চলের লোকেরা তরকারিতে নারিকেলের শাস ব্যবহার করেন। আর শীর, পারেস, মিষ্টি ইত্যাদি তৈরিতে বাংলাদেশের অনেক পরিবারেই নারিকেল ব্যবহার করে। নারিকেল হতে মাথায় দেওয়ার এবং খাওয়ার তেল তৈরি করা হয়। গ্রিসারিণ সাবান ও অন্যান্য কসমেটিকস তৈরিতেও নারিকেল ব্যবহার করা হয়।

নারিকেলের ছোবড়া

বাংলাদেশে সারা বছরই প্রচুর পরিমাণে নারিকেল উৎপন্ন হয়। নারিকেল উৎপাদনের সাথে নারিকেলের ছোবড়াও প্রচুর পাওয়া যায়। নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে নানা গৃহস্থালি বস্তু তৈরি হয়।

যেমন— খাটের জাজিম, ওয়ালম্যাট, পাপোশ, রশি ইত্যাদি।

শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে কৃষি দ্রব্যাদি ব্যবহারের ভূমি

বাঁশ ও বাঁশজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার

বাঁশ দ্বাস জাতীয় উদ্ভিদ। এটি গুরুত্বপূর্ণ অকাঠ বনজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ। আসবাবপত্র, গৃহনির্মাণ ও গৃহ সজ্জার কাজে প্রাচীনকাল থেকেই কাঠের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো বাঁশকে পারিবারিক বা গৃহস্থালির নানান কাজে ব্যবহার করা হয়। গৃহনির্মাণ ও গৃহসামগ্রী থেকে তরু করে বৃহৎ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে পর্যন্ত এর ব্যবহার বিস্তৃত। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বাঁশ থেকে কাগজ, পার্টিকেল বোর্ড, প্রাইবোর্ড, চেউটিন এমনকি প্যানেল পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে। প্রাচীনকাল থেকেই বাঁশ পাতলা করে চেরাই করে চাটাই, ডোল, বীম, আড়, ঘরের খুটি, খেলনা, বান্দ্যঘঞ্জ, টুকরি, ঝুড়ি, কুলা, মাছ ধরার ধীঢ়া, পলো ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা হয়।



চিত্র : নারিকেলের ছোবড়া



চিত্র : বাঁশ

আধুনিক বিশ্বে দেশে ও বিদেশে বাঁশের হস্ত ও কুটির শিল্পের প্রভৃতি উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে বাঁশ থেকে স্বাস্থ্যকর লেভিনেটেড বাঁশের মেঝে ও দেওয়ালকভার, মাদুর, কুশন, সিটকভার এমনকি পাদুকা পর্যন্ত তৈরি সম্ভব হচ্ছে।

বাঁশ শিল্পের শ্রেণি বিভাগ

বাঁশ শিল্পকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা :

- ১। কাগজশিল্প
- ২। নির্মাণশিল্প
- ৩। সুন্দর হস্তশিল্প

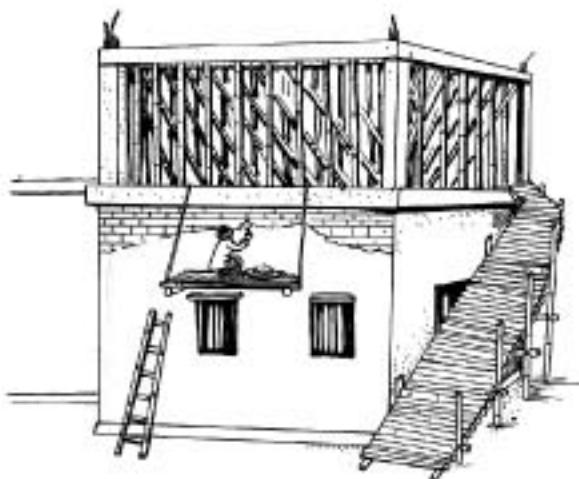
কাগজ শিল্প

মূলবাঁশ কাগজ শিল্পের অন্য বিশেষ উপযোগী। মূলবাঁশের তৈরি কাগজের মণ দিয়ে উন্নত মানের কাগজ তৈরি হয়। কাগজের উপজাত হিসাবে রেয়েনও প্রস্তুত হয়। বাংলাদেশের নানা জায়গায় কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ বাঁশই এই শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হয়। কাগজ ছাড়াও বাঁশ থেকে পার্টিকেল বোর্ড, প্রাইবোর্ড, ফ্রেকবোর্ড বাঁশের চেউটিন, প্যানেল বোর্ড ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

নির্মাণশিল্প

বিভিন্ন নির্মাণ শিল্পেও বাঁশ ব্যবহৃত হয়। নির্মাণশিল্পের মধ্যে গৃহ বা দালান কোঠা নির্মাণই প্রধান। বাঁশ গ্রামীণ গৃহ নির্মাণের বিভিন্ন কাজ ঘেমন খুঁটি দেওয়া ঘরের বেড়া দেওয়া, বীম বা আড় তৈরি ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। বড় বড় দালান কোঠা নির্মাণেও বাঁশ ব্যবহৃত হয়।

আরও অনেক নির্মাণশিল্প ঘেমনে বাঁশ অতীতকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ঘেমন আমের খাল বা অপ্রশস্ত নদীতে সেতু বা সাঁকো তৈরিতে, নৌকার মাঞ্জল, ছই, পাটাতন, গুরুর গাঢ়ি, ঠেলাগাঢ়ি, জোয়াল, ঘানি ও মাড়াই কল ইত্যাদি। বৈদ্যুতিক খুঁটি, মাছ ধরার চাঁই, খাড়া জাল ইত্যাদি তৈরিতে বাঁশ ব্যবহৃত হয়। ধর্ম জালের দণ্ড, সবজির গাছ বেয়ে উঠার জন্য মাচা, নৌকার হাল ও দাঁড়ের দণ্ড, বকুলার মঝ, তোরণ এসব তৈরিতে বাঁশ ব্যবহৃত হচ্ছে নিয়মিত। পাহাড়ি এলাকায় বাঁশ ধারা কূপ তৈরি করা হয়, যাকে বলা হয় আর্টেজীয় কূপ। এই কূপের সাহায্যে পাহাড়ি এলাকায় জমি চাষ করা হয়।



চিত্র : দালানকোঠা নির্মাণে বাঁশ

সূন্দর হস্তশিল্প

সূন্দর হস্তশিল্পেই অধিক হারে বাঁশ ব্যবহৃত হয়। কেননা এই শিল্পের দ্রব্যজাত তৈরি ও ব্যবহার বেড়ে গেছে। সমস্ত প্রকার বাঁশ বয়ন সূন্দর হস্তশিল্পেরই অন্তর্ভূক্ত। এই শিল্পের অধীনে তৈরি হয় চাটাই, ডোল, কুলা, খুড়ি, ঘাকা, চালনি, খাচা, খেলনা, কলম, টুপি, ফুলদানি, লাইট স্ট্যান্ড, লাঠি, কাঠি এমনকি দাঁত খিলান, বুকসেলফ ইত্যাদি।



চিত্র : টুকরি



চিত্র : কুলা



চিত্র : পলো



ঝুঁধি বাঁশ

চিত্র : বাঁশের চেয়ার ও সোফা

বাঁশ শুধু কাগজ তৈরি বা গৃহ সামগ্রী তৈরির কাজেই ব্যবহার হয় না। ঝুঁধি তৈরির কাজেও বাঁশ ব্যবহার হয়। বাঁশের অনেক জাত আছে। তনুধে সোনালি বাঁশ বিভিন্ন রোগের কাজে লাগে, কাশি, শোথ রোগ, প্রস্তাবজনিত রোগ, ফৌড়া পাকা ইত্যাদি মানুষের সাধারণ রোগ। এই রোগগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার মহোবধ হচ্ছে এই সোনালি বাঁশ। ঝুঁধি হিসেবে বাঁশের শীষ, পাতা ও মূল ব্যবহার করা হয়। অবশ্যই এগুলো কবিরাজের পরমর্শমত ঝুঁধি তৈরি ও ব্যবহার করতে হবে।

কাজ : শিঙ্কার্ধীরা ষেখানে ঝুঁড়ি তৈরি করা হয় এমন স্থান পরিদর্শন করবে এবং ঝুঁড়ি তৈরির ধাপগুলো লিখে আনবে। পরবর্তীতে হাতে কলমে নিজেরা করবে।

বেত ও বেতের ব্যবহার

বেত কাঠ ও বাঁশের মতো প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ। বাংলাদেশের বনে জঙ্গলে অনেক ধরনের বেত পাওয়া যায়। বেত উৎপাদনের জন্য কৃষি ভূমি ব্যবহার করা হয়না। সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবেই প্রচুর বেত উৎপন্ন হয়। বেত, তাল ও নারিকেল গোত্রীয় কিন্তু কাঁটাযুক্ত লতা ও গুল্মজাতীয় উদ্ধিদ। এর ফল হয়। যা বেত ফল নামে পরিচিতি।



বেত শিল্প

বেতের শিল্পগুলোর জন্যই বেত সবার নিকট সুপরিচিত। বেতের কাণ্ড বেত শিল্পে ব্যবহার করা হয়। বেতের কাণ্ড শক্ত বটে কিন্তু নমনীয়ও চেরাইযোগ্য। এ থেকে আকর্ষণীয় ও আভিজ্ঞাত্যবহনকারী শিল্পে প্রস্তুত করা হয়।

বেতের ফার্নিচার তৈরি

বেতের তৈরি ফার্নিচার একেবারেই প্রাকৃতিক। এতে কোনো প্রকার কৃতিমতা নেই। বেতকে সুতার মতো ব্যবহার করে কোনো শক্ত জিলিসের (রড, বাঁশ) উপর পেঁচিয়ে ফার্নিচার তৈরি করা যায়। আবার বেতের মোট শাখা প্রশাখা শক্তিয়ে শোধন করে শক্ত কাঠামো দাঁড় করিয়ে সোফা, চেয়ার, টেবিল, বুকসেলফ, খাট, দোলনা, মোড়া, ভূক্ত রাখার তাক, কর্ণির সেলফ, ওয়ার্ড্রোবস, রকিং চেয়ার, আরাম কেন্দরা ইত্যাদি ফার্নিচার বা আসবাবপত্র তৈরি করা যায়।

ফার্নিচার তৈরির আগে বেতগুলোকে সাইজ মতো কেটে শোধন করতে হবে। একটি চাড়িতে আনুমানিক হারে বরিক এসিভ ও পানির দ্রবণ তৈরি করে এই দ্রবণে বেত এক সঙ্গাহ ভিজিয়ে রাখলে ভালোভাবে শোধিত হবে। এতে মুগ বা অন্যান্য পোকা-মাকড় আক্রমণ করবে না।

বেতজাত শিল্প প্রতিষ্ঠান

বেতের ব্যবহার ব্যাপক। বেত শিল্পই হচ্ছে গ্রামীণ শিল্প ঐতিহ্য। বেতের শিল্পকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় :

১। হালকা নির্মাণশিল্প

৩। কৃদ্র হস্তশিল্প

২। বুননশিল্প

৪। মিশ্রশিল্প

হালকা নির্মাণশিল্প

বেতের হালকা নির্মাণশিল্প বলতে বোঝায় মোটা বেতের আসবাবপত্র, যা হালকা ভার বহন করতে পারে। হালকা নির্মাণ শিল্পের প্রধান উদাহরণ হচ্ছে- সোফাসেট, চেয়ার, বাটি, পার্টিশন, শেলফ, টেবিল ইত্যাদি। এই শিল্পের যে বেত ব্যবহার করা হয় তা অপেক্ষাকৃত মোটা এবং পরিমাণে বেশি। আর এই বেত ব্যবহারে শিল্প নৈপুণ্যের দরকার হয়ে থাকে। দেশ-বিদেশের অভিজাত মহলে হালকা নির্মাণ শিল্পের দ্রব্যাদির প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এই শিল্পে সাধারণত পোকাবেত, উদমবেত, কদমবেত ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।



চিত্র : বেতের সোফা সেট

বুনন শিল্প

বুননশিল্পে সরু ও নমনীয় বেত ব্যবহার করা হয়। এসব বেত চেরাই করে আরও সরু ফালি পাওয়া যায়। এই সরু ফালিকে বেতি বলা হয়। বাঁধাই ও বুনন কাজে এই বেতি ব্যবহার করা হয়। বুনন শিল্পের মাধ্যমে হালকা নির্মাণ শিল্পকে কারুকার্যময় ও নান্দনিক করা হয়। বুনন শিল্পের জন্য বান্দরিবেত ও জালিবেত ব্যবহার করা হয়।

কৃদ্র হস্তশিল্প

বেতশিল্পের পুরোটাই হস্তশিল্প- কৃদ্র হোক অথবা বড় হোক। নির্মাণশিল্প ও বুননশিল্পের অপর্যোজনীয় অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করে সৌন্দর্যবর্ধক যেসব দ্রব্যাদি হাতে তৈরি করা হয় তাকেই বলে বেতের কৃদ্র হস্তশিল্প। বেতের কৃদ্র হস্তশিল্পের উদাহরণ হচ্ছে খেলনা, ফুলের সাজি, কলমদানি, বেতের ধামা, জুতার র্যাক, মোড়া, ফুলদানি ইত্যাদি।



চিত্র : বেতের ধামা

মিশ্রশিল্প

বেতের সাথে বাঁশ, কাঠ, প্রাস্টিক, নাইলন, সিটল ইত্যাদি মিশ্রণ করে যেসব দ্রব্যাদি তৈরি হয় তাকে বেতের মিশ্রশিল্প বলে। মোটা বেতের অভাব হলে এর স্থলে কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি ব্যবহার করে মিশ্র শিল্প হিসাবে দোলনা, মোড়া, র্যাক, সেলফ, চেয়ার তৈরি করা হয়। আবার সরু বেতের অভাব হলে এর স্থলে নাইলনের বা প্রাস্টিকের বেতি মোটা বেতের সাথে মিশ্রণ করে খাট, বাঞ্জা, সোফা ইত্যাদি তৈরি করা যায়।



চিত্র : মূলদানি



চিত্র : ফুলের সাজি

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ উত্তিদ ও এর ব্যবহার

ষষ্ঠ উত্তিদ

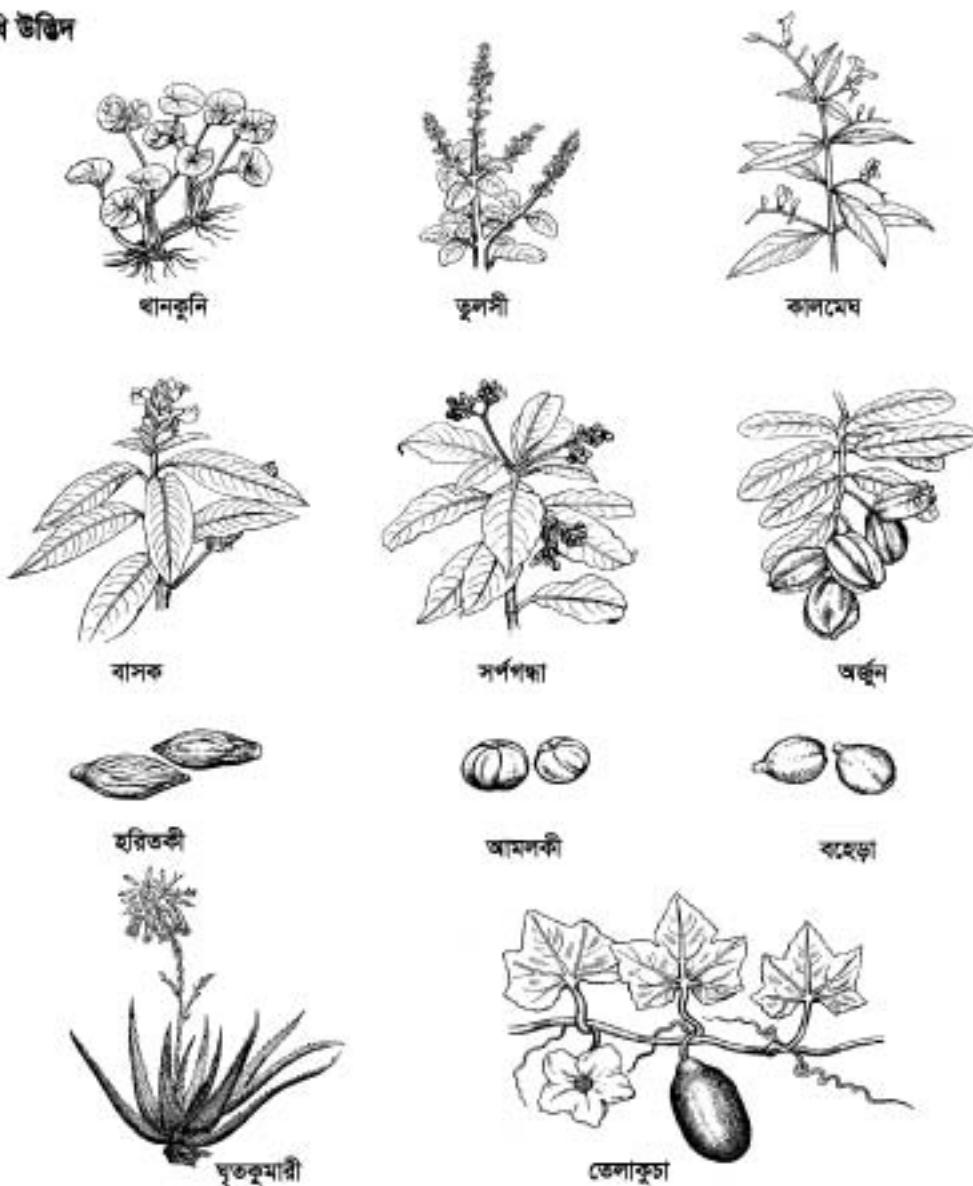
আমাদের চারপাশের পরিবেশে হরেক রকমের উত্তিদ রয়েছে। প্রাচ্যহিক জীবনে আমরা বহুবিধ উপায়ে এসব উত্তিদ ও এর উৎপাদিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে থাকি। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনের সকল চাহিদা মোটানোর জন্য আমরা বিশাল উত্তিদরাজির উপর নির্ভরশীল। এসম্পর্কে ইতোমধ্যে আমরা প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমরা দেখেছি বা করেছি বাড়িতে বিশেষ করে ছোটদের সর্দি-কাশি হলে তুলসী পাতার রসের সাথে কয়েক ফেঁটা মধু মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। এর ফলে তাদের সর্দি-কাশি উপশম হয় এবং তারা আরাম পায়। হঠাতে করে কারও শরীরের কোনো অংশ কেটে গেলে গাঁদা ফুলের পাতা বা দুর্বাঘাস ভালো করে ধূয়ে শীলপাটায় বেটে ক্ষতহন্তনে লাগিয়ে দিলে সাথে সাথে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। দুই-তিন দিনের মধ্যে ক্ষত শকিয়ে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এভাবে পরিবেশের যেসব উত্তিদ আমাদের রোগ ব্যাধির উপশম বা নিরাময়ের ব্যবহার হয়, সেগুলোকেই ষষ্ঠ উত্তিদ বলা হয়।

ষষ্ঠ উত্তিদ শনাক্তকরণ

আমাদের দেশ এক সময় ষষ্ঠ উত্তিদে সহজ ছিল। খাট-ঘাট, পথ-প্রাতর, বন-জঙগল সর্বত্র অসংখ্য ষষ্ঠ উত্তিদে ভরপুর ছিল। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে ভূমির বহুবিধ ব্যবহার বেড়েছে। এছাড়া অভ্যন্তর, অবহেলা ও অযত্নের কারণে বর্তমানে এসব ষষ্ঠ উত্তিদের প্রধান উৎপত্তিহীল প্রাকৃতিক উৎস বনভূমি কয়ে যাওয়ায় ঐসব মূল্যবান বৃক্ষ সম্পদ ছাঁস পেয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে

গেছে। এখনও আমাদের দেশের আনাচে-কানাচে যথেষ্ট ঔষধি উদ্ভিদ রয়েছে। সেগুলো আমরা চিনি না। এমনকি সেগুলোর ব্যবহার ও গুণাগুণ সম্পর্কেও আমাদের তেমন কোনো ধারণা নেই। চারপাশের এসব ঔষধি উদ্ভিদসমূহ শনাক্ত করতে পারা এবং সেগুলোর ব্যবহার ও গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। এর ফলে আমরা আমাদের দেশের আগামর জনসাধারণের রোগব্যাধি নিরাময়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারব।

ঔষধি উদ্ভিদ



কাজ : শিক্ষক নমুনা ঔষধি উদ্ভিদ শ্রেণিতে নিয়ে আসবেন, সেগুলো শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে পর্যবেক্ষণ ও শনাক্ত করবে। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ঔষধি উদ্ভিদের নামের ভালিকা তৈরি করবে।

ঔষধি উত্তিদ ও এর ব্যবহার

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকে রোগব্যাধি উপশামে বিভিন্ন রকম উত্তিদ ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছে। ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলে এসব উত্তিদকে ঔষধি বা ভেষজ উত্তিদ বলা হয়। নিম্নে কয়েকটি ভেষজ উত্তিদের পরিচিতি ও ব্যবহার আলোচনা করা হলো।

- ১। থানকুনি : থানকুনি একটি ছোট লতানো বীরুৎ জাতীয় উত্তিদ। এর প্রতি পর্ব থেকে নিচে মূল এবং উপরে শাখা ও পাতা গজায়। পাতা সরল বৃক্ষের মতো, একান্তর।

ব্যবহৃত অংশ : সমস্ত উত্তিদ

ব্যবহার : ছেলে মেয়েদের পেটের অসুখ, বিশেষ করে বদহজম ও আমাশয় রোগ নিরাময়ে থানকুনি খুব বেশি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া থানকুনি আয়ুবর্ধক, শৃঙ্খিবর্ধক, আমরণ নাশক, চর্মরোগনাশক।

- ২। তুলসী : তুলসী অতিপরিচিত বীরুৎ জাতীয় উত্তিদ। এটি সাধারণত ৩০ সেমি হতে ১ মিটার পর্যন্ত উচু হয়ে থাকে। পাতা সরল, প্রতিমুখ, ডিখাকার, সুগন্ধযুক্ত। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহৃত অংশ : পাতা

ব্যবহার : সাধারণ সর্দি-কাশিতে তুলসী পাতার রস বেশ উপকারী। ছোট ছেলেমেয়েদের তুলসী পাতার রসের সাথে আদার রস ও মধু মিশিয়ে খাওয়ানো হয়।

- ৩। কালোমেষ : এটি একটি ছোট বীরুৎ জাতীয় উত্তিদ। সাধারণত ২০ সেমি থেকে ১ মিটার উচু হয়। পাতা সরল, প্রতিমুখ, কিছুটা লম্বা ধরনের। পাতা তিতা। বর্ধার শেষ হতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহৃত অংশ : সমস্ত পাতা, বিশেষ করে পাতা।

ব্যবহার : ছোট ছেলে-মেয়েদের জুর, অজীর্ণ ও লিভার দোষে এর রস একটি অত্যন্ত ভালো ঔষধ।

- ৪। বাসক : গুল্জ জাতীয় উত্তিদ। পাতা সরল, প্রতিমুখ, লম্বাকৃতি।

ব্যবহৃত অংশ : পাতার নির্যাস

ব্যবহার : কাশি নিরাময়ে অধিক ব্যবহৃত হয়। সম্পরিমাণ, আদার রস ও মধুসহ বাসক পাতার রস থেলে কার্যকরী হয়।

- ৫। সর্পগঢ়া : সর্পগঢ়া একটি বহুবর্ষজীবী বীরুৎ। প্রতিপর্বে সাধারণত তিটি পাতা থাকে। বর্ধায় ফুল ও ফল হয়। ফল পাকলে কালো হয়।

ব্যবহৃত অংশ : মূল বা ফলের রস।

ব্যবহার : সর্পগঢ়ার মূলের বা ফলের রস উচ্চ রক্তচাপে ব্যবহৃত হয়। পাগলের চিকিৎসায়ও এটি ব্যবহৃত হয়।

- ৬। অর্জুন : অর্জুন মাঝারি থেকে বৃহৎকৃতির বৃক্ষ। কাণ সরল উন্নত, মসৃণ এবং আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। গাছ থেকে সহজে ছাল উঠানো যায়। পাতা সরল, লম্বা, ডিখাকৃতির। ফুল হলুদাভ শুভ্রাকৃতির, উগ্র গন্ধবিশিষ্ট।

ব্যবহার অংশ : পাতা, ছাল, ফল ও কাঠ।

তেজ ব্যবহার : কাঁচা পাতার রস আমাশয় রোগ উপশমে ব্যবহৃত হয়। অর্জুনের ছাল ভালোভাবে বেটে তার রস চিনি ও দূধের সাথে প্রত্যহ সকালে সেবনে যাবতীয় জনরোগ আরোগ্য হয়। নিম্ন রক্তচাপ থাকলে অর্জুনের ছাল সেবনে উপকার হয়। ছালের রস সেবনে উদরাময় ও অর্শ রোগের উপশম হয়। রক্ত আমাশয়ে অর্জুনের ছালের চূর্ণ দূধের সাথে মিশিয়ে খেলে নিরাময় হয়। অর্জুনের ছালের মিহি পেঁড়া মধুর সাথে মিশিয়ে মুখে লাগালে মেচতার দাগ মিলিয়ে যায়।

- ৭। **হরিতকী :** বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা সরল, একান্তর, উপবৃত্তাকার, সবৃত্তক। ফুল শ্রেতবর্ণ ও ছোট হয়। ফল লম্বাকার হালকা খাজযুক্ত।

ব্যবহার্য অংশ : ফল ও কাঠ

তেজ ব্যবহার : আয়ুর্বেদিক ঔষধ ত্রিফলার অন্যতম ফল হরিতকী। হরিতকী ফল চূর্ণ করে একটু লবণ মিশিয়ে সেবন করলে অর্শরোগ নিরাময় হয়। হরিতকী চূর্ণ পাইপে ভরে ধূমপান করলে হাঁপানি উপশম হয়। যে কোনো ক্ষতে হরিতকী পোড়া ছাইয়ের সাথে মাখন মিশিয়ে লাগালে ঘা সেরে যায়। চিনি ও পানির সাথে হরিতকী চূর্ণ ব্যবহার করলে চোখ উঠা ভালো হয়। কাঁচা ফল আমাশয় এবং পাকাফল রক্তশূন্যতা, পিণ্ডরোগ, জনরোগ, গেটেবাত ও গলা ক্ষতে ব্যবহার্য। ফলচূর্ণ দণ্ডরোগ উপশমে ব্যবহৃত হয়। হরিতকী বলবৃক্ষিকারক, জীবনীশক্তি বৃক্ষিকারক ও বার্ধক্য নিবারক।

- ৮। **আমলকী :** মাঝারি আকারের বৃক্ষ। পাতা যৌগিক, উপগত্ব বিপরীতভাবে বিন্যস্ত। ফুল ছোট, সবুজাভ হলুদ। ফল রসাল, মাংসল, সবুজ, গোলাকৃতি, মুখরোচক ও উপাদেয়। মার্চ থেকে মে মাসে ফুল আসে।

ব্যবহৃত অংশ : ফল

তেজ ব্যবহার : আমলকী পাতার রস আমাশয় প্রতিষ্ঠেধক এবং টনিক। ফল ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এবং ত্রিফলার একটি ফল। ফলের রস যকৃত, পেটের পীড়া, অজীর্ণতা, হজম ও কাশিতে বিশেষ উপকারী। আমলকীর ফল ত্রিফলার সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করলে রক্তহীনতা, জনিস, চর্মরোগ, ডায়াবেটিস, চুল পড়া, প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

- ৯। **বহেড়া :** এটি একটি শাখা-প্রশাখাযুক্ত বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। পাতা একক, বৈঁটা লম্বা। ফুল সবুজাভ সাদা, ডিখাকৃতির। ফলে একটি করে বীজ থাকে। ফল গোলাকৃতির বা ঈমৎ লবাটে।

ব্যবহৃত অংশ : ফল

তেজ ব্যবহার : ত্রিফলার অন্যতম ফল বহেড়া। বীজের শীস (বাদামের মতো) দুইএকটি করে দুঃক্ষেত্র অন্তর এবং দিনে দুইটি করে চিবিয়ে খেলে হাঁপানি রোগ আরোগ্য হয়। বহেড়া চূর্ণ সকাল-বিকাল পানিসহ খেলে উপকার হয়। ফল পেটের পীড়া, অর্শ, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া ও জ্বরে ব্যবহার্য। ফল হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, নাসিকা, গলার রোগ ও অজীর্ণতার ভালো ঔষধ। বীজ থেকে প্রাণ তেল মাঝে ঠাণ্ডা রাখে এবং চুল পড়া বন্ধ করে।

১০। দৃত কুমারী : বীরুৎ জাতীয় উদ্ধিদি | পাতা লম্বা কিনারা খাজা কাটা, রসাল |

ব্যবহার্য অংশ : পাতা থেকে নির্গত ঘন পিছিল রস |

ভেষজ ব্যবহার : পাতা থেকে নির্গত ঘন পিছিল রস কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের ফলপ্রসূ ঔষধ | এটি শুধুমান্দা, জড়িস, লিউকোমিয়া, অর্থরোগ, কাটা-পোড়া ও ক্ষতের চিকিৎসায় ফলপ্রসূ অবদান রাখে | প্রসাধন দ্রব্যে এর মিশ্রণে প্রসাধনের মান উন্নত হয় |

১১। তেলাকুচা : এটি সতানো বীরুৎ জাতীয় উদ্ধিদি | বন বাদাড়ে আপনা-আপনি এ গাছ, জন্মাতে দেখা যায় |

ব্যবহার্য অংশ : কাণ্ড ও পাতা

ভেষজ ব্যবহার : এ উদ্ধিদের কাণ্ড ও পাতার নির্যাস ভায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয় | এর নির্যাস সর্দি, জ্বর, হাপনি ও মূর্ছারোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় | চর্মরোগে এর পাতা বাটার প্রলেপ বেশ উপকারী |

কাজ : ঔষধি উদ্ধিদের নাম ও ব্যবহার নিয়ে দলীয় আলোচনা উপস্থাপন কর |

ঔষধি গুণসম্পন্ন বিভিন্ন উদ্ধিদের প্রয়োজনীয়তা

অতি প্রাচীনকাল থেকে ঔষধি গুণসম্পন্ন বিভিন্ন প্রকার উদ্ধিদি রোগ নিরাময় উপশমে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে | আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতির পিছনে ঔষধি উদ্ধিদের গুরুত্ব অপরিসীম | আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষের নিকট ঔষধি উদ্ধিদের মাধ্যমে রোগ নিরাময় কুবই জনপ্রিয় | কারণ ঔষধি উদ্ধিদের চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজলভ্য, সন্তা এবং তেমন কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই | এ কারণে বর্তমানে ঔষধি গুণসম্পন্ন আয়ুর্বেদী ও ইউনানি চিকিৎসা ব্যবস্থাও আমাদের দেশে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে |

আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার উৎকর্ষ চরমে পৌছালেও মানুষ আবার সেই প্রাচীন ঔষধি গুণসম্পন্ন উদ্ধিদের ঔষুধ হারা চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা উপলক্ষ্মি করেছে | পৃথিবীর বহুদেশ ভেষজ ঔষধের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যাপক গবেষণা শুরু করেছে | বাংলাদেশে ভেষজ উদ্ধিদের ব্যাপক চাষাবাদ ও যত্নের মাধ্যমে ঔষধশিল্পের ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের সম্ভাবনা কুবই উজ্জ্বল |

কাজ : ‘রোগ নিরাময়ে ঔষধি গাছপালা’ এ বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীরা একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবে |

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোম পোকা ধানের দুধ সৃষ্টির সময় আক্রমণ করে ?

- | | |
|---------------|----------------|
| ক. মাজরা পোকা | খ. পামরিপোকা |
| গ. গাঙ্কিপোকা | ঘ. চুঙ্গী পোকা |

২. গাজী ধানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

- গাছ খাটো হয়।
- পাতা হেলানো থাকে
- ফল বেশি হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৩. কোনটি পাটের কাণ্ড পচা রোগের লক্ষণ ?

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| ক. কাণ্ডে কালো বেষ্টনীর মতো দাগ থাকে। | খ. কাণ্ডে গাঢ় বাদামি দাগ হয়। |
| গ. আক্রমণ স্থান ফেটে যায়। | ঘ. কাণ্ডে কালচে দাগ হয়। |

নিচের উদ্ধীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

তাসফি মির্যা একজন পাট চাষি। তিনি এ বছর তার দুই খণ্ড জমিতে সি-সি-৪৫ ও চিন সুরা শিল জাতের পাটের চাষ করেন। তিনি সিসি-৪৫ জাতের পাট আখাড় মাসে ও চিন সুরা শিল জাতের পাট ভান্ড মাসে কাটেন। তিনি প্রতি খণ্ড থেকে ১৫০০ টি করে আঁটি পান। পাট জাগ দেওয়ার সময় তিনি ইউরিয়া সার ব্যবহার করেন।

৪. তাসফি মির্যা দুই খণ্ড জমির পাট ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাটার কারণ-

- ফসলের পরিপন্থতা ভিন্নতা হওয়ায়
- জমির উর্বরতার পার্থক্যের জন্য
- ফসলের জাতের ভিন্নতা থাকায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৫. তাসফি মিয়ার পাট পচানোর জন্য কত কেজি ইউরিয়া প্রয়োজন?

ক. ১৫ কেজি

খ. ২০ কেজি

গ. ২৫ কেজি

ঘ. ৩০ কেজি

সূজনশীল প্রশ্ন

১. আয়শা বেগম বিল অঞ্চলে উচু ভিটে বাড়িতে বসবাস করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়ির আঙিনায় ৫ শতক জমিতে পালংশাক চাষ করে সফলতা লাভ করলেন। এ সফলতার পর তিনি বিলে অবস্থিত তার জমিগুলোর উচু আইলেও পালংশাক চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

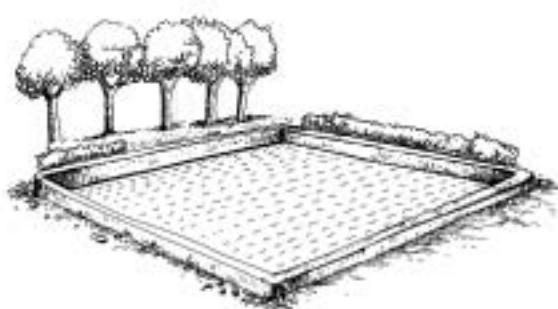
ক. পালংশাকের একটি জাতের নাম সেৰে।

খ. পালংশাক চাষে 'ইউরিয়া সার' উপরি প্রয়োগের কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. আয়শা বেগম জমিতে কী পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করেছিলেন নির্ণয় কর।

ঘ. আয়শা বেগমের পরিকল্পনা তার কৃষি কার্যক্রমকে কীভাবে প্রভাবিত করবে বিশ্লেষণ কর।

২.



চিত্র - ক



চিত্র - খ

- ক. সমন্বিত চাষ কাকে বলে ?
- খ. সমন্বিত চাষে ভূমির ব্যবহার হিঁতে হয় কীভাবে ? ব্যাখ্যা কর।
- গ. চির ক ও খ-এ উল্লিখিত পদ্ধতির মধ্যে কোনটির উৎপাদন স্রষ্ট কম কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. পরিবারের আয় ও পৃষ্ঠি বৃক্ষিতে চিরে উল্লিখিত কোন পদ্ধতিটি উন্নত-যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।
৩. মেঘনার তীরের বাসিন্দা কৃষক তোরাব তার দুই একর জমিতে পাট চাষ করলেন। কিছুদিন পর তার পাটের জমিতে তরোযুক্ত এক ধরনের পোকার ব্যাপক আক্রমণ হলো। তোরাব বিচলিত না হয়ে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোকা দমন করলেন। ফলে তার জমিতে পাটের আশাতীত উৎপাদন হওয়ায় পরবর্তী বছর এলাকার অন্যান্য কৃষকরা তাদের জমিতেও পাট চাষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।
- ক. পাটের জাত উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কী ?
- খ. স্থানীয় মাত্রার চেয়েও পাটের বীজ বেশি বোনার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. কৃষক তোরাব আলীর জমিতে পোকা দমন পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. কৃষকদের সিদ্ধান্ত ঐ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কতটুকু সুফল বয়ে আনবে তা মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম অধ্যায়

বনায়ন

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বনভূমিতে গাছলাগালো, পরিচর্যা ও সংরক্ষণকে বলা হয় বনায়ন। বনায়নের ফলে বনভূমি হতে সর্বাধিক বনজ দ্রব্য উৎপাদিত হয়। বসতবাড়ি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সড়ক ও বাঁধের ধার, পাহাড়ি অঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিকল্পিত উপায়ে সৃজিত বনায়নকে বলা হয় সামাজিক বনায়ন।

বাস উপযোগী পরিবেশ তৈরি ও তা সংরক্ষণে বনের ভূমিকা অপরিসীম। কোনো দেশের বা অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে বড় বড় বৃক্ষরাজি ও লতা-গুল্মের সমন্বয়ে গড়ে উঠা বনকেই বনভূমি বলা হয়। এসব বনভূমি কখনো প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয় ও গড়ে উঠে। আবার কখনো মানুষ তার প্রয়োজনে বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে সৃষ্টি করে থাকে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় একটি দেশের মোট আয়তনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের দেশে বনভূমির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। সরকারি হিসাব মতে বর্তমানে আমাদের দেশের বনভূমির পরিমাণ মাঝে ১৭ ভাগ। ইউনেস্কোর মতে বর্তমানে আমাদের দেশের বনভূমির পরিমাণ শুধুমাত্র ১০ ভাগ। এ অধ্যায়ে আমরা আমাদের দেশের বনাঞ্চলের বিস্তৃতি, ধরণ এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব। এছাড়াও বন সংরক্ষণ বিধি, বন নার্সারি, বন নার্সারির বীজ, বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহ এবং উপকূলীয় বনায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।



চিত্র : উপকূলীয় বন

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- বাংলাদেশের বনাঞ্চলের ধরন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশের বনাঞ্চলের নাম উল্লেখ করতে পারব।
- বিভিন্ন বনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- বন সংরক্ষণ বিধি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বন সংরক্ষণ বিধির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বন নার্সারি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বন নার্সারির বীজ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- বন নার্সারি তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বৃক্ষ কর্তনের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তত্ত্ব বা কাঠ সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- গোল কাঠ বা তত্ত্ব পরিমাপ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উপকূলীয় বনাঞ্চলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উপকূলীয় বনাঞ্চলের জন্য ব্যবহৃত গাছের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- উপকূলীয় বনাঞ্চলের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারব।

প্রথম পরিচেনা

বাংলাদেশের বনাঞ্চলের বিস্তৃতি

বন একটি দেশের মূল্যবান সম্পদ। আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি হিসাব মতে বর্তমানে বাংলাদেশের মোট বনভূমির আয়তন প্রায় ২২.৫ লক্ষ হেক্টর। বনভূমির এ পরিমাণ দেশের মোট ভূমির শতকরা ১৭ ভাগ। এই বন সারাদেশে সমানভাবে বিস্তৃত নয়। অধিকাংশ বনভূমি দেশের পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ খুবই কম।

অবস্থান ও বিস্তৃতিভেদে বাংলাদেশের বনাঞ্চলের ধরন

বনভূমির অবস্থান ও বিস্তৃতি অনুসারে বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে প্রধানত পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে।
ভাগগুলো হলো-

১। পাহাড়ি বন ২। সমতলভূমির বন ৩। ম্যানগ্রোভ বন ৪। সামাজিক বন ৫। কৃষি বন

নিচের ছকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বনাধূনির পরিমাণ দেখানো হলো-

অবস্থান ও বিস্তৃতিভেদে বাংলাদেশের বনাধূনে (লক্ষ হেক্টর)

বনের ধরন	প্রাকৃতিক বন	কৃতিম বা সৃজিতবন	মোট
পাহাড়ি বন	১১.০৬	২.১০	১৩.১৬
ম্যানগ্রোভ বন	৬.১৬	১.৩৪	৭.৫০
সমতল ভূমির বন	০.৮৭	০.৩৬	১.২৩
গ্রামীণ বন	-	২.৭০	২.৭০

বনাধূনের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

পাহাড়ি বন

আমাদের দেশের পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ি বন অবস্থিত। বাংলাদেশের বন এলাকার অর্ধেকেরও বেশি এলাকা জুড়ে রয়েছে পাহাড়ি বন। কর্কবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, সিলেট, হবিগঞ্জ ও মৌলভী বাজারে এ বন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

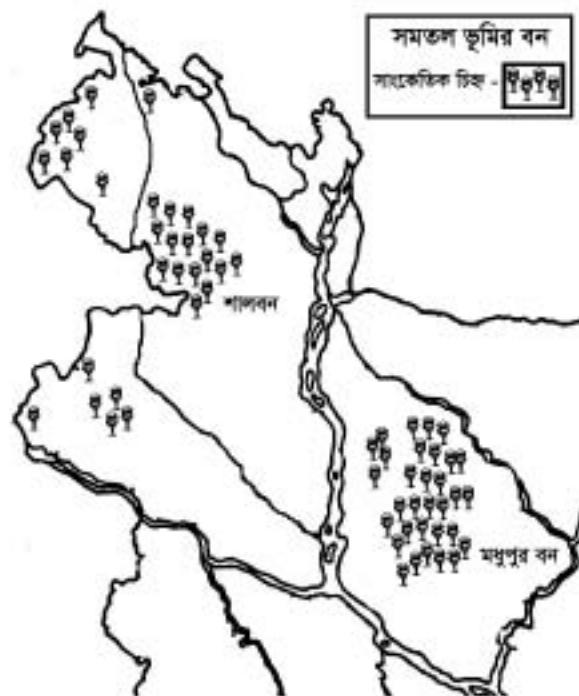
বাংলাদেশের প্রধান পাহাড়ি গাছ হচ্ছে- গর্জন, রাজকড়ই, চাপালিশ, তেলসুর, কড়ই, গামার, চম্পা, জারুল, সেন্টন, বন্য আম প্রভৃতি। পাহাড়ি বন এলাকায় নানা ধরনের বাঁশও জন্মে থাকে। এসব বাঁশের মধ্যে বরাক, মূলী, উরা, মরাল, তল্লা, কেইটা, নালা প্রভৃতি। পাহাড়ি বনাধূনে হাতি, বানর, তকর, ভালুক, বনমুরগি, শিয়াল, নেকড়ে, কাঠবিড়ালি প্রভৃতি বন্য প্রাণী বাস করে। বিভিন্ন রকমের পাখি ও কীট পতঙ্গ পাহাড়ি বনাধূনে দেখা যায়। বড় বড় গাছপালা ছাড়াও লতা-গুল্মসহ অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ পাহাড়ি বনাধূনে জন্মে থাকে। দেশের আবহাওয়া, জলবায়ু ও পরিবেশের উপর পাহাড়ি বনের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এ বনের পরিমাণ ১৩.১৬ লক্ষ হেক্টর।



চিহ্ন : পাহাড়ি বন

সমতলভূমির বন

বৃহত্তর ঢাকা, টাঙ্গাইল, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লা অঞ্চলের বনকে সমতল ভূমির বন বলে। এ বনের প্রধান প্রধান বৃক্ষ শাল ও গজারি, এছাড়া কড়ই, রেইনট্রি, জাবুল ইত্যাদি বৃক্ষও এ বনে জন্মে থাকে। সমতলভূমির প্রাকৃতিক বনের কাছাকাছি বসতি থাকায় এ বনের উপর মানুষের চাপ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক বনের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেক স্থান বনশূন্য হয়ে পড়েছে। সরকারিভাবে এসব এলাকায় সামাজিক বনায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। জনগনের অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে কোনো কোনো স্থানে সামাজিক বনায়ন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এ বনের শাল কাঠ খুবই উন্নতমানের হয়ে থাকে। গৃহ নির্মাণ, আসবাবপত্র তৈরি ও অন্যান্য নির্মাণ কাজে শাল কাঠের ব্যবহার করা হয়। এ বনের বন্য প্রাণী প্রায় খবস হয়ে গেছে। বর্তমানে কোথাও কোথাও অল্প সংখ্যক মেকড়ে, হরিণ, বানর, সাপ, ঘূঢ়, মোয়েল ও শালিক দেখা যায়। এ বনের মোট পরিমাণ ১.২৩ লক্ষ হেক্টর।



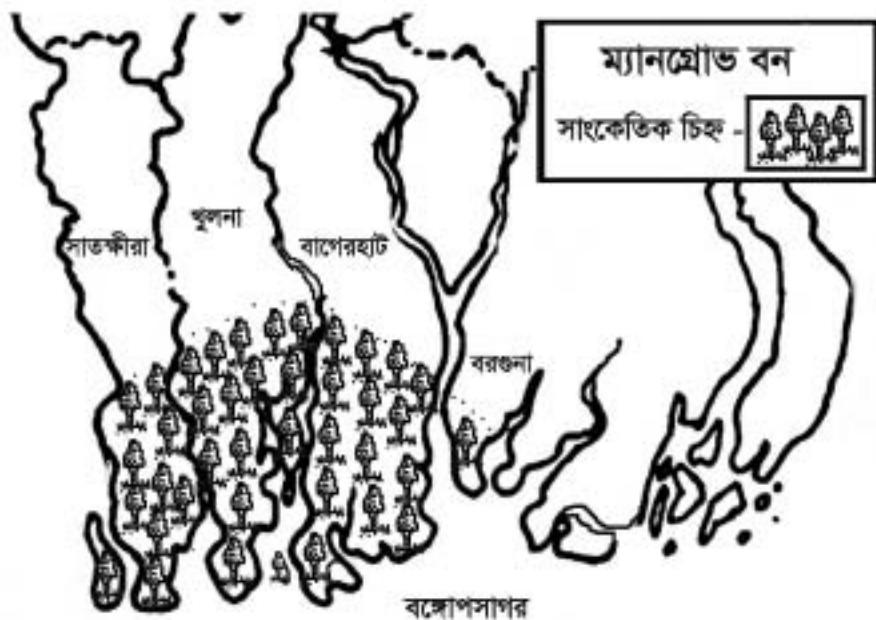
চিত্র : সমতলভূমির বন

ম্যানগ্রোভ বন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এ বন অবস্থিত। প্রায়ই সামুদ্রিক জোয়ারের পানিতে এ বন প্রাপ্তি হয় বলে একে লোনা পানির বনও বলা হয়। খুলনা, সাতক্কীরা ও বাগেরহাট জেলার দক্ষিণের বিস্তৃত এলাকা ম্যানগ্রোভ বনে পরিচিত। এ বনের প্রধান বৃক্ষ সুন্দরি। সুন্দরি বৃক্ষের নামানুসারে এ বনের নামকরণ করা হয়েছে সুন্দর বন। এ বনের অধিকাংশ উদ্ধিদের উর্ধ্বমুখী বায়বীয় মূল রয়েছে। যার সাহায্যে এরা খসন ত্রিয়ার জন্য অঙ্গীজন প্রাপ্ত করতে পারে। কারণ জলাবদ্ধ মাটি থেকে সাধারণ মূলের পক্ষে অঙ্গীজন প্রাপ্ত সম্ভব নয়। এ বনের গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষ হলো- গেওয়া, গুরান, পতুর, কেওয়া, বাইন, কাকড়া, গোলপাতা ও মোটা বেত। বিশ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার এ বনে বাস করে। চিতাবাঘ, হরিণ, বানর, অজগর, বিচিত্র

রাকমের পাখি ও কীট-পতঙ্গ এ বনে বাস করে। সুন্দর বনের নদী ও খালে কৃমির ও অন্যান্য জলজ প্রাণী বাস করে। প্রতি বছর সুন্দরবন থেকে প্রচুর মধু ও মোম পাওয়া যায়। সুন্দর বন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বন। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় ও সম্পদশালী ম্যানগ্রোভ বন হলো সুন্দরবন। এ বনের মোট আয়তন ৬০০০ বর্গ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের তিটি জায়গার ম্যানগ্রোভ বনভূমি রয়েছে। যথা- ১। চকোরিয়া সুন্দরবন ২। টেকলাফ উপকূল ৩। বৃহস্পতি খুলনার সুন্দরবন।



চিত্র : ম্যানগ্রোভ বন

আর্মণবন : বাংলাদেশে প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার হেক্টর জমিতে গ্রামীণ বন রয়েছে, মানুষ বসতিটা, পুরুষ, নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের পাশে এসব বন গড়ে তোলে।

কাজ - ১ বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে নিচের ছকের কাজটি পোস্টারে লিখে উপস্থাপন করবে।

বনের নাম	অবস্থান	উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ	বসবাসকারী প্রাণী
১। পাহাড়ি বন			
২। সমতল ভূমির বন			
৩। ম্যানগ্রোভ বন			

কাজ - ২ শিক্ষার্থীরা মানচিত্র দেখে বিভিন্ন বনের অবস্থান চিহ্নিত করবে।

বনভূমিতে মজুদ কাঠের পরিমাণ

জরীপ ও সমীক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন বনভূমিতে মজুদ কাঠের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। বনে মজুদ থাকা কাঠের পরিমাণকে প্রোয়িং স্টক বলা হয়। এই প্রোয়িং স্টক এর পরিমাণের উপর ভিত্তি করেই বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। বিভিন্ন বনভূমিতে সমীক্ষায় প্রাপ্ত কাঠের পরিমাণ লিচে ছক আকারে দেওয়া হলো।

বন ভূমিতে মজুদ কাঠের পরিমাণ

বনের ধরন	মজুদ কাঠের পরিমাণ মিলিয়ন*
পাহাড়ি বন	২০.৭১
ম্যানগ্রোভ বন	১২.৩২
সমতল ভূমির বন	১.২০
গ্রামীণ বন	৫৪.৬৮
মেটি	৮৮.৯১

* মিলিয়ন = ১০ লক্ষ

বনাঞ্চলের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

সামাজিক বন

সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণ সরাসরি সম্পৃক্ত থাকে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণে যে বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়, তাকেই সামাজিক বনায়ন বলা হয়।

বাংলাদেশের বন বিভাগ এরই মধ্যে উপকূলীয় চৱাখলসমূহে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার জনুলগ্রাম থেকেই সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এতে জনসাধারণ সরাসরি অংশগ্রহণ করছে এবং উপকৃত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের প্রায় সকল সড়ক, মহাসড়ক ও রেল লাইনের পাশে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করা হচ্ছে। বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সমৰ্বায় ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রধানতঃ উচু ও আবারি উচু জমিতে সামাজিক বন প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে।



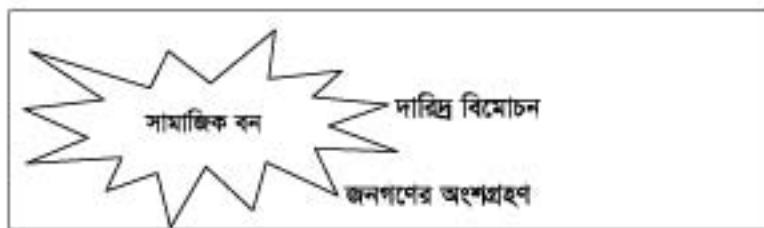
চিত্র : সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তা

- ১। গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্রের জন্য কাঠের জোগান দান ও জ্বালানি কাঠের ঘাটতি পূরণ।
- ২। পতিত জমি, বসতভিটা, সড়ক, রেলপথ, বাঁধ, খাল বিল ও নদীর পাড়ে, বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠানে বনায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ।
- ৩। দারিদ্র জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানো এবং দারিদ্র বিমোচন।
- ৪। পশ্চিমাঞ্চল, শাকসবজি, ফসলমূল, ভেজজ ও বিশেষজ্ঞের জন্য বন সৃজন।
- ৫। বন উৎপাদিত কাঁচামাল গ্রামীণ কৃষির শিল্পে সরবরাহ করা ও জনগণের জন্য কর্মসংহানের ব্যবস্থা করা।
- ৬। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ দূষণ রোধ ও মরুবিভাগের রোধ করা। ভূমিক্ষয় রোধ করা।
- ৭। জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা।

কাজ- দলগত কাজ

সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তার ম্যাপ পোস্টার কাগজে তৈরি কর।



বনায়নের ধরন ও বৈশিষ্ট্য : কৃষি বন

পরিবেশ বাঁচানো, জ্বালানি সরবরাহ, কাঠ ও শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ বাড়ানোর জন্য বিশ্বব্যাপী কৃষি বনের প্রসার ঘটছে। আমাদের দেশেও বর্তমানে কৃষি বনায়ন পদ্ধতির ঘটেছে উন্নয়ন ঘটছে। কৃষি বনায়ন হলো কোনো জমি থেকে একই সময়ে বা পর্যায়ক্রমিকভাবে বিভিন্ন গাছ, ফসল ও পশ্চপাখি উৎপাদন ব্যবস্থা। সাধারণভাবে কৃষি বনায়ন হচ্ছে এক ধরনের সমষ্টিত ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। এতে কৃষি ফসল, পশু, মৎস্য এবং অন্যান্য কৃষি ব্যবস্থা সহযোগে বহু বৰ্জীবী কাঠাল উদ্ভিদ জন্মানোর ব্যবস্থা করা হয়।

কৃষি বনায়নের বৈশিষ্ট্য

- ১। একই জমি বারবার ব্যবহার করে অধিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়।
- ২। বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ ও ফসলের সমাহার ঘটায় ও উৎপাদন বৃক্ষি করে যায়।
- ৩। খামারের উৎপাদন স্থায়িভূক্ত হয় ফলে কর্মসংহান বাঢ়ে।
- ৪। সামাজিক ও পরিবেশগত গ্রহণযোগ্যতা বাঢ়ে।
- ৫। প্রাকৃতিক ভূমিজ সম্পদ ব্যবহার হয়।
- ৬। স্থানীয় উপকরণ ব্যবহারে সুযোগ থাকে।
- ৭। ফসল খামার মালিক, মিশ্র খামার মালিক ও বন বাগান মালিকের চাহিদা পূরণ হয়।
- ৮। কৃষি বনে উৎপাদিত দ্রব্যাদি স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা যায়।

কৃষি বনায়ন : পদ্ধতি ও প্রকার

- ১। ফসলবন : বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গাছ ও আন্তঃফসল সমন্বয়ে গঠিত। প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন।
- ২। তৃণবন : মিশ্র খামার হয়ে থাকে। প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন।
- ৩। কৃষি তৃণবন : ফসলের জোড় চাষ। মাঝে মাঝে বনজ গাছের উৎপাদন করা যায়।
- ৪। কৃষিবন মৎস্য খামার : মিশ্র খামার করা যায়। উচ্চ নিচু জমি সমন্বয়ে খামার সংগ্রহ করতে হয়। ফসল উৎপাদনকারী উদ্ধিদ ও মৎস্য উৎপাদন করা যায়।

কৃষিবনের প্রয়োজনীয়তা

- ১। কৃষি উৎপাদন বৃক্ষি করা।
- ২। খাদ্যের চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মূল্য অর্জন করা।
- ৩। ফসলি জমির বছবিধ ব্যবহার করে উৎপাদন বৃক্ষি করিয়ে আনা।
- ৪। বিরাট জনগোষ্ঠীর কাজের ব্যবস্থা করা ও দারিদ্র্য হটানো।
- ৫। এলাকাভিত্তিক কৃষি বাজার তৈরি করে প্রাচীণ জনজীবনে অঞ্চলিক সমৃদ্ধি আনয়ন।
- ৬। উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার করা।
- ৭। কৃষি গবেষণার ফলাফলভিত্তিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।
- ৮। মাটির-উর্বরতা বৃক্ষি করা এবং মাটিক্ষয় রোধ করা।
- ৯। পশুখাদ্য উৎপাদন এবং পশু পাখি ও উপকারী কীট পতঙ্গের নিরাপদ আবাস তৈরি করা।
- ১০। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করা।

কাজ-২ : শিক্ষার্থীরা এককভাবে দুইটি করে বনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন সংরক্ষণ বিধি

বনভূমির সকল লক্তাগুলা, বৃক্ষরাজি ও বন্যপ্রাণী নিয়ে বনজ সম্পদ গঠিত। এ বনজ সম্পদ একটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বনভূমির এসব গাছপালা ও বন্য প্রাণীর মধ্যে নিবিড় আন্তঃসম্পর্ক বিরাজমান। কোনো কারণে এর যে কোনো একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যগুলোও আপনা-আপনি ধ্বংস হয়ে যায়। কোনো অঞ্চলে নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি বা সরকারি বনাঞ্চল থেকে গাছ কাটা, অপসারণ, পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন বা বিধান রয়েছে। এসব আইন বা বিধানকে বন বিধি বা বন আইন বলা হয়। বনভূমির সকল সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য এ উপরাহাদেশে ১৯২৭ সালে বন সংরক্ষণ আইন করা হয় যা "বন আইন, ১৯২৭" নামে পরিচিত। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে এ আইনের বিভিন্ন সংশোধনী আনয়ন

করে যা “বন আইন (সংশোধন), ১৯৯০” নামে পরিচিত। এ আইনের পর অবৈধ বন খননের প্রবণতা কমে বটে কিছু পুরোপুরি রোধ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং ১৯৯০ সালের এ আইনকে সময় উপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলশুভিতে ১৯৯৬ সালে এ আইনের আরও কিছু সংশোধনী আনা হয়। এ আইন বলে বনজ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এসব বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে।

এ ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার বনবিধি বলে আরও যা করতে পারবেন তাহলো-

- ১। সরকারি প্রজাপন জারির মাধ্যমে কোনো বনভূমিতে সংরক্ষিত বন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।
- ২। এ প্রজাপন বলে ক্রতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা অন্যকোনো দাবিদার প্রজাপন প্রকাশের তারিখ হতে ন্যূনতম তিনমাস এবং অনধিক চার মাসের মধ্যে বন কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে নিজে হাজির হয়ে ক্ষতির বিস্তারিত উল্লেখ করে আবেদন করতে পারবেন।
- ৩। সরকার একইভাবে প্রজাপনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট তারিখ হতে সংরক্ষিত কোনো বন বা তার অংশ বিশেষ সংরক্ষিত, রাহিত এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

বনবিধির বর্ণনা

এসো আমরা এবার বন সংরক্ষণের প্রচলিত আইনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ জেনে নেই। এ বিধি বলে নিম্নলিখিত কাজসমূহ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। যথা-

- ১। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যক্তিত সরকারি বনভূমি থেকে গাছপালা ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণ করা।
- ২। অনুমতি ব্যক্তিত আধাসরকারি বা স্থানীয় সরকারি জমি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা কোনো ব্যক্তির নিজস্ব জমি বা বাগান হতে কাঠ বা অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে নিজ জেলার যে কোনো স্থানে প্রেরণ।
- ৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে সরকারি বনাঞ্চলে প্রবেশ করা, বনভূমিতে ঘরবাড়ি ও চাষাবাদ করে বনাঞ্চলের ক্ষতিসাধন করা।
- ৪। বনাঞ্চলে গবাদিপশু চরানো।
- ৫। প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যক্তিত বনের গাছ কাটা, অপসারণ ও পরিবহন করা।
- ৬। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিদিত কাঠ ব্যক্তিত অন্য সময়ে আগুন জ্বালানো, আগুন রাখা বা বহন করা।
- ৭। বনের কাঠ কাটার অথবা কাঠ অপসারণের সময় অসাবধানতাবশত বনের ক্ষতিসাধন করা, গাছ ছেটে ফেলা, ছিন্ন করা, বাকল তোলা, পাতা ছেড়া, পুড়িয়ে ফেলা অথবা অন্য কোনো প্রকারে বৃক্ষের ক্ষতিসাধন করা।
- ৮। বনে শিকার করা, শুলি করা, মাছ ধরা, পানি বিষাক্ত করা অথবা বনে ফাঁদ পাতা।
- ৯। বনজ দ্রব্যাদি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অপসারণ, পরিবহন ও হস্তান্তর করা।
- ১০। বন কর্মকর্তা অথবা বন রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ব্যক্তির কাজে বাধা প্রদান করা।

১১। যথাযথ অনুমতি ব্যতীত বনের মধ্যে গর্ত ঘোড়া, চুন বা কাঠ কয়লা পোড়ানো অথবা কাঠ ব্যতীত অন্য কোনো বনজাত পণ্য সংগ্রহ করা অথবা শিল্পজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করা, অপসারণ করা।

১২। বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত কোনো সংরক্ষিত বনে আঞ্চেয়াজ্ঞসহ প্রবেশ করা।

বন আইন লঙ্ঘনের শাস্তির বিধান

বন আইন লঙ্ঘনের বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে। উপরোক্ত আইন ভঙ্গের জন্য ন্যূনতম ছয় মাসের জেলসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জেলসহ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। এসব অপরাধের বিচার প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হয়ে থাকে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সনে একটি আইন প্রণয়ন করেন যা বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ), অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ নামে অভিহিত। এ আইন বলে বিনা অনুমতিতে যে কোনো উপায়ে বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা, বন্যপ্রাণী প্রজননে বিষ্পু সৃষ্টি, জাতীয় উদ্যানের সীমানার এক মাইলের মধ্যে কোনো প্রাণী শিকার, বিদেশি প্রাণী আমদানি বা বিদেশে রপ্তানি করা প্রত্তির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এ আইন লঙ্ঘন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি লঙ্ঘনকারীকে আদালত ছয় মাসের জেলসহ পাঁচশত টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ দুই বৎসরের জেলসহ দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবেন। এ আইন ভঙ্গকারীকে আর্থিক জরিমানাসহ বিভিন্ন মেয়াদে জেল দেওয়ার বিধান রয়েছে। তবে মানুষের জীবন বাঁচাতে, ফসলের ক্ষতি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়।

কাজ-২ : বন বিধি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি নিয়ে দলীয় আলোচনা কর। এ সম্পর্কীয় পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

বন সংরক্ষণ বিধির প্রয়োজনীয়তা

দেশের বিরাজমান বন সংরক্ষণ ও নতুন বন সৃষ্টি করে দেশের বনের পরিমাণ বৃক্ষি করা এখন সময়ের দাবি। কারণ বন পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু আমাদের দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি। এ অধিক জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য সীমিত বনজ সম্পদের উপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করছে। প্রাত্যহিক চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষ বনের বৃক্ষরাজি ও বন্য প্রাণী উজাড় করছে। বন ধ্বনি হওয়ার কারণে বন্য প্রাণীর আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রজনন বিস্তৃত হচ্ছে, খাদ্য সংকট হচ্ছে। অবৈধ শিকারির করলে পড়েও বন্য প্রাণী ধ্বনি হচ্ছে। বনে অবৈধ অনুপ্রবেশ বাঢ়ছে। বনজ সম্পদ ছুরি ও পাচার করে এক শ্রেণির অসাধু লোক বন ধ্বনি করছে। বনের নিকটবর্তী এলাকাবাসী থীরে থীরে বন দখল করছে। বন এলাকায় অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করছে। অসাধু চক্র পার্বত্য এলাকার পাহাড় কেটে, কাঠ পাচার করে পাহাড়ি বন ধ্বনি করছে। এ ছাড়াও সৃজিত সামাজিক বনের বৃক্ষরাজি আন্তর্সাং করছে। এর ফলে ভূমিক্ষয়, ভূমি ধ্বনেসহ নানারকম প্রাকৃতিক দুর্ঘটন বাঢ়ছে। দেশ পরিবেশগত ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বনজসম্পদকে ধ্বনেসহ হাত ধেকে রক্ষা করতে বনসংরক্ষণ বিধি প্রণীত হয়েছে। এ বিধির কার্যকরী প্রয়োগে সরকারিভাবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বনবিধি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃক্ষির লক্ষ্যে জনসংযোগ বাঢ়াতে হবে। বন সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি বাস্তবায়িত হলে অনেক সুফল পাওয়া যেতে পারে।

তৃতীয় পরিচেছন

বন নার্সারি

বন নার্সারি

আণ্ডিধানিক অর্দে বনজ নার্সারি হলো চারা গাছের আলয় বা চারালয়। নার্সারি হলো এমন একটি স্থান যেখানে চারা স্থানান্তর ও রোপণের পূর্ব পর্যন্ত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি আদর্শ নার্সারি থেকে সুস্থস্বল ও সুন্দর চারা পাওয়া সম্ভব। নার্সারিতে বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা হয়। আবার আধুনিক পদ্ধতিতে কলম থেকেও উন্নতমানের চারা উৎপাদন করা হয়।

নার্সারির প্রয়োজনীয়তা

এছন অনেক বীজ রয়েছে যেগুলো গাছ থেকে বারে পড়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোপন করতে হয়। তা না হলে অঙ্গুরোদগমের হার কমতে থাকে। এসব প্রয়োজন জন্য নার্সারি একান্ত অপরিহার্য। যেমন- গর্জন, শাল, রাবার, তেলসুর প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোপণ করতে হয়। ভালোমানের বাগান করতে প্রয়োজন উন্নতমানের সুস্থ, সুবল চারা। এ ধরনের চারা নার্সারিতে তৈরি করা যায়। আরও যেসব কারণে নার্সারি অপরিহার্য ভাবলো-

- সময়মতো উন্নতমানের সুস্থস্বল ও বড় চারা পাওয়া যায়।
- বিভিন্ন বয়সের চারা বিপণন ও বিতরণে সুবিধা হয়।
- অনেক চারা একসাথে পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়।
- কম পরিশ্রম ও কম খরচে চারা উৎপাদন করা যায়।
- শব্দ ব্যয়ে ও শব্দ খরচে অনেক চারা পাওয়া যায়।

আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নার্সারির অবদান

- নার্সারিতে বনজ, ফলজ ও ঔষধি উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করে জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হয়। এর ফলে বৃক্ষায়ন বৃদ্ধি পায়।
- নার্সারিতে কাজ করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে।
- নার্সারি ব্যবসা করে অনেক লোকের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।
- নার্সারিতে উৎপাদিত চারা দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি বনায়ন করা হয়।
- উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী তৈরিতে নার্সারিতে উৎপন্ন চারা রোপণ করা হয়।

বন নার্সারির ধরন

নার্সারির ধরন : নার্সারি বিভিন্ন ধরনের হয় যেমন- ১. মাধ্যম ভিত্তিক নার্সারি ২. স্থায়িভু ভিত্তিক নার্সারি ৩. অর্থনৈতিক ভিত্তিক ৪. ব্যবহার ভিত্তিক নার্সারি

১। মাধ্যমভিত্তিক নার্সারি আবার দুই ধরনের

ক. পলিব্যাগ নার্সারি

এ ধরনের নার্সারিতে পলিব্যাগে চারা উত্তোলন করা হয়। পলিব্যাগ সহজে সরানো যায় বলে চারা খো, বৃষ্টি ও দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা যায়। গাছ থেকে গাছে রোগ সংক্রমণ কম হয়। এ পদ্ধতিতে নিরিডিভাবে চারার যত্ন নেওয়া যায়।

খ. বেড নার্সারি

নার্সারি তৈরির এ পদ্ধতিতে সরাসরি মাটিতে বেড তৈরি করে চারা উৎপাদন করা হয়। এ নার্সারিতে এক সাথে অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক চারা তৈরি করা যায়। ফলে বীজের অপচয় কম হয়। দ্রুত বর্ধনশীল চারা উৎপাদন ভালো হয়। কাটিৎ ও মোথা থেকে চারা উৎপাদন সহজ হয়। চারা উৎপাদনের জন্য বেডের মাটি উর্বর হতে হয়।

২। ছাইতু ভিত্তিক নার্সারি দুই ধরনের যেমন-

ক. ছাইয়ী নার্সারি

এ ধরনের নার্সারিতে বছরের পর বছর চারা উত্তোলন করার সুযোগ থাকে। ছাইয়ী নার্সারির সুবিধা হলো নার্সারির জন্য সঠিক ছান নির্বাচন করা যায়। তিন হাউজ ও বীজাগার নির্মাণ করা যায় তবে মূলধনের প্রয়োজন বেশি হয়। চারার পরিবহন খরচ বেশি হয়।

খ. অছাইয়ী নার্সারি

এ নার্সারিতে চাহিদা অনুযায়ী চারা উৎপাদন করা হয়। অসুবিধাটা হলো এ ধরনের নার্সারি সংরক্ষণে বেগ পেতে হয়।

৩. অর্ধনেতিক ভিত্তিতে নার্সারি দুই ধরণের যেমন-

ক. গার্হস্থ নার্সারি

পারিবারিক প্রয়োজন অনুযায়ী ফুল, ফল ও কাঠের চারা উত্তোলন করা হয়।

খ. ব্যবসায়িক নার্সারি

এ নার্সারিতে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ফল, সবজি, ফুল, কাঠ ও ঔষধি উত্তিদের চারা উত্তোলন করে বিক্রয় ও সরবরাহ করা হয়।

৪। ব্যবহার ভিত্তিক নার্সারি

উত্তিদের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে এ ধরনের নার্সারি করা হয়। যেমন- মেহগনি, সেগুন, রেইনটি গাছের চারা উৎপাদনের জন্য তৈরি নার্সারি।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলগত ভাবে বন নার্সারি পরিদর্শন করে বৃক্ষের তালিকা তৈরি করবে।

বন নার্সারির বীজ

বনজ উত্তিদের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

বীজ হলো উত্তিদের প্রধান বৎসর বিস্তারক উপকরণ। ভালো চারা পেতে হলে ভালো বীজ প্রয়োজন। এ জন্য নির্দিষ্ট গুণাগুণ সম্পর্ক মাত্রগাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত বীজ আহরণ থেকে রোপনের পূর্ব পর্যন্ত সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে। সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না হলে বীজ পোকা-মাকড়, ছাতাক ও ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি দিয়ে আক্রান্ত হয়। ফলে বীজের মানের অবনতি হয়। অঙ্গুরোদগম ক্ষমতা কমে

যায়। তাছাড়া বীজ বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে এর গুণাগুণ নির্ণয় করতে হবে। বীজকে সঠিকভাবে প্রতিয়া করণের পর বাজারজাতকরণ ও বিতরণ করা দরকার। এ পাঠে আমরা নির্বাচন, বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি, বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি, বীজ পরীক্ষা ও বীজ বগন পূর্ববর্তী প্রতিয়াকরণ সম্পর্কে জানব।

মাতৃগাছ নির্বাচন : মধ্য বয়সী, সুস্থসবল, রোগযুক্ত এবং অধিক ফল উৎপাদনকারী গাছকে নির্বাচন। নির্বাচিত এসব গাছ থেকে উপযুক্ত সময়ে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। ভালো চারা উৎপাদনের জন্য উভয় গুণাগুণ সম্পর্ক মাতৃগাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা অপরিহার্য। আমাদের দেশে এক বা একাধিক উৎস হতে গাছ শনাক্ত করে বীজ সংগ্রহ করা হয়। যেমন-

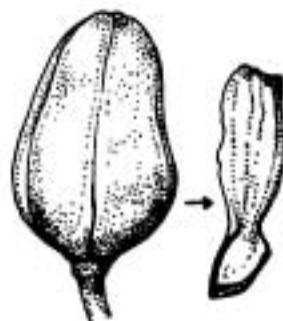
- ১) নিজ ও অন্য এলাকার কৃষকের বাড়ি
- ২) পার্ক বা বাগান এলাকা বা বনাঞ্চল
- ৩) রাস্তার পাশের বৃক্ষ

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি

সাধারণত দুইভাবে গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

- ১। ভূমি হতে বীজ সংগ্রহ : বীজ পাকার পর যখন কিছু বীজ মাটিতে পড়ে তখন বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। বীজ পাকার মধ্যবর্তী সময়ে এ বীজ সংগ্রহ করতে হয়। যেসব গাছের ফল পেকে ফাটে না এবং বীজ ছড়িয়ে পড়ে না সেসব বীজ এ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। সেগুল, গর্জন, শাল, কদম, পিতোজ, তেলসুর প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ ভূমি থেকে সংগ্রহ করা যায়।
 - ২। গাছ থেকে ফল ও বীজ সংগ্রহ : এ পদ্ধতিতে বীজ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যখন ফল পরিপূর্ণ হবে তখন দো বা ছুরি দিয়ে গাছের ছোট ছোট ভাল কেটে সরাসরি গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করা হয়। ছোট ছোট বীজ যা মাটিতে পড়লে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় ফলে মাটি হতে সরাসরি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সে সব বীজ এ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। যেমন-
- ক) পড় জাতীয় - বাবুল, কড়ই, খ) ক্যাপসিউল- মেহগনি, চম্পা, গ) কোণ-পাইন।

গাছ থেকে ফল ও বীজ সংগ্রহের পর রোদে তকাতে হবে। এরপর পড়, ক্যাপসুল বা কোণ ফাটিয়ে বীজ পৃথক করতে হবে।



চিত্র : মেহগনির ক্যাপসুল



চিত্র : কড়ই এর পড়



চিত্র : পাইন কোণ

বীজ নিষ্কাশন : ফল সংগ্রহ করার পর বীজগুলোকে শীস, আবর্জনা, খোসা ইত্যাদি থেকে পৃথক করাই হলো। বীজ নিষ্কাশন। বীজ নিষ্কাশনের প্রধান তিনটি পদ্ধতি হলো-

- ১। **বাছাই পদ্ধতি :** যে সব গাছের অঙ্কুরোদগমকাল সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ ৪-৭ দিন, এসব ক্ষেত্রে বাছাই পদ্ধতি ব্যবহার হয়। এসব গাছের গোটা ফলই বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন-নারিকেল, গর্জন, শাল, সেগুন বীজ। সেগুন বীজ রোদে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বাঢ়ে।
- ২। **তকনো পদ্ধতি :** জাবুল, তুলা, ইপিল-ইপিল, মেলজিয়াম, বাবুল মেহগনি, কড়াই গাছের বীজ তকনো পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয়। গাছ থেকে ফল পেড়ে ভালো করে রোদে শুকাতে হয়। ফল ফেটে ঘৰন বীজ বেরিয়ে আসে, তখন মাড়াই করে বীজ নিষ্কাশন করা হয়।
- ৩। **পচন পদ্ধতি :** এ পদ্ধতিতে ফল পানিতে পচানোর পর বীজ বের করা হয়। যেমন- আম, কাঠাল, তেঁতুল, পেয়ারা ইত্যাদি তার পরে বাতাসে শুকাতে হয়।

বীজ সংরক্ষণ

গাছ থেকে বীজ সংগ্রহের পর পরবর্তী ব্যবহারে পর্যবেক্ষণ করা হয়। সঠিক পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ না করলে বীজের গুণগুণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বীজের মানের অবনতি হয়। যেমন- গর্জন, শাল, সেগুন, চাপালিশ, তেলসুর প্রভৃতি গাছের বীজ গুদামজাত করলে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাহ্রাস পায়। এসব গাছের বীজ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। বীজ অপেক্ষাকৃত হালকা করে বিছিয়ে গুদামজাত করা আবশ্যিক। বীজ সব সময় শুকনো রাখতে হবে। অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও শুক স্থানে বীজ রাখতে হবে। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিরন্তর ছাড়াই বীজ খোলা অবস্থায় রাখা হয়। আর্দ্রতা নিরস্ত্রণ করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এবং রেফিজারেটরে এ বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

কাজ : বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি মৌখিকভাবে উপস্থাপন করবে।

বন নার্সারি তৈরির কৌশল

স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় নার্সারি তৈরির জন্যই প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও কিছু নিয়মনীতি।

স্থায়ী নার্সারি

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চারা উৎপাদনের জন্য স্থায়ী নার্সারি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বন বিভাগ, হার্টিকালচার, বিএডিসির উদ্যান, প্রাইভেট নার্সারি কেন্দ্রগুলো স্থায়ী নার্সারি। স্থায়ী নার্সারি স্থাপনের বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো-

১। স্থান নির্বাচন

আলোবাতাসপূর্ণ খোলা মেলা উচু ভূমি হবে। বর্ষার পানি উঠে না এবং জলাবন্ধন না এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে। উর্বর বেলে দোআশ বা দোআশ মাটি সম্পর্ক হবে। উল্লত যোগাযোগ ও পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থা রাখতে হবে। পর্যাপ্ত জমি ও শ্রমিক পাওয়া যায় এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে।

২। নার্সারির জায়গার পরিমাণ নির্ণয়

এক বগমিটাৰ সীড বেড বা পট বেডের জায়গা নির্ণয়

পলিব্যাগের আকার	প্রতি বর্গ মিটারে চারাৰ সংখ্যা
১৫ সেমি x ১০ সেমি	৬৫ টি
১৮ সেমি x ১২ সেমি	৪৫ টি
২৫ সেমি x ১৫ সেমি	২৬ টি
সীড় বেড়ে চারা হতে চারাৰ দূৰত্ব	প্রতি বর্গ মিটারে চারাৰ সংখ্যা
৫ সেমি x ৫ সেমি	৪০০ টি
১৮ সেমি x ১২ সেমি	২০০ টি
২৫ সেমি x ১৫ সেমি	১০০ টি

৩। বেড়া নির্মাণ

অনিষ্টকাৰী জীবজন্ত ও পথচারীদেৱ হাত থেকে চারা গাছ রক্ষা কৰাৰ জন্য বেড়া দেওয়া দৰকার। স্থায়ী নাৰ্সারিতে বেড়া দেওয়াৰ উপায়-

- ক) ইটেৰ দেয়াল : স্থায়ী নাৰ্সারিতে চার দিকে উচু ইটেৰ দেয়াল নিৰ্মাণ কৰে বেড়া দেওয়া যায়।
- খ) কাঁটা তাৰেৰ বেড়া : স্থায়ী নাৰ্সারিতে কাঁটা তাৰেৰ বেড়া সহজে দেওয়া যায়।
- গ) লোহার জালেৰ বেড়া : লোহার জাল খুঁটিৰ সাথে বেঁধে দিয়ে বেড়াৰ পাশ দিয়ে জীবজন্ত গাছ লাগানো হেতে পাৱে। কাঁটা তাৰেৰ বেড়াৰ মতো এ বেড়াতেও তিন ধৰনেৰ খুঁটি ২ মিটাৰ অন্তৰ অন্তৰ ব্যবহাৰ কৰা যায়।
- ঘ) জীবজন্ত গাছেৰ বেড়া : দূৰত্ব, কাটা মেহেদী, মেন্দী, তোল কলমী প্ৰভৃতি জীবজন্ত গাছ দিয়ে নাৰ্সারিতে চার দিকে স্থায়ী বেড়া দেওয়া যায়।

৪। ভূমি উন্নয়ন

নাৰ্সারি স্থান নিৰ্বাচনেৰ পৰ পৱাই উন্নয়নেৰ কাজ কৰতে হয়। নাৰ্সারি বেড তৈৰিৰ সময় বৃষ্টিৰ বা সেচেৰ পানি যাতে দাঁড়াতে না পাৱে সে জন্য মাটি চালু ও ছেন কৰতে হবে। ভূমিৰ মাটি দোআঁশ বা বেলে-দোআঁশ হতে হবে।

৫। অফিস ও আবাসিক এলাকা

নাৰ্সারিৰ অফিস ঘৰাটি প্ৰধান রাস্তাৰ পাৰ্শ্বে মূল গেটেৰ কাছে অবস্থিত হওয়া প্ৰয়োজন। অফিস ও আবাসিক এলাকা চারা উৎপাদন এলাকাকাৰ বাইৱে রাখতে হবে। নাৰ্সারি এলাকাকাৰ ভিতৰে আবাসন ঠিক নয়।

৬। বিদ্যুতায়ন

স্থায়ী নাৰ্সারিতে বিদ্যুতেৰ ব্যবস্থা থাকা ভালো। এতে নাৰ্সারিৰ রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা হয়।

৭। গান্ডা ও পথ

নাৰ্সারিতে প্ৰবেশেৰ জন্য একটি প্ৰধান রাস্তা থাকা আবশ্যিক। প্ৰধান রাস্তাটি পৱিকল্পিতভাৱে নাৰ্সারিৰ ভিতৰেৰ পথগুলোৰ সাথে যুক্ত থাকবে।

৮। সেচ ব্যবস্থা

নার্সারিতে চারা উত্তোলনের জন্য পানি প্রয়োজন। সে জন্য নার্সারি স্থাপনের ত্বরিতই উভয় সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৯। নর্মা ও নালা

নার্সারিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এ কারণে প্রয়োজনীয় নর্মা ও পার্শ্বনালার ব্যবস্থা রাখতে হবে। স্থায়ী নার্সারিতে এগুলো পাকা করতে হবে। নিয়মিত পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

১০। নার্সারি ব্রুক

নার্সারির চারা উত্তোলনের স্থানকে কয়েকটি ব্রুকে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ব্রুককে আবার কয়েকটি সীড় বেড বা পট বেডে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ব্রুকে ১০-১২ টি বেড থাকতে পারে। খিন হাউজ সেড রাখার জায়গা, কমপোস্ট তৈরির গর্ত, মাটি রাখার স্থান ইত্যাদি সুবিধামতোভাবে বিভিন্ন ব্রুকে ভাগ করে দিতে হবে।

১১। নার্সারি বেড

বেড সাধারণত দুই রকম হতে পারে-

ক) সরাসরি বীজ বপন করে চারা উত্তোলনের জন্য বেড : এ জন্য জমি ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে।

জমির মাটি কোদাল বা লাঙ্গল দিয়ে আগলা করতে হবে। সব রকম আগছা নুড়ি পাথর পরিষ্কার করে ভালো করে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। অতঃপর জায়গা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ১ মিটার \times ৩ মিটার \times ২০ সেমি আকারে বেড তৈরি করতে হবে। বেড তৈরির পর প্রয়োজনীয় গোবর বা কমপোস্ট ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে কয়েকদিন রেখে দেওয়ার পর বীজ বপন করতে হবে।

খ) পলিব্যাগে চারা উত্তোলনের জন্য বেড তৈরি : এক্ষেত্রে মাটিতে চাষ করার প্রয়োজন নেই। কেবল দুটি বেডের মধ্যবর্তী স্থানের মাটি তুলে বেডকে ১০-১৫ সেমি উঁচু করে উপরিভাগ সমান করতে হয়। এরপর বেডের ধার তৈরি করা হয়। তবে নার্সারি স্থানের প্রয়োজনত অনুযায়ী বেডের আকার ছোট বড় হতে পারে।

কাজ-২ : শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী যে কোনো একটি বনজ নার্সারি পরিদর্শন করবে। নার্সারিতে যে সব বৃক্ষের চারা আছে তার তালিকা তৈরি করে দলগতভাবে শিক্ষককের কাছে জমা দিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহ

বৃক্ষ আমাদের অতিমূল্যবান জাতীয় সম্পদ। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে যেমন বৃক্ষ গ্রোপণ করতে হয় তেমনি একই কারণে বৃক্ষ কর্তন করতে হতে পারে। সাধারণত গাছের আবর্তনকাল শেষ হলে গাছ কর্তন করা হয়। তবে যেসব গাছ সৌন্দর্য বর্ধন ও পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে লাগানো হয় সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত হয়ে থাকে। গাছ কাটা ও তা থেকে কাঠ সংগ্রহ করার বিষয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিগত কৌশল জানা দরকার। গাছ কাটার পর যদি সে গাছকে খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা না হয় তবে তা চিরাই করতে হবে এবং তা থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাপের কাঠ বের করতে হবে।

এরপর কাঠের স্থায়ী দীর্ঘায়িত করার জন্য কাঠকে ব্যবহার উপযুক্ত করা বা সিজনিং করা হয়। বাঁশের স্থায়ী দীর্ঘায়িত করার জন্যও সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করার প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায় কাঠ বা বাঁশকে সিজনিং করে কর্তিত কাঠ বা বাঁশের গুণগতমান ও স্থায়ীভুক্তিকাল বেশ কয়েকগুলি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব।

এ পরিচ্ছেদে আমরা বৃক্ষ কর্তনের সময় ও নিয়মাবলি, কাঠ সংরক্ষণ পদ্ধতি, তজ্জ্বল পরিমাপ পদ্ধতি, বৃক্ষকর্তন ও কাঠ সংরক্ষণের উপযোগিতা সম্পর্কে ধারণা লাভ ও দক্ষতা অর্জন করব।

বৃক্ষ কর্তন সময় বা আবর্তনকাল

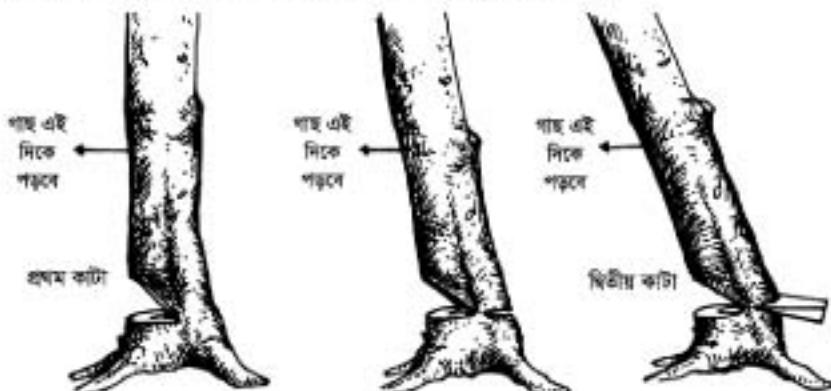
বৃক্ষের চারা গ্রোপণ থেকে ত্বরকরে যে সময়ে বৃক্ষের বৃদ্ধি সর্বাধিক হয় এবং গাছ পরিপন্থুতা লাভ করে ব্যবহার উপযোগী হয়, সে সুনির্দিষ্ট সময়কালকে আবর্তনকাল বা কর্তন সময় বলে। পরিপন্থুতার আগেই বৃক্ষ কর্তন করলে ভালো মানের কাঠ পাওয়া যায় না। বন ব্যবস্থাপনায় বৃক্ষের আবর্তনকালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা-

- ১। শক্ত আবর্তন কাল :** যে সব গাছের কাঠ নরম এবং দ্রুত বর্ধনশীল জ্বালানি কাঠ পশ খাদ্য ও মৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, সেসব উদ্দিষ্টের কর্তন সময় কম হয়। সাধারণত ১০-২০ বছর আবর্তনকালে এসব বৃক্ষ কর্তন করা হয়। যেমন-আকাশমনি, কদম্ব, শিমুল, তেলিকদম, কেওড়া, বাইন, বাবলা, ঝাউ, ইপিল ইপিল ইত্যাদি।
- ২। মাঝারি আবর্তনকাল :** আংশিক শক্ত কাঠ প্রদায়ি প্রজাতিসমূহ খুঁটি ও কাঠের উৎপাদনের জন্য ২০-৩০ বছর আবর্তনকালে কাটা হয়। যেমন-গামার, শিত, আম, কড়ই, খয়ের বকুল, হরিতকী, ছাতিয়ান, চন্দন, রেণু কড়ই বা রেইনট্রি ইত্যাদি।
- ৩। দীর্ঘ আবর্তনকাল :** শক্ত জাতীয় কাঠ ও দীর্ঘ বর্ধনশীল প্রজাতিসমূহ শব্দ কাঠ উৎপাদনের জন্য ৪০-৫০ বছর আবর্তনকালে কাটা হয়। যেমন- সেউন, গর্জন, শাল, জারুল, শীলকড়ই, মেহগনি, তেলসুর, চাপালিশ, কাঠাল, জাম ইত্যাদি।

বৃক্ষ কর্তনের নিয়মাবলি

- গাছ যতটা সম্ভব মাটির কাছাকাছি কাটিতে হবে। কারণ গাছের গোড়ার অংশটা বেশি হোটা হয়। এ অংশে কাঠের মানও ভালো থাকে। সাধারণত মাটির ১০ সেমি উপরে গাছ কাটলে সর্বোচ্চ পরিমাণ কাঠ পাওয়া যায়।

- গাছ কাটার পূর্বে ভালপালা ছেটে নিলে গাছ নিয়ন্ত্রিতভাবে ফেলতে সুবিধা হয়।
- গাছ সব সময় করাত দিয়ে কাটতে হবে। এতে কাঠের অপচয় পুরাপুরি রোধ করা সম্ভব। প্রথমে যে দিকে গাছকে ফেলতে হবে সেদিকে করাত দিয়ে কাটতে হবে। পরবর্তীতে আগের মতই বিপরীত দিকে করাত দিয়ে কাটতে হবে এবং কাটা অংশে খিল বা কাঠের টুকরা ঢুকিয়ে দিতে হবে। এতে গাছ কাঞ্চিত দিকে পড়বে।
- কাটা গাছ মাটিতে পড়ার পর খণ্ডিত করতে হবে। তবে কী কাজে কাঠ ব্যবহার করা হবে তার ভিত্তিতে পরিমাপ নির্ধারিত করতে হবে। খণ্ডিত গোল অংশকে বলা হয় লগ। এ লগকে করাত কলে নিয়ে পিয়ে ব্যবহার উপযোগী চিরাই কাঠে পরিষ্কত করা হয়। চিরাই কাঠের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব থাকে। চিরাই কাঠের প্রস্থ ১৫ সেমি এর বেশি হলে এবং পুরুত্ব ৪ সেমি হলে তাকে বলা হয় তত্ত।
- গাছ কাটার সময় যে দিকে গাছ পড়বে প্রথমে কুড়াল দিয়ে মাটির ১০ সেমি উপরে সেই দিকে দুই-তৃতীয়াংশ কাটতে হবে। পরবর্তীতে কাটা হবে ঠিক এ কাটার বিপরীত দিকে ১০ সেমি উপরে। এভাবে গাছ কাটলে গাছকে সুনির্দিষ্ট দিকে ফেলা সম্ভব হয়। এতে পার্শ্ববর্তী গাছের ক্ষতি কম হয়। কুড়াল/করাত উভয় ব্যবহার করে গাছ কাটা বেশ সুবিধা জনক।



চিত্র : গাছ কাটার পদ্ধতি

গোল কাঠ ও চিরাই কাঠের পরিমাপ পদ্ধতি

গোলকাঠের বা লগের সঠিক আয়তন বা ভলিউম নিউটনের সূত্রের সাহায্যে বের করতে হয়।

সূত্রটি এরূপ :

$$\text{ভলিউম} = 0.08 \times \frac{(\text{বেড় } 1)^2 + 8 \times (\text{বেড় } 2)^2 + (\text{বেড় } 3)^2}{6} \times \text{দৈর্ঘ্য}$$

এখানে, বেড় ১ = চিকন প্রান্তের বেড়

৬

বেড় ২ = লগের মাঝামাঝের বেড়

বেড় ৩ = মোটা প্রান্তের বেড়

দৈর্ঘ্য ও বেড় মিটারে মাপা হলে ভলিউম হবে ঘন মিটার।

উদাহরণ : একটি গজন গাছের লগ ৬ মিটার দৈর্ঘ্য। এটির চিকন মাঝার বেড় ১.৫০ মিটার, মাঝামাঝের বেড় ২.০ মিটার এবং মোটা মাঝার বেড় ২.৫ মিটার। লগটির সঠিক আয়তন বা ভলিউম কত ?

$$\begin{aligned}
 \text{সমাধান : ভলিউম} &= 0.08 \times \frac{(বেড় 1)^2 + 8 \times (বেড় 2)^2 + (বেড় 3)^2}{6} \times \text{দৈর্ঘ্য} \\
 &= \left\{ 0.08 \times \frac{(1.5)^2 + 8(2)^2 + (2.5)^2}{6} \right\} \times 6 \\
 &= \left\{ 0.08 \times \frac{2.25 + 8 \times 8 + 6.25}{6} \times 6 \right\} \text{ ঘনমিটার} \\
 &= \left\{ 0.08 \times \frac{28.5}{6} \times 6 \right\} \text{ ঘনমিটার} \\
 &= \left\{ 0.08 \times 28.5 \right\} \text{ ঘনমিটার}
 \end{aligned}$$

$$\text{ভলিউম} = 1.96 \text{ ঘনমিটার}$$

ব্যবহার উপযোগী কাঠের পরিমাণ

গোলকাঠ চেরাইকালে কিছুটা অপচয় হয়। সবটুকু কাঠই ব্যবহার উপযোগী করা যায় না। গোলকাঠ থেকে কী পরিমাণ ব্যবহার উপযোগী কাঠ পাওয়া যায় তা হল্লাস এর সূত্রের সাহায্যে বের করা হয়।

$$\text{সূত্রটি এরূপ : ভলিউম} = \left\{ \frac{\text{লগের মাঝের বেড়}}{8} \right\}^2 \times \text{দৈর্ঘ্য}$$

তঙ্কা বা চেরাই কাঠের ভলিউম মাপা সহজ। চেরাই কাঠ/তঙ্কার দৈর্ঘ্য, প্রশ্ন এবং পুরুত্ব জানা থাকলে অতি সহজেই এর ভলিউম বের করা যায়। একটি পরিমাণ ফিতার সাহায্যে অতি সহজেই এক খণ্ড চেরাই কাঠের দৈর্ঘ্য, প্রশ্ন ও পুরুত্ব মাপা যায়। তারপর নিম্নের সূত্রের সাহায্যে ভলিউম নির্ণয় করা যাবে।

$$\text{ভলিউম} = \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রশ্ন} \times \text{পুরুত্ব}$$

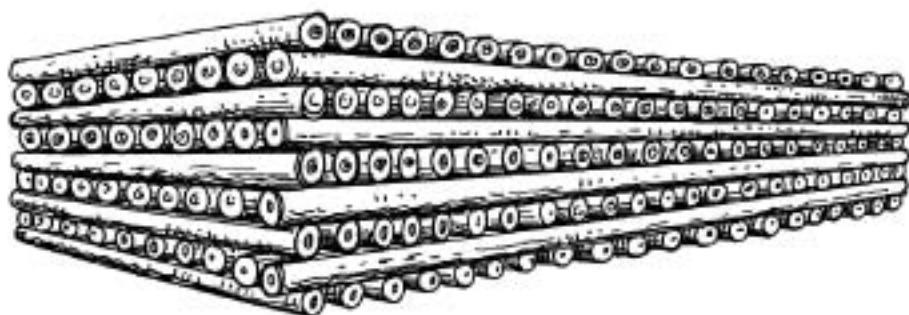
দৈর্ঘ্য, প্রশ্ন মিটারে মাপা হলে ভলিউম হবে ঘনমিটারে।

কাঠ সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট

জীবন্ত অবস্থার বৃক্ষের জন্য পানি অপরিহার্য হলেও কাটার পর কর্তিত বৃক্ষে পানির পরিমাণ যত কম থাকবে কাঠ তত বেশি টিকবে। পানির পরিমাণ যদি কাঠ ওজনের ১২% এ নামিয়ে আনা যায় তাহলে ধরে নিতে হবে কাঠের শুণগত মান সর্বোত্তম হবে। সহজে শুনপোকা, পোকা-মাকড় বা ছজাক আক্রমণ করতে পারবে না। বেশি দিন টিকবে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে কাঠ থেকে পানি বের করে নেওয়ার পদ্ধতিকে সিজনিং বলে। সিজনিং দুইভাবে করা যায়-

১। এয়ার ড্রাইং

গাছ কেটে চেরাই করার পর বাতাসে কাঠ তকানোকে এয়ার ড্রাইং বলা হয়। তবে হালকা পাতলা চেরাই করা কাঠ প্রথম রোদে তকালে কাঠ ফেটে বা বেঁকে যেতে পারে। তাই এতক্ষেত্রে মাটি থেকে ৩০-৪০ সেমি উচুতে ছায়ায় ত্বরে ত্বরে তকাতে হয়। এমনভাবে সাজাতে হবে যেন প্রতিটি টুকরার চারপাশে সমভাবে বাতাস চলাচল করতে পারে। কাঠের ফলি এলোমেলোভাবে বা বাঁকা করে সাজানো যাবে না। এতে করে কাঠ বেঁকে যেতে পারে। তবে এ পদ্ধতিতে কাঠ সিজনিং হতে কমপক্ষে এক মৌসুম লাগে এবং আর্দ্ধতার পরিমাণ ২০% এর কাছাকাছি থাকে।



চিত্র : এয়ার ড্রাইং

২। কিলন পদ্ধতি

সাধারণত বেশি কাঠ একসাথে সিজন করার জন্য কিলন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কিলন পদ্ধতিতে একটি বড় পাকা বায়ুনিরপেক্ষ কক্ষে কাঠের তক্তার গায়ে না লাগে এবং দুইটি তক্তার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে। এ কাজটি করার জন্য দুইটি তক্তার মধ্যবর্তীস্থানে ৩-৪ সেমি পুরুদুইটি কাঠের টুকরা দুইপাশে বসাতে হবে যাতে দুটি তক্তার মধ্যবর্তীস্থান দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে। অতঃপর বায়ুনিরপেক্ষ কক্ষে প্রথমে জলীয়বাস্প প্রবেশ করিয়ে কাঠের পানির পরিমাণ বৃক্ষি করতে হবে। পরবর্তীতে তাপ প্রয়োগ করে সে কক্ষ থেকেও একই সাথে কাঠ থেকে পানি বের করে নেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে কাঠকে তিনি সঙ্গাহের মধ্যে সিজনিং করে পানির পরিমাণ ১২% এ নামিয়ে আনা যায়। তবে প্রজাতিভেদে সিজনিং এর সময় কম বেশি হতে পারে।

কাঠ সংরক্ষণ

কাঠ ট্রাইমেটের মূলনীতি হলো দ্রবণাকারে রাসায়নিক দ্রব্য কাঠ ও বাঁশের মধ্যে চুকিয়ে দেওয়া। সিসিএ (CCA) নামের রাসায়নিক দ্রব্যটি সংরক্ষণী হিসাবে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। সিসিএ সংরক্ষণটি তিনি উপাদানের সমষ্টিয়ে গঠিত। এর মধ্যে রয়েছে ক্রোমিক অক্সাইড ৪৭.৫%, কপার অক্সাইড ১৮.৫%, আসেনিক পেন্টা অক্সাইড ৩৪%, সিসিএ এর মিশ্রণ বাজারে পাওয়া যায়। উপাদানগুলো পৃথক পৃথকভাবে কিনে ও আনুপাতিক হারে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করা যায়। পানিতে মিশ্রণটি ২.৫% দ্রবণ তৈরি করা হয়। দ্রবণটি বিশেষ চাপ পদ্ধতিতে কাঠের মধ্যে চুকানো হয়। প্রতি ঘনফুট কাঠে সাধারণভাবে ০.৪ পাউন্ড সংরক্ষণী প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। এ পদ্ধতিতে কাঠ সংরক্ষণের ৭ দিন পর ব্যবহারযোগ্য হবে। সিসিএ সংরক্ষণী দিয়ে সংরক্ষিত কাঠ পচন প্রতিরোধ করতে পারে। উইপোকার আক্রমণও প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

বৃক্ষ কর্তন সংরক্ষণের উপযোগিতা

গাছ লাগানো ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিচর্যার মাধ্যমে সেগুলো বড় করে তোলার পিছনে নানা উদ্দেশ্যে থাকে। তবে যে উদ্দেশ্যেই গাছ লাগানো হোক না কেন সুনির্দিষ্ট আবর্তনকাল শেষে পরিপন্থতা লাভ করলে গাছ কর্তন করাই শ্রেণ। কারণ নির্দিষ্ট সময় পরে গাছের কাঠের মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া অনেক সময় গাছের বাকল ফেটে বা রোগাত্মক হয়ে থারে থারে অভ্যন্তর ভাগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। তাছাড়া গাছ কখন কাটতে হবে তা নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর। যেমন-

- ১। কাঠ দিয়ে কী করা হবে ?
- ২। কোন পরিমাপের কাঠ প্রয়োজন ?
- ৩। কী মানের কাঠ প্রয়োজন ?
- ৪। এখনই টাকার প্রয়োজন কিনা ?
- ৫। গাছ আরও বড় হয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকা ডালপালায় হোয়ে যেতে পারে কিনা ?
- ৬। কাঠে গাছের ডাল ভেঙে বা গাছ উপত্তে পত্তে ছাপনা বা জানমালের ক্ষতির কারণ হতে পারে কিনা ?
- ৭। গাছ কোনো বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়েছে কিনা ?
- ৮। গাছের আবর্তন কাল শেষ হয়েছে কিনা ?

যে কারণেই গাছ কাটা হোক না কেন নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন মেনে কাটতে হবে। গাছ ও সঠিক নিয়মে কর্তন এবং খতিত করণের মাধ্যমে অপচয় রোধ করা যায়। আর ব্যবহারের আগে বিজ্ঞান সম্বন্ধ সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। বৃক্ষ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। কোনো বন এলাকায় বছরে কী পরিমাণ কাঠ বৃক্ষ পার সব সময় তার চেয়ে কম কাঠ আহরণ করতে হবে। এর ফলে বনজ সম্পদ সংরক্ষিত হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে গোল কাঠ বা তক্তা পরিমাণ করে পরিশোধের পদ্ধতি সম্পর্কে লিখে জমা দেব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উপকূলীয় বনায়ন

উপকূলীয় বনায়নের ধারণা

বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে লবণ্যাঞ্চল ও উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে প্রাকৃতিক বন রক্ষা ও সৃষ্টি হৃষির মুখে পতিত হয়েছে। এসব উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য সারা দেশের পরিবেশের উপর নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এজন্য বিস্তৃত উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ্যাঞ্চল রোধী, জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড়ে টিকে থাকতে পারে এমন বৃক্ষ প্রজাতি রোপণ এবং লবণ্যাঞ্চল সহকারী ফসলের চাষ করে উপকূলীয় সবুজ বেটনী সৃষ্টি করা আবশ্যিক। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে মানুষ, পশু-পাখি ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা ছাড়াও উপকূলবাসী আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবে।

উপকূলীয় বনায়নের জন্য ব্যবহৃত গাছের বৈশিষ্ট্য (ঝাউ গাছ ও দেবদারগাছ)

উপকূলীয় বনায়নকে লোনামাটির অঞ্চলও বলা হয়। লোনা মাটির অঞ্চল বাগেরহাটি, খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, বরগুনা, ডেলা, বরিশালের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা ও তৎসংলগ্ন জেগে ওঠা চৰাঘলসমূহ। এসব অঞ্চলের প্রধান প্রধান বন বৃক্ষ প্রজাতিসমূহ - নারিকেল, আমড়া, খেজুর, বাবলা, কাজুবাদাম, শিরিয়, রেইনট্রি, তাল, তেঁতুল, সুপারি, জলপাই ইত্যাদি। তবে উপকূলীয় অঞ্চলের উদ্ধিদে হিসাবে ঝাউ ও দেবদারগাছও উল্লেখযোগ্য। এসব উদ্ধিদের মরুজ বৈশিষ্ট্য থাকায় লবণ্যাঞ্চল সহজ করে উপকূলীয় আবহাওয়ার সাথে সহজে খাপখাইয়ে নিতে পারে। উপকূলীয় অঞ্চলের অধিক লোনাবৃক্ষ মাটিতে সুপারি, গেওয়া, কেওড়া, কাঁকড়া, বাইন, গরাম, গোলপাতা ইত্যাদি ভালো জন্মে। লবণ্যাঞ্চলের সাথে খাপখাওয়াতে এসব উদ্ধিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

- উপকূলীয় বনায়নের জন্য বেশি এলাকা জুড়ে শিকড় বিস্তৃত থাকে এরকম গাছ নির্বাচন করতে হবে। এ জন্য উপকূলীয় বনে নারিকেল, সুপারি বা অন্যান্য একবীজপত্রী উদ্ধিদের পরিমাণ বেশি থাকা বাস্তব। এদের শিকড় অনেক এলাকা জুড়ে থাকে বলে মাটি কয় রোধ করা সহজ হয়। তবে উপকূলীয় বাঁধের বনায়নের ক্ষেত্রে সড়কের পাশের মতো একাধিক স্তরে গাছ লাগাতে হবে। এতে মাটি ক্ষয় কর হবে।
- অন্যান্য বাঁধের মতো উপকূলীয় বাঁধের ক্ষেত্রে যেখানে গাছ লাগানো হয় সে স্থান বেশ ঢালু হয়। তাই সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগাতে হবে। প্রথম লাইন যেখান শুরু হবে বিভিন্ন লাইন তার বরাবর না হয়ে যথবেতী স্থান থেকে শুরু করা হয়। দূরে দূরে গাছ লাগানো হলেও প্রকৃত পক্ষে একটি চারা থেকে অন্য চারার দূরত্ব হবে ২ মিটার \times ১ মিটার। এর ফলে মাটির ক্ষয়রোধ ক্ষমতা বাঢ়বে।
- উপকূলীয় উদ্ধিদের মরুজ বৈশিষ্ট্য থাকে যেমন পাতার কিউটিকল স্তর খুব পুরু হয়। এ কারণে এসব উদ্ধিদ খরা প্রতিরোধক হয়।
- ঘূর্ণিঝড় সাইক্রোনের মতো দুর্যোগ ঘোকাবেলা করে টিকে থাকতে পারে। কারণ এসব উদ্ধিদের কান্ত বেশ জমা ও শক্ত হয় এবং শার্ষা-প্রশার্ষা কর হয়। যেমন- নারিকেল, গজারি, খেজুর, তাল, ঝাউ,

আকাশমনি, বাবলা, দেবদারু প্রভৃতি।

- উপকূলীয় বাঁধসমূহ দুর্ঘটনার সময় গরু-ছাগলের আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয় কাজেই গাছলাগানের সময় গো-বাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয় এরকম গাছও লাগাতে হয়। যেমন- ইপিল-ইপিল, আকাশমনি, ধৈর্যা প্রভৃতি।
- যে সব উদ্ভিদ জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে উপকূলীয় বনায়নের জন্য যে সব উদ্ভিদ লাগাতে হবে।
- উপকূলীয় বনায়নে শক্ত ও লম্বা কাণ্ড এবং ছেট পাতা ও ডালপালা কর্তৃল সহনীয় গাছ নির্বাচন করতে হবে। যেমন:- শিশি, বাবলা, কড়ই, খেজুর, তাল ইত্যাদি উদ্ভিদ।

ঝাউ গাছ

বর্ণনা : ঝাউ বৃহৎদাকার চিরসবুজ বৃক্ষ। উচ্চতা ১৫-১৮ মিটারের মতো হয়ে থাকে। বাকল বাদামি ও অমসৃণ। কাঠ খূব শক্ত তবে ফেটে যায়। মে মাসে ফুল হয়। ফল পাকতে এক বছর সময় লাগে। ঝাউ গাছ বনায়নের জন্য বেলেমাটি খুবই কার্যকরী।

প্রক্রিয়ান্তর: প্রধানত উপকূলীয় এলাকা তবে দেশের বিভিন্ন স্থানেও ঝাউ গাছ জন্মে থাকে।

বীজ : মে-জুন মাসে-বীজ সংগ্রহ করা হয়।

চারা উন্নেলন : ফেব্রুয়ারি মাসে ঝাউয়ের চারা উন্নেলন করা হয়।

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি : ফল সরাসরি গাছ থেকে পাঢ়তে হয়। ভালোর গোড়ার ফল ভালো পরিপন্থ হয় তাই এ ফল সংগ্রহ করা উচ্চম। ২-৩ দিন রোদে উকিয়ে লাঠি দিয়ে মাড়াই করে বীজ খোসা থেকে আলাদা করা হয়।

বীজ সংরক্ষণ : বীজ রোদে উকিয়ে বায়ুরোধক পাত্রে ৫-৭ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

বীজ বপন পদ্ধতি

জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি মাসে বীজ তলায় অথবা পলিব্যাগে বীজ বপন করা হয়। বীজতলা ও পলিব্যাগে পরিশেষিত বালির সাথে মিশিয়ে বীজ বপন করা সুবিধাজনক। বীজ গজাতে ২৫-৩০ দিন সময় লাগে। চারা গজানের আগেই ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ৪০-৫০ দিন পর ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা সরিয়ে ফেলতে হবে।

চারা বাহাই ও রোপণ পদ্ধতি

বীজ তলায় অতিক্রিক্ষ চারা গজালে কিছু চারা তুলে ফেলতে হয়। আগাছা বাহাই করতে হয়। পলিব্যাগে চারার শিকড় পলিব্যাগের বাইরে এলে কেটে দিতে হয়। ঝাউ গাছ দ্রুত বর্ধনশীল গাছ। ৬ মাস বয়সী বড় চারা রোপণ করা উচ্চম। বালিয়াড়ি ও লোনা যাইতে ঝাউ গাছ ভালো হয়। এ জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের বনায়নের ঝাউ গাছ লাগানো হয়।

ব্যবহার

কোণাকৃতি বিশিষ্ট হওয়ায় সৌন্দর্যের জন্য সড়ক, মহাসড়কের পাশে রোপণ করা হয়। মাটিতে নাইট্রোজেন উৎপাদনের ক্ষমতা থাকায় এ গাছ উপকূলীয় অঞ্চলে বেশি লাগানো হয়। জ্বালানি হিসাবে এ কাঠ উৎকৃষ্ট। কাঠ খূব শক্ত তাই খুঁটি ও খড়িকাঠ হিসাবেও ব্যবহার হয়।

দেবদারু

বর্ণনা : চির হরিৎ বৃক্ষ, কাণ্ড মোটা, সোজা ও অতি উঁচু হয়। সাধারণত শোভাবর্ধন হিসাবে রোপণ করা হয়ে থাকে। গাছ ৫০-৬০ মিটার লম্বা হয় এবং ৫০০-৬০০ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে। পাতাগুলো গাঢ় সবুজ, ঘোগিক, দেখতে অনেকটা বর্ণীর মতো কিন্তু কিনারা ঢেউ খেলানো। সাধারণত অক্তোবর মাসে ফুল হয়, তারপর ফল এবং পাকে দেরিতে। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই এ গাছ পাওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহের সময় : জুলাই-আগস্ট।

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি : পাকা ফল কালো রঙের হয়। ফল পাকলে গাছ থেকে বা গাছ তলা থেকে সংগ্রহ করে বন্ডায় রেখে পচিয়ে পানিতে ধূয়ে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। দেবদারু বীজ সংরক্ষণ করা যায় না বলে সংগ্রহ করার সাথে তা বীজ তলায় বা পলিব্যাগে বপন করতে হয়।

বীজ বপন পদ্ধতি : প্রতি পলিব্যাগে ২টি করে বীজ বপন করতে হয়। প্রাথমিকভাবে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম হার শতকরা ৯০ ভাগ। ৭-১৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম সম্পন্ন হয়।

চারার বয়স রোপণের সময় : দেড় থেকে দুই বছর বয়সের চারা সড়কের পাশে, বাগানের ও উপকূলীয় অঞ্চলে জুন-জুলাই মাসে রোপণ করা উচ্চম।

ব্যবহার : দেবদারু কাঠ হালকা ও নরম। টিনের ধারের ক্রেম, পাটাতন, দেশলাই ও প্যাকিং বক্স তৈরিতে দেবদারু কাঠ ব্যবহার হয়। কাগজের মণি তৈরিতেও দেবদারু কাঠ ব্যবহৃত হয়।

উপকূলীয় বনায়নের উপযোগিতা

উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেটনী তৈরি ও তা সংরক্ষণ করা গেলে বহুবিধ উপকার সাধিত হবে। উপকূলীয় পরিবেশ রক্ষা ভূমির উর্বরতা বৃক্ষ, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্রোন ও টর্নেডোর প্রকোপ থেকে উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষণ করা। জুলানি ও খাদ্যের চাহিদা মোটানো, অর্থ উপার্জন, ভূমিক্ষয় রোধ ইত্যাদি প্রয়োজনে উপকূলীয় বনায়ন সৃষ্টি ও তা রক্ষণাবেক্ষণ করা একান্ত অপরিহার্য। উপকূলীয় বনাঞ্চলের উপযোগিতা সমূহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নরূপ উপায়ে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

ক) পরিবেশগত উপযোগিতা

- এ বনাঞ্চলের বৃক্ষরাজি উপকূল অঞ্চলের ভূমিক্ষয় রোধ করে। ভূমির উর্বরতা বৃক্ষ করে। ভ-নিম্নল পানির ক্ষেত্র বৃক্ষ করে।
- ভূমির লবণ্যাঞ্চল ত্রাস করে পরিবেশ জীববৃক্ষের বাস উপযোগী করতে সাহায্য করে।
- পরিবেশের অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় রাখে, উত্তাপ সৃষ্টি রোধ করে এবং বাতাস পরিশোধন করে।
- উপকূলীয় সবুজ বেটনী উপকূলীয় অঞ্চলে সৃষ্টি সামুদ্রিক বাত, জলোচ্ছাস ও সাইক্রোনের ক্ষেত্র থেকে মানুষ ও জীব জন্মকে রক্ষা করে।
- ভূমিক্ষয়, বালিয়াড়ি ও বাড়িরোধ করে এবং বৃষ্টিপাত হতে সহায়তা করে।

- এ বনাঞ্চল মানুষ, পাখি, জীবজন্তু ও পোকামাকড়ের নিরাপদ আবাস তৈরি ও রক্ষা করে এবং খাদ্যের যোগান দেয়। ফলে অত্য এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় থাকে।
- উপকূলীয় বনায়ন আমাদের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবন ও এর জীবজন্তুকে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবী বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বন হিসাবে খ্যাত এ সুন্দরবনকে রক্ষা করতে উপকূলীয় সাভানা বেঠনী সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই।

খ) নান্দনিক উপযোগিতা

উপকূলীয় বনায়নের ফলে যে নির্মল সবুজ বেঠনী তৈরি হয় তার নান্দনিক সৌন্দর্য অভূতপূর্ব। এ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে দেশ-বিদেশের বহু ভ্রমণ বিদ্যাসী মানুষের সমাগম ঘটে। হরেক রকম পন্থপাথির আবাসস্থল তৈরি হয় যা পরিবেশের অসীম উপকার সাধন করে এবং নান্দনিকতায় নবতর সংযোজন ঘটায়।

গ) অর্থনৈতিক উপযোগিতা

- উপকূলীয় বনাঞ্চলে বৃক্ষরাজির অর্থনৈতিক উপযোগিতা অপরিসীম। এ বনাঞ্চলে ভূমনকারী দেশ-বিদেশের পর্যটকদের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের পথ সম্প্রসারিত হয়। যার ফলে জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।
- ফলজ উন্নয়ন- নারিকেল, খেজুর, তাল, কলা, আম প্রভৃতি থেকে উৎপাদিত ফসল উপকূলীয় মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়।
- বনাঞ্চলে উৎপাদিত মধু ও মোম থেকে অর্থ উপার্জিত হয়। মুল, ফল ও পত্রবন্ধন থেকে খাদ্যশস্য, শাকসবজি, পাখির খাদ্য, পন্থখাদ্য পাওয়া যায়।
- উদ্ভিদরাজির কাণ্ড ও শাখা থেকে ঝুলানি কাঠ, খুঁটি, আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি, যানবাহন, কৃষি উপকরণ, রেলওয়ে স্ট্রিপার ইত্যাদি পাওয়া যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে উপকূলীয় বনায়নের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পাহাড়ি বনভূমির পরিমাণ-

- ক. ১২.১৬ লক্ষ হেক্টর
- গ. ১৪.১৬ লক্ষ হেক্টর

- খ. ১৩.১৬ লক্ষ হেক্টর
- ঘ. ১৫.১৬ লক্ষ হেক্টর

২. নিচের কোন বৃক্ষগুচ্ছ পাহাড়ি বনের?

- ক. গজল, গুড়ান, পামার
- গ. তেলসুর, চম্পা, চাপালিকা

- খ. গজারি, গেওয়া, সেগুন
- ঘ. জাবুল, রেইনট্ৰি, পতুর

৩. বাংলাদেশের অধিকাংশ বনভূমি অবস্থিত-

- i. দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে।
- ii. দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে।
- iii. উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- গ. ii ও iii

- খ. i ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের উচ্চীগুণটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

তিয়া টেলিভিশনের একটি চ্যানেলে বনের উপর প্রামাণ্য চিত্র দেখছিল। এক পর্যায়ে সে দেখতে পেল এই বনের অধিকাংশ গাছেরই অঙ্কুরোদগম ফল গাছে থাকা অবস্থায়ই হচ্ছে এবং চারা গাছ গজানোর পর তা মাটিতে পড়ে কানায় পেঁথে যাচ্ছে।

৫. তিয়ার দেখা অঙ্কুরোদগম নিচের কোন উক্তিদে দেখা যায়?

- ক. গুড়ান
- গ. গজল
- খ. গামার
- ঘ. গজারি

৬. তিয়ার দেখা বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হলো -

- i. মাটি কর্মসূক্ষ থাকে।
- ii. বায়ুবীয়মূল বিদ্যমান।
- iii. শাখামূল নীঁঁঁ হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- গ. ii ও iii
- খ. i ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

১. জামান সাহেব কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ মতে তার বাড়ির দক্ষিণ দিকে পুকুর পাড়ে উচ্চ ৪ শতক জমিতে মেলজিয়াম বীজ রোপণ করেন। এ জন্য তিনি ১৫ সেমি \times ১০ সেমি আকারের পলি ব্যাগ ব্যবহার করেন। এতে করে জামান সাহেব ব্যাপক সফলতা লাভ করেন।
 - ক. নার্সারি কাকে বলে?
 - খ. নার্সারি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
 - গ. জামান সাহেবের নার্সারির চারার সংখ্যা নির্ণয় কর।
 - ঘ. জামান সাহেবের সফলতার কারণ বিশ্লেষণ কর।
২. সুফিয়া বেগম বাড়ি তৈরির সময় গৃহে ব্যবহারের জন্য ২০ বছর পূর্বে লাগানো দুইটি মেহগনি গাছ কেটে ফেলেন। গাছ দুইটি কাটার সময় শ্রমিকরা কুঠার ব্যবহার করেন। তার গাছ ২টির লগের দৈর্ঘ্য ছিল ৮ মিটার, চিকন মাথার বেড় ২ মিটার, মাঝের অংশের বেড় ২.৫ মিটার ও মোটা মাথার বেড় ছিল ৩ মিটার।
 - ক. কাঠ সিজনিং কী?
 - খ. আবর্তন কালের ভিত্তিতে গাছের, শিখ কোন ধরনের উদ্ভিদ ব্যাখ্যা কর?
 - গ. সুফিয়া বেগমের একটি গাছের ভলিউম নির্ণয় কর।
 - ঘ. সুফিয়া বেগমের গৃহীত কার্যক্রমটি সঠিক ছিল কি না বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কৃষি সমবায়

একই উদ্দেশ্যে এক জোট হয়ে কোনো কাজ করা সমবায়। কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ, কৃষি শাস্ত্রিকীকরণ, ফসল উৎপাদন, সংগ্রহ, সংগ্রহ উন্নত ফসল পরিচর্যা, গুদামজাতকরণ, পরিবহন এবং বাজারজাতকরণ সকল কাজ সমবায়ের সদস্যরা সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সীমিত সংখ্যক কৃষক একমত হয়ে নিজেদের পারম্পরিক সম্পত্তির ভিত্তিতে একটি কৃষি সমবায় গড়ে তুলতে পারেন। সমবায় কৃষকদের নিজস্ব পেশাগত সংগঠন। এইরূপ সংগঠনকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় এবং সহযোগিতা করে। এইরূপ সমবায় দেশে প্রচলিত সমবায় আইন অনুসারে গঠিত হলে সমবায় আইনের আওতায় নিবন্ধন লাভ করতে পারে। এই অধ্যায়ে আমরা কৃষি সমবায় সম্পর্কে আলোচনা করব।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা –

- কৃষি সমবায়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষি সমবায়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনে কৃষি সমবায়ের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারব।

প্রথম পরিচেছন

কৃষি সমবায়ের ধারণা ও গুরুত্ব

বিষয়টি বুঝতে খেলা দিয়েই শুরু করা যাক। পাড়ায় বা মহল্লায় কিশোর কোনো খেলা, ধরা যাক ক্রিকেট বা ব্যাডমিন্টন, বা টেবিল টেনিস খেলতে চাও। কী করা হেতে পারে? প্রথম কাজ খেলার সাথি সংগ্রহ করা। খেলার স্থান নির্বাচন করে রেফারি ঠিক করা ও মুদ্রিতদের অনুমতি নেওয়া। এরপর খেলার সামগ্রী, ক্রিকেট হলে ব্যাট, বল, স্ট্যাম্প, ব্যাডমিন্টন হলে নেট, নেটের খুঁটি, কর্ক, ব্যাট, টেবিল টেনিস হলে টেবিল, ব্যাট, বল এন্ডো কেনা। সাথীরা সবাই মিলে টাকা একত্র করে এন্ডো কেনা। আবার তহবিলে কিছু অর্থ যেন থাকে যা থেকে খেলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ফুরিয়ে যাওয়া সামগ্রী কেনা যায়। আরেকটি অতি দরকারি কাজ হলো, তহবিলের আয় ব্যয়ের হিসাব নিয়মিত সংরক্ষণ করা। একে মেটামুটি বলা যায় যে, সমবায় পদ্ধতিতে খেলা।

কৃষিকাজ সম্পর্ক করতে এবং কৃষি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সমবায় পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। একে আমরা বলব কৃষি সমবায়। কৃষি সমবায়গুলো সাধারণত এলাকাভিত্তিক বা আধুনিক কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় কৃষি বেশ ব্যবহৃত হয়ে পড়েছে। তাহাত্তা কৃষক উৎপন্ন ফসল ধরে রাখতে পারেন। বাস্পার ফসল হলে ফসলের দাম পড়ে যায়। কোনো কোনো সময় এতোটাই পড়ে যায় যে উৎপাদন ব্যয়ও উঠে আসে না। যদি এলাকায় তাদের নিজস্ব ফসল প্রতিলাভাত্তকরণ কেন্দ্র ও বড় গুদাম থাকতো তাহলে এই আর্থিক ক্ষতি এড়ানো যেত। কোনো একজন কৃষকের পক্ষে (খুব বড় ও ধর্মী কৃষক না হলে) এই সুবিধাগুলো অর্জন সম্ভব না হলেও প্রত্যেক সমবায়ী কৃষক তার জমি ও পুঁজির আনুপাতিক হারে মুনাফার শরিকানা লাভ করবেন, সাধারণত এটাই সমবায়ের ভিত্তি।

আম বাংলায় একটা প্রবাদ আছে: ‘দশের শাঠি একের বোঝা’। অর্থাৎ একজনের পক্ষে যে কাজ অবহনযোগ্য বোঝা, দশজন একজন হলে সেই বোঝা বরং সহজেই বহনযোগ্য হতে পারে।

কৃষি সমবায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারে কৃষকদের সক্ষম করে তুলতে পারে। পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তিসমূহ যেমন শস্যপর্যায় অবলম্বন, নিবিড় ও সমষ্টিত চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার, সমষ্টিত বালাই দমন পদ্ধতি ব্যবহার করে ফসলের নিরাপত্তা বিধান, যান্ত্রিক উপায়ে ফসল সংগ্রহ ও সংস্থান উন্নত পরিচর্যা, পরিবহন, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন সকল ক্ষেত্রেই কৃষি সমবায় উচ্চমাত্রার সক্ষমতা এনে দিতে পারে এবং এভাবে উচ্চ মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করতে পারে। তনুপরি কৃষি সমবায় কৃষককে হঠাৎ বিপর্যয় সহনশীলতাও জোগায়। ফলে “দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ” এমন সন্ধাবনা সৃষ্টি হয়। এবার আমরা কৃষি সমবায়ের কিছু উপযোগিতা একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

সমবায়ের প্রকার

উদ্দেশ্য অনুযায়ী কৃষকরণ নানা ধরনের সমবায় গড়ে তুলতে পারেন।

- ১। কৃষি মূলধন সমবায় (সঞ্চয় সমবায়) : সমবায়ের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ
- ২। কৃষি উপকরণ সমবায় : বীজ, সার, ঔষধ, যন্ত্রপাতি, পরিবহন, গুদাম ইত্যাদি সংগ্রহ ও ব্যবহার
- ৩। কৃষি উৎপাদন সমবায় : কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
- ৪। কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সমবায় : পণ্যমূল্য নির্ধারণ, ভর্তুকি প্রচলণ, কৃষিপণ্য বিক্রয় এবং এতদসত্ত্বাত্মক হিসাব রক্ষার জন্য।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কৃষি সমবায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লিখবে এবং উপস্থাপন করবে।

বিতীয় পরিচেছে

কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার

কৃষি উপকরণগুলোকে মোটা দাগে আমরা কয়েকভাগে ভাগ করতে পারি। আমরা দেখব যে সমবায়ের মাধ্যমে এই সকল উপকরণ যেমন উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা যায় তেমনি এ সকল উপকরণের সর্বোচ্চ লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

কৃষি জমি : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট এই উভয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় দেখা যায় যে, সর্বনিম্ন এক হেক্টের জমি না হলে একটি লাভজনক কৃষি খামার পরিচালনা করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক এর চাইতে অন্তর্ভুক্ত কৃষি জমির মালিক। এমন কী যাদের আড়াই একর বা তার কিছু বেশি পরিমাণ কৃষি জমি রয়েছে তাঁরাও তাঁদের কৃষিকাজের আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে দামি যন্ত্রপাতি কিনতে সক্ষম নন। যদি কোনোভাবে কিনেও ফেলেন এই যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারেন না। নিজের কাজ শেষে হয় যন্ত্রটি বসিয়ে রাখতে বা ভাড়ায় দিতে হয়। সমবায়ের মাধ্যমে অনেক জমি একই ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা যায়। সেই ফেজে অন্যান্য সকল কৃষি উপকরণের সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সমবায়ীগণ সম্ভত হলে কিছু জমিকে জলাধারে জলপানের কারণে বর্ষার পানি ধরে রাখা যায়, যা থেকে প্রয়োজনের সময় সেচের পানি পাওয়ার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা যায়। অর্থাৎ তুলনামূলক নিচু জমিও সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যায়। দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারলে সমবায়ের আওতায় জমির পরিমাণ চার পাঁচশত হেক্টর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। তবে জমির পরিমাণ বাড়ার পাশাপাশি জমি ব্যবহার পরিকল্পনা চেলে সাজানো প্রয়োজন হবে।

পানি : কৃষিকাজের জন্য পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানি ছাড়া কোনো ধরনের কৃষিকাজই চালানো সম্ভব নয়। কয়েক দশক আগে আমাদের দেশে কৃষিকাজের জন্য গভীর নলকূপের সুপারিশ করা হতো। অভিজ্ঞতার

মাধ্যমে আমরা জেনেছি যে গভীর নলকূপের অতি ব্যবহার পরিবেশ বাস্তব নয়। সবচাইতে নিরাপদ পানি হলো জলাধারে সঞ্চিত পানি। জলাধারে পানি বর্ষাকালে সঞ্চয় করে সারা বছর সেই পানি ব্যবহার সর্বোত্তম। জলাধার করা, দেখান থেকে পান্তের সাহায্যে সেচ মালা বা পাইপে সমবায়ের আওতাধীন জমিগুলোতে, ব্রহ্ম অপচয়ে, সেচের পানি ব্যবহার করা যায়। ভূ-উপরিষ্ঠ জলাধারে সঞ্চিত পানি দিয়ে সেচ দেওয়ার খরচ তুলনামূলক অনেক কম। তা ছাড়া সেচ ছাড়াও এই জলাধারের পানি অন্যান্য আনুসারিক কাজে লাগে যা লাভজনক।

কৃষি যন্ত্রপাতি : কৃষির আধুনিকায়নের জন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রয়োজন। পাওয়ার টিলার, ট্রান্স্টির থেকে শুরু করে বহু ধরনের যন্ত্রপাতি ফসল উৎপাদন, পশ্চ-পাখি, মৎস্য পালন তথা সার্বিক কৃষিকাজে ব্যবহার করা যায়। এ সকল যন্ত্রপাতি তন্ম, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ যত সহজে সমবায়ের মাধ্যমে করা সম্ভব তা ব্যক্তি মালিকানায় সম্ভব নয়। সমবায় পক্ষতিতে যে কোনো কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করলে আমদের কৃষির উৎপাদনশীলতা যে কোনো উল্লত দেশের মানকে ছাড়িয়ে হেতে পারবে।

কৃষির জন্য সার, ঘৃষ্ণ, বীজ, খাদ্য ইত্যাদি উপকরণ সংগ্রহ, উৎপাদন ও ব্যবহার

বীজ, সার, পালিত পশ্চ পাখি মাছের খাদ্য এমনকি রোগবালাই নিরাপক ঘৃষ্ণধেরণ একটা বড় অংশ সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদন করা যায়। সরকারের কৃষি সেবা সংস্থাগুলোও বীজ, সার, ঘৃষ্ণ সরবরাহ করে। সমবায় তার বাস্তরিক প্রয়োজন আগে থেকেই নির্ধারণ করতে পারে এবং সেবাদানকারী সংস্থাগুলোকে সেই তথ্য আগেভাগেই সরবরাহ করতে পারে। এতে জাতীয় কৃষি সেবাদানকারী সংস্থাগুলো সরবরাহযোগ্য উপকরণের মোট চাহিদা সম্পর্কে জেনে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।

কৃষি ঝণ : কৃষিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঝণ যথাসময়ে নিরাপদে প্রাপ্তি কৃষির জন্য খুবই সহায়ক। রেজিস্ট্রিকৃত কৃষি সমবায় হলে ঝণদাতা প্রতিষ্ঠান ঝণ দিতে স্বাক্ষরবোধ করবে। প্রথমত: ঝণ গ্রহীতার নিবন্ধনকৃত পরিচয় রয়েছে, দ্বিতীয়ত: ঝণের অর্ধের সুষ্ঠু ব্যবহারের একটা নিশ্চয়তা রয়েছে, তৃতীয়ত: এবং সর্বোপরি, যথাসময়ে ঝণ পরিশোধের নিশ্চয়তা সমবায় দিতে সক্ষম।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সমবায়ের মাধ্যমে সংগ্রহযোগ্য কৃষি উপকরণের তালিকা তৈরি করবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন

কৃষি পণ্য উৎপাদন : পণ্য শব্দটির ব্যবহার বলে দের যে উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিপণনের জন্যই সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদন করা হচ্ছে। তা সে উৎপাদিত দ্রব্য শস্য, ফুল, ফল, তন্ত, বীজ, বাঁশ, কাঠ, ডিম, দুধ, মাংস, চামড়া, মাছ যাই হোক না কেন। মূল উদ্দেশ্য লাভ বা মুনাফা অর্জন। কৃষি পণ্য উৎপাদন উৎপাদক এবং ভোক্তা অর্থাৎ ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যহানিকর যেন না হয় এবং সেই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব যেন হয়, সেই দিকেও লক্ষ্য রেখে কৃষি পণ্য উৎপাদন জরুরি।

সমবায়টি কোনো কৃষি পরিবেশ অভ্যন্তরে অবস্থিত, কৃষি সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত জমি শ্রেণি, মাটির গুণাগুণ, সমবায়ী পরিবারগুলোর এবং বাজারের চাহিদা ইত্যাদি এবং পরিবেশবান্ধবতা বিবেচনায় নিয়ে উৎপাদনের উপযুক্ত কৃষিপণ্য এবং উৎপাদন পদ্ধতি পরিকল্পনা করে সেই অনুযায়ী উৎপাদন করা যুক্তিযুক্ত। কৃষি ক্ষেত্রে এবং খামারে যাতে কোনো রোগ-বালাইয়ের উপদ্রব না হয়, হলেও যাতে তা কার্যকরভাবে নিরাপদ রাখা যায় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন থাকা দরকার। উৎপাদিত দ্রব্য নিরাপদে সংগ্রহ করার বিষয়টিও জরুরি। সংগ্রহের পর সংরক্ষণ পরিবহনের জন্য কিছু কাজ, যেমন বাছাই-ছাটাই, শ্রেণি বিভাজন, প্যাকেটজাতকরণ বা যথাযথ পাতে ছাপন ইত্যাদি কাজও পণ্যের মানোন্নয়ন ও সংরক্ষণে সহায়ক হয়। উপযুক্ত সময়ে বিপণনের জন্য কম বেশি সময়ের জন্য পণ্য গুদামজাত করে রাখার প্রয়োজন। কৃষি পণ্য গুদামজাত করতে উপযুক্ত এবং কার্যকর পাত্র যেমন প্রয়োজন, তেমনি গুদামের পরিবেশও সৃষ্টি করতে হয়। ধান, গম, ভূট্টা বিভিন্ন প্রকার ডাল ইত্যাদি পণ্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শুকানোর প্রয়োজন হয় এবং বায়ুরোধক পাত্রে রেখে পাকা গুদামে রাখতে হয়। শুধু ধূলী কৃষক না হলে একজনের পক্ষে এই সকল সুবিধা সৃষ্টি সম্ভব নয়। সমবায় এই আয়োজন সহজেই করতে পারে। কৃষি পণ্য বিপণনে আরেকটি কার্যক্রম হলো নিরাপদ পরিবহন। পরিবহনের পাত্র, বাঁচা, প্যাকিং ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্যাকিং নির্ভর করে পণ্যের উপর। শস্য পরিবহনে চট্টের বক্তা উপযুক্ত হলেও সবজি, ফুল-ফলের জন্য কোনোভয়েই উপযুক্ত নয়। এ সকল পণ্যের কোনোটার জন্য বাঁশের বিশেষ টুকরি কিংবা হার্ডবোর্ড কাগজের বাজি দরকার। আবার মাছ পরিবহনের জন্য বাঁশের বিশেষ টুকরি ব্যবহার করা নিরাপদ হলেও মাছের জ্যাক্স পোনা পরিবহনে পানি ভরা বড় পাত্র প্রয়োজন। পোনা এমনভাবে পরিবহন করতে হবে যাতে পোনা অঙ্গীজনের অভাবে মারা না যায়। ডিম পরিবহনের জন্য বিশেষ পাত্র ব্যবহার করা হয় যাতে ভাঁজ করে হাজার হাজার ডিম এক সাথে পরিবহন করা যায়। আবার দুধ পরিবহনে প্রয়োজন বিশেষ পাত্র। বিপণনের সুবিধার জন্য কৃষি সমবায়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট বিপণন সংস্থার আগে থেকে সম্পূর্ণ চুক্তি থাকলে সবচাইতে ভালো হয়। এই আয়োজনও সমবায় ভালোভাবে করতে পারে।

কাজ : শিক্ষাধীন একক কাজ হিসাবে বিপণনের হিসাব নিকাশ/রেজিস্ট্রার্ড খাতায় লিপিবদ্ধ করবে এবং শ্রেণিতে জমা দিবে।

চতুর্থ পরিচেদ

সমবায় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

কৃষি সমবায় সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে আলোচনাগুলো হলো সেগুলো বিবেচনায় নিলে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে, কৃষি সমবায় একটি সমন্বিত কার্যক্রম। সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদনে সক্রিয় হওয়ার পূর্বে এ বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে এই মহৎ কর্মসূজের সূচনা হয় মাত্র। দ্বিতীয় অতি উন্নতপূর্ণ পদক্ষেপ হলো জমি ও অর্ধ সমবায়ে যুক্ত করা। তারও আগে দরকার সমবায়ের মূল শর্ত তথা বিধিগুলো আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা। এ ফ্রেমে রাষ্ট্রীয় সমবায় অধিদণ্ডনের নিকটবর্তী দণ্ডনের সহযোগিতাও চাওয়া যেতে পারে। পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে উপজেলা কৃষি, পশ্চালন ও মহস্য কর্মকর্তাদের। সমবায় অধিদণ্ডন প্রণীত কৃষি সমবায়ের গঠন প্রণালি অনুসরণ করে সমবায় সংগঠন গড়ে তুলে তা যথানিয়মে নথিভুক্ত করা প্রয়োজন। শুধু এক সাথে কৃষিকাজ করার জন্য একমত হয়ে, কোনো সংগঠন না গড়ে নিলে এইরূপ সমবায় বেশি দূর এগোতে পারে না। বরং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে এর অকাল মৃত্যু ঘটাই স্বাভাবিক। মোদ্দা কথা হলো, সমগ্র কৃষিকাজ, কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের জন্য একটি দক্ষ সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে এটিই সমবায় সংগঠন। কৃষি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন সকল হিসাব পাই পাই রক্ষা করবে এই সংগঠন। মুনাফা প্রত্যেক সমবায়ীর বিনিয়োগের পরিমাণ অনুযায়ী বল্টনের দায়িত্বও এই সমবায় সংগঠন পালন করে। সরকারের বা সরকারি বে-সরকারি সেবা সংস্থাগুলোর অনুদান, ভঙ্গুরি, সেবা প্রাপ্তি করবে এবং হিসাব রাখবে। কৃষি পণ্য ক্রেতা সংস্থা, কোম্পানি বা ব্যক্তির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি করবে এবং তদানুযায়ী ব্যবসা করবে। সমবায়ীদের সাধারণ সভার কাছে সমবায়ের কার্যনির্বাচী কর্তৃপক্ষ দায়ি থাকবে এবং সম্মত হিসাব উপস্থাপন করবে।

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি সমবায় সংগঠন কৃষি সমবায়ের হৃৎপিণ্ড। এই সংগঠন যত দক্ষ, সৎ ও শক্তিশালী হবে সমবায়ীরা ততই সাভবান হবেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কৃষি সমবায়ের উপযোগিতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং উপস্থাপন করবে।

অনুশীলনী

বছনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পরিবেশ বাস্তব কৃষি প্রযুক্তি কোনটি ?

ক. বালাইনাশক ব্যবহার

গ. শস্য পর্যায় অবলম্বন

খ. রাসায়নিক সার ব্যবহার

ঘ. গুদামজাত করপের রাসায়নিক দ্রব্যব্যবহার

২. কৃষি পণ্যের মানোভ্রান্তি প্রয়োজন -

i. ফসলের মান অনুযায়ী সঞ্জিতকরণ।

ii. যথাযথভাবে উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ।

iii. সঠিক ভাবে ফসলের পরিচর্যা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i & ii

খ. i & iii

গ. ii & iii

ঘ. i, ii & iii

নিচের উক্তীপক্টি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সিদলাই গ্রামের কৃষকগণ দীর্ঘদিন ধরে পানি সেচের অভাবে কাজিত ফসল উৎপাদন করতে পারছিলেন না। তাদের এ সমস্যা সমাধানে কৃষি কর্মকর্তা আলম সাহেবের সহযোগিতায় গড়ে তোলেন নব জাগরণ কৃষি সম্বায় সমিতি। লাগসই ও পরিবেশ বাস্তব প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে সিদলাই গ্রামের কৃষকগণ আজ এই এলাকার আদর্শ স্বরূপ।

৩. এই সমিতির মাধ্যমে এলাকার কৃষকগণ লাভ করেন-

i. উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা

ii. উচ্চ মুনাফা অর্জনের নিশ্চয়তা

iii. রাসায়নিক সার ব্যবহারের সুফল

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i & ii

খ. i & iii

গ. ii & iii

ঘ. i, ii & iii

৪. এই গ্রামের কৃষকগণ উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য পরিবেশ বাস্তব কোন পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন ?

ক. অগভীর নলকৃপ খনন

খ. গভীর নলকৃপ খনন

গ. ভূ-উপরিষ্ঠ জলাধার নির্মাণ

ঘ. পান্থের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা

সূজনশীল প্রশ্ন

১. পরিমল বাবু, গোমেজ বাবু যশোর জেলার মনিপুর গ্রামের বাসিন্দা। বসতবাড়ি ব্যতীত তাদের সামান্য আবাদি জমি রয়েছে। তাদের প্রতিবেশী কৃষকদেরও একই অবস্থা। ফলে সকলেই সাংসারিক খরচ চালাতে হিমশিম খান। যুব উন্নয়ন কর্মীর পরামর্শে পরিমল বাবুর নেতৃত্বে উক্ত গ্রামের কৃষকরা সমবায় সমিতি গঠন করে কৃষি ক্ষেত্র পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করলেন। অপরদিকে গোমেজ বাবুর নেতৃত্বে সমবায়ের মাধ্যমে 'ফুল নার্সারি' স্থাপন করে বিভিন্ন কাজে সবাই নিয়োজিত হয়ে গেলেন। এতে অঙ্গ সময়েই তারা আয়ের মুখ দেখতে পেলেন।

ক. কৃষি সমবায় কাকে বলে?

খ. সমবায় ব্যবস্থা কীভাবে অপরকে সঞ্চয় হতে শেখায় ব্যাখ্যা কর।

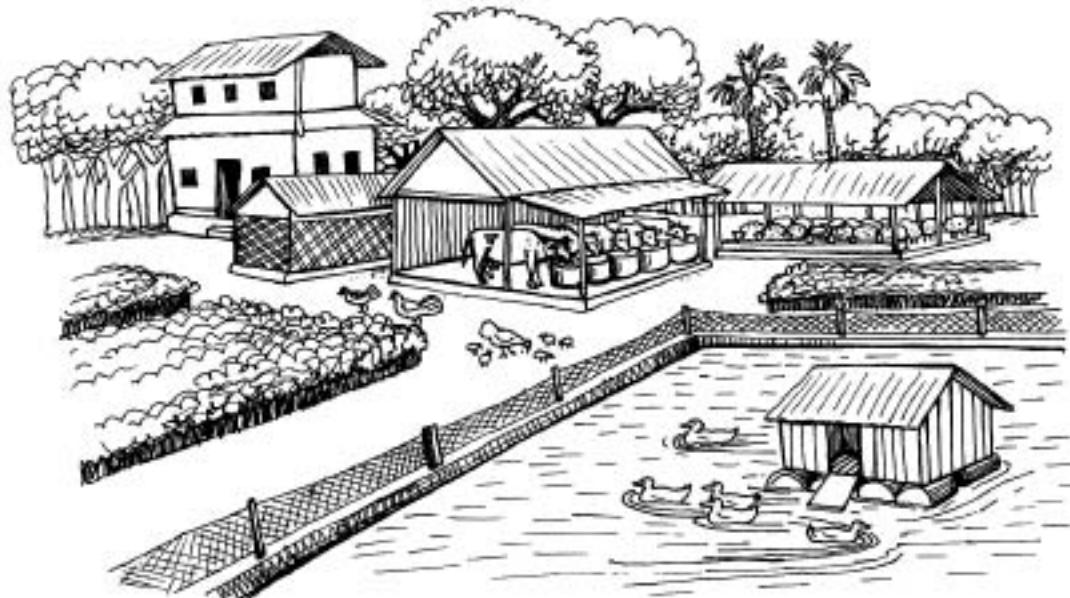
গ. পরিমল বাবুর গৃহীত কার্যক্রমের ধারা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্তীপকে উল্লিখিত অঙ্গলে কৃষকদের আয় বৃক্ষিতে গোমেজ বাবুর নেতৃত্বের যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

সপ্তম অধ্যায়

পারিবারিক খামার

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি এদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। এদেশের কৃষক প্রাচীনকাল থেকেই পারিবারিক কৃষি খামার পরিচালনা করে আসছে। এদেশের কৃষক তার খামারে শস্য, গবাদিপণ, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য উৎপাদন করে। এ অধ্যায়ে পারিবারিক কৃষি খামারের ধারণা ও গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- পারিবারিক কৃষি খামারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পারিবারিক কৃষি খামার তৈরির কলাকৌশল ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কৃত্য আয়ের উৎস হিসাবে পারিবারিক কৃষি খামারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পারিবারিক দুর্ঘ খামার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের বর্ণনা করতে পারব।
- দুর্ঘ দোহন ও সংরক্ষণের সন্তান ও আধুনিক পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পারিবারিক খামারের তথ্য লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- খামারের উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।

প্রথম পরিচেছন

পারিবারিক কৃষি খামারের ধারণা ও গুরুত্ব

পারিবারিক খামার

বাংলাদেশের কৃষক পরিবার কৃষি খামারের মাধ্যমেই শস্য, শাকসবজি, গবাদিপত্তি, ইঁস-মুরগি ও মৎস্য উৎপাদন করে থাকে। আকার অনুযায়ী খামার বাণিজ্যিক ও পারিবারিক হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক কৃষি খামার আবার বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক খামারের জন্য বেশি পরিমাণ মূলধন ও লোকবল প্রয়োজন হয়। কিন্তু পারিবারিক খামারের জন্য কম মূলধন প্রয়োজন। পারিবারিক কৃষি খামার পরিবারের ভরণপোষণ মিটিয়ে কখনো কখনো কিন্তু অতিরিক্ত আয় করে থাকে। বর্তমানে কৃষক পারিবারিক কৃষি খামার থেকে আয় করার চিন্তা মাথায় রেখে খামার স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। মূলত পরিবারের সদস্য ভারাই পারিবারিক কৃষি খামার পরিচালিত হয়।

পারিবারিক কৃষি খামারের গুরুত্ব

- ১। পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটায়।
- ২। অতিথি আপ্যায়নে ভূমিকা রাখে।
- ৩। পরিবারের বেকার সদস্যদের কর্মক্ষেত্র তৈরি করে।
- ৪। পরিবারের সদস্যদের অবসর সময়ের সম্বৃদ্ধির হয়।
- ৫। পরিবারের বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- ৬। গবাদিপত্তি ও ইঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে কৃষি জমির উর্বরতা বাড়ানো যায়।
- ৭। গবাদিপত্তি ও ইঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে আগোছা, ফসলের বর্জ্য ও উপজাতসমূহের সঠিক ব্যবহার করা যায়।
- ৮। গবাদিপত্তি ও ইঁস-মুরগির মলমূত্র ব্যবহার করে বায়োগ্যাস উৎপন্ন করে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
- ৯। পরিকল্পিত পারিবারিক কৃষি খামার জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- ১০। কৃষকের জীবন যাত্রার মান উন্নত করে।

নতুন শব্দ : ক্ষুদ্র আয়, দুর্ঘ দোহন

পারিবারিক শাকসবজি ও পোল্পি খামার

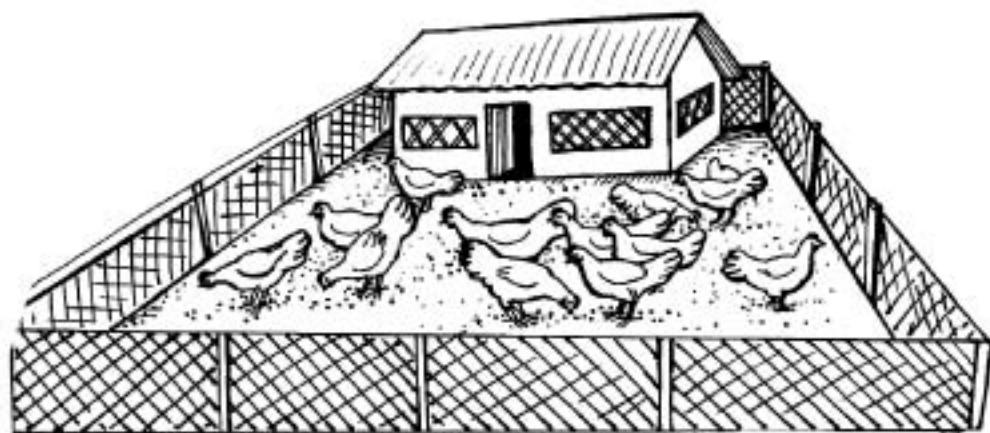
পারিবারিক শাকসবজি খামার

প্রধানত : পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য এই খামার তৈরি হলেও পারিবারিক ক্ষুদ্র আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই খামারের উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এই খামার বাড়ির

আশে পাশে খালি জায়গা, উচু ভিটা, মাঝারি নিচু জমিতেও করা যায়। অভিজ্ঞ কৃষকের পরামর্শ নিয়ে স্বতুভিত্তিক সারা বছরের চাষ পরিকল্পনা করলে প্রায় সারা বছরই এই খামার থেকে ফসল পাওয়া যেতে পারে। যা তার পারিবারিক চাহিদা মেটানোর পরেও কিছু আয়ও করতে পারে। পারিবারিক নিবিড় পরিচর্যায় আগাম ফসল উৎপাদন করতে পারলে উচ্চ বাজার মূল্য পাওয়া যেতে পারে। এখন সারা বছরই কোনো না কোনো শাকসবজি উৎপাদন হয়ে থাকে। যা সবার চাহিদা মেটাতে পারে। রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক সার ব্যবহার না করেও ফসল উৎপাদন করা যায়। এতে শাকসবজি নিরাপদ ও সুস্থান হয়।

পারিবারিক পোল্ট্রি খামার

পোল্ট্রি বলতে গৃহপালিত পাখি যেমন, হাঁস, মুরগি, করুতর, তিতির, কোয়েল ইত্যাদিকে বোঝায়। তিতির ও কোয়েল আমাদের দেশের নিজস্ব পোল্ট্রি না হওয়ায় তেমন জনপ্রিয় নয়। এদেশের কৃষক পারিবারিক পোল্ট্রি খামারে হাঁস, মুরগি ও করুতর পালন করে আসছে। গৃহপালিত পাখি পালন এ দেশের কৃষকের কৃষ্টির অবিছেদ্য অংশ। অভিত্তকাল থেকে কৃষক তার খামারে দেশি জাতের হাঁস, মুরগি ও করুতর পালন করে আসছে। সাধারণত কৃষক তার খামারে ৫-১৫টি হাঁস-মুরগি পালন করে থাকে। এই প্রচলিত খামারে কোনো উন্নত বাস্তুান বা খাদ্যের ব্যবহৃত থাকে না। হাঁস-মুরগি নিজেরা বাঢ়ির আশেপাশে চরে খাদ্য শস্য ও পোকা-মাকড় থেরে বেঁচে থাকে। এতে পরিবারের ভিম ও মাংসের চাহিদা মেটে এবং উন্নত ভিম ও মুরগি বাজারে বিক্রি করে কিছু বাঢ়তি আয়ও হয়ে থাকে। এখানে বগিজ্যক বিষয়টি প্রাধান্য পায় না। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। দেশি জাতের হাঁস-মুরগির ভিম ও মাংস উৎপাদন ক্ষমতা কম হওয়ার কারণে তারা পারিবারিক খামারে উন্নত জাতের হাঁস ও মুরগি পালন করে আসছে যারা বছরে ২৫০টির মতো ভিম দেয়। এই পারিবারিক খামারে তারা অধিক মাংস উৎপাদনশীল ত্রয়লার মুরগি ও পালন করে আসছে।



চিত্র : একটি পারিবারিক পোল্ট্রি খামার

এসব পারিবারিক খামারে ৫০- ৩০০টি পর্যন্ত উন্নত জাতের ত্রয়লার বা লেয়ার মুরগি বা হাঁস পালন করতে দেখা যায়। যেসব কৃষক জমির অভাবে শস্য, গরু, ছাগল ও মাছ চাষ করতে পারে না তারা সহজে পারিবারিক হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন করতে পারে।

সফলভাবে পারিবারিক পোল্ট্ৰি খামার পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ থাকা উচিত। বিশেষ করে পোল্ট্ৰির জাত, বাসস্থান, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং টিকাদান কৰ্মসূচি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

পোল্ট্ৰিৰ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বলতে পোল্ট্ৰিৰ সুস্থ রাখার জন্য রোগ প্রতিরোধ ও অসুস্থ পাখিৰ চিকিৎসাকে বোকায়। পোল্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰে চিকিৎসা থেকে রোগ প্রতিরোধই শ্ৰেণি- কথাটি অধিক প্ৰযোজ্য। কাৰণ কোনো পোল্ট্ৰি খামারে রোগ দেখা দিলে চিকিৎসা না কৰে কখনো ব্যবসা লাভজনক কৰা যায় না। তাই পারিবারিক পোল্ট্ৰি খামার পরিচালনার সময় নিম্ন লিখিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অনুসৰণ কৰতে হবে।

- সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান বাচ্চা খামার শৰু কৰা।
- বন্যাযুক্ত উচু স্থানে খামার কৰা ও খামারের আশপাশে পৰিকার রাখা।
- খামারের চাৰিদিকে মাঝে মধ্যে জীবাণুনাশক স্প্রে কৰা।
- খামারের পানি নামার জন্য নৰ্দমাৰ ব্যবস্থা কৰা।
- সম্ভৱ হলে খামারের চাৰিদিকে বেড়া দেওয়া।
- ঘৰেৰ মেঘে ও মুৰগিৰ লিটাৰ শৰুলভি কৰা।
- পোল্ট্ৰিৰ ঘৰ পূৰ্ব-পশ্চিমে লহালভি কৰা।
- ঘৰেৰ বায়ু চলাচলেৰ ব্যবস্থা রাখা।
- খাদ্য ও পানিৰ পাত্ৰ পৰিকার রাখা।
- সুষম খাবাৰ ও বিশুদ্ধ পানি সৱবৰাহ কৰা।
- হাঁস, লেয়াৰ ও ব্ৰহ্মলাৰ মুৰগিৰ জন্য পৃথক পৃথক টিকাদান কৰ্মসূচি মেনে চলা।
- খামার কৰ্মীৰ শৰীৰ ও পোশাক পৰিচ্ছৰ থাকা।

মহামাৰী আকাৰে রোগ দেখা দিলে সকল পাখিকে ধৰংস কৰে মাটি চাপা দিতে হবে। রোগ নিৰাময়ে পশ্চিমসাকেৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰতে হবে।

পারিবারিক গবাদিপত্র খামার

হাঁস-মুৰগিৰ মতো গবাদিপত্র পালনও এদেশেৰ পারিবারিক কৃষি খামারেৰ বৈশিষ্ট্য। আমাদেৱ দেশে গৃহপালিত গবাদিপত্র মধ্যে গৰু, ছাগল, মহিষ ও ভেড়া অন্যতম। বাংলাদেশেৰ সৰ্বত্রই পারিবারিক খামারে গৰু ও ছাগল দেখা যায়। কিন্তু মহিষ ও ভেড়া সৰ্বত্র দেখা যায় না। ধৰ্মী খামারিৰ পক্ষে গৰু ও মহিষ পালন কৰা সম্ভৱ। কিন্তু দৱিদ্র ও ভূমিহীনদেৱ জন্য ছাগল পালন কৰা সহজ। বাংলাদেশে পারিবারিকভাৱে ছাগল পালন খুবই লাভজনক। কাৰণ ছাগলেৰ মাহসেৰ চাহিদা ব্যাপক থাকায় এৰ বাজাৰ মূল্য অনেক বেশি। ঝ্যাক বেঙল ছাগল দ্রুত প্ৰজননেৰ উপযুক্ততা লাভ কৰে। এৱা একসাথে ২-৩টি বাচ্চা প্ৰসব কৰে। পুৰুষ ছাগল ৮ মাস বয়সে বাজাৰজাত কৰা যায়।

আমাদের দেশি গাড়ী দৈনিক ১.০-১.৫ লিটার দুধ দিয়ে থাকে। তাই পারিবারিক দুধ খামারে দেশি গুৱু থারা পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানো যায় কিন্তু কোনো বাঢ়তি আয় করা যায় না। আমাদের চাহিদার তুলনায় দুধের সরবরাহ কুৰ কম হওয়ায় পারিবারিক গুৱুর খামারে অক্ষতির আশঙ্কা নেই। হল্স্টাইন, ফ্রিজিয়ান ও জার্সি জাতের সংকর গাড়ী দৈনিক ১৫-২০ লিটার পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে। তাই বাংলাদেশের পারিবারিক খামারগুলোতে এ ধরনের উন্নত জাতের সংকর গাড়ী পালন করা দরকার। বর্তমানে অনেক শিক্ষিত যুবক উন্নত জাতের গাড়ীর পারিবারিক খামার করে সফলতা পেয়েছে। পারিবারিক খামারে গাড়ীর সংখ্যা ২-৫টি পর্যন্ত হয়ে থাকে। গাড়ীর সংখ্যা এর অধিক হলে তা বাধিজ্যিক খামারের রূপ নেয় এবং এর ব্যবস্থাপনার জন্য জনবল নিয়োগ করতে হবে।

সফলভাবে পারিবারিক পশু খামার পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ থাকা দরকার। বিশেষ করে পশুর জাত, উৎপাদন ক্ষমতা, বাসস্থান, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং টিকাদান কর্মসূচি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার।

গবাদিপশুর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বলতে পশু খামারের রোগ প্রতিরোধ ও অসুস্থ পতকে চিকিৎসা প্রদান করাকে বোঝায়। পশুর চিকিৎসা থেকে রোগ প্রতিরোধের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ খামারে রোগ দেখা দিলে চিকিৎসা করে পশুকে উৎপাদনে আনতে অনেক সময় লাগে। তাই গবাদিপশুর খামার পরিচালনার সময় রোগ না হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

- উচু স্থানে খামার করা ও খামারের চারিদিক পরিষ্কার রাখা।
- খামারে সাধারণের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।
- খামারের অজিনায় নিয়মিত জীবাণুনাশক স্প্রে করা।
- খামারের পানি নামার জন্য নর্মস্থার ব্যবস্থা করা।
- গোয়াল ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লঘালভিভাবে তৈরি করা।
- খামারে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকা।
- বন্য পশুপার্ছি খামারে চুক্তে না দেওয়া।
- খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার রাখা।
- সূৰ্যম খাবার ও বিশুক পানি সরবরাহ করা।
- পশুকে নিয়মিত গোসল করানো
- গুৱু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার জন্য পৃথক পৃথক টিকাদান কর্মসূচি মেনে চলা।
- মৃত পশুকে মাটি চাপা দেওয়া।
- পশুর রোগে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।



চিত্র : গুৱুকে গোসল করানো হচ্ছে

কাজ : শিক্ষার্থীরা যেকোনো একটি খামার পরিদর্শন করবে এবং খামারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখবে।

পারিবারিক মৎস্য খামার

পারিবারিক মৎস্য খামারের ধারণা ও গুরুত্ব

আমদের দেশের প্রাম-গঙ্গে অনেকের বাড়িতেই পুরুর আছে। এই পুরুরগুলো গৃহস্থানির কাজে ব্যবহৃত পানির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এসব পুরুরে সাধারণত সমাতল পদ্ধতিতে কিছু মাছ চাষও করা হয়। যেমন- পোনা ছাড়া হয় মাছের খাবার হিসাবে বাড়ির যে উচ্চত ভাত ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য থাকে তা দেওয়া হয়। ফলে এসব পুরুরে উৎপাদন অনেক কম। অথচ এসব পুরুরে পরিকল্পনামাফিক উচ্চত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ চাষের আওতায় আনতে পারলে মাছের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই উৎপাদিত মাছ পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মিটিয়েও বাজারে বিক্রি করা যায়। আবার বাড়ির আঙিনায় বা পিছনে কিছুটা জায়গা থাকলে সহজেই একটি মিনি পুরুর খনন করা যায়। এবং এই মিনি পুরুরকেও পারিবারিক মৎস্যখামার হিসাবে গণ্য করে মাছ চাষ করা যায়। এসব পারিবারিক মৎস্য খামারগুলো বাড়ির মহিলাদের দ্বারাও পরিচালনা করা সম্ভব। মহিলারা এসব কাজ করার ফাঁকে কিছুটা সময় পুরুরে মাছ চাষের জন্য ব্যয় করলে একদিকে যেমন সহজেই পারিবারিক আয়িরের চাহিদা পূরণ হবে অন্যদিকে সংসারে বাড়তি আয়ও সম্ভব হবে। আবার পারিবারিক মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিবারের বেকার সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

পারিবারিক খামারে চাষ উপযোগী মাছ

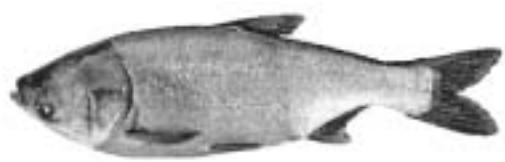
নিচে পারিবারিক খামারে চাষ করা যায় এরকম অর্ধনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন কয়েকটি মাছের বর্ণনা দেওয়া হলো:-

ক) দেশি মাছ

চাষযোগ্য দেশি মাছের প্রজাতির মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালিবাউশ চাষের জন্য খুব উপযোগী। দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র এ মাছগুলো পাওয়া যায়। তবে খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুরুর-দিঘিসহ বৃক্ষ পানিতে এরা ডিম পাঢ়ে না। বর্ষাকালে (মে-জুলাই) এ সকল মাছ স্রোতবৃক্ষ নদীর কম গভীর অংশে ডিম ছাড়ে। প্রণোদিত বা কৃতিম প্রজননের মাধ্যমে হ্যাচারিতে এদের পোনা উৎপাদন করা যায়। চাষকালীন সময়ে এ সব মাছ সম্পূরক খাদ্য হিসাবে ফিশমিল, খৈল, চালের কুঁড়া, গমের ভূসি গ্রহণ করে। পর্যাপ্ত খাবার পেলে কাতলা মাছ বছরে ২-৩ কেজি পর্যন্ত হয়। রুই ও মৃগেল মাছ বছরে ১কেজি ওজনের হতে পারে। দুই বছর বয়সে এসকল মাছ ডিম পাঢ়ার উপযুক্ত হয়।

খ) বিদেশি মাছ

আমাদের দেশের পরিবেশে সহজে খাপ যায়, দ্রুত বাঢ়ে ও হ্যাচারিতে সহজে পোনা তৈরি করা যায় এমন কিছু বিদেশি মাছ চাষের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে আনা হয়েছে। এধরপের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মাছ হচ্ছে সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, কার্পিণ, থাইসরপুটি, তেলাপিয়া বা নাইলোটিকা ও থাইপাঙ্গাশ। এসব মাছ দেশি কার্প জাতীয় মাছের সাথে সহজেই মিশ্র চাষ করা যায়।



সিলভার কার্প



আসকার্প



কার্পি



লাইপোটিকা



সরপুটি

চিত্র : চান্দযোগ্য কয়েকটি বিদেশি মাছ

খামার পরিচালনার বিভিন্ন ধাপ

অনেকগুলো ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে খামার পরিচালনা করা হয়। খামার পরিচালনার বিভিন্ন ধাপগুলো হচ্ছে-

ক) খামারে পোনা মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা (পুকুর প্রস্তুতি) : পুকুরের আগাছা পরিষ্কার, রাস্ফুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ দূরীকরণ, পাঢ় হেরামত, চুন প্রয়োগ, সার প্রয়োগ, পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা এবং পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা

খ) পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা : পোনার প্রজাতি নির্বাচন, ভালোপোনা বাহাইকরণ, পোনা শোধন, পোনার পরিমাণ নির্ধারণ, পোনা পরিবহন এবং পোনা অভ্যন্তরণ ও ছাড়া

গ) পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা : নিয়মিত সার প্রয়োগ, সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ, মাছের বৃক্ষি পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং মাছ ধরা ও বিক্রয়

খামার পরিচালনার বিভিন্ন উপকরণ

খামার পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন উপকরণ প্রয়োজন। খামার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায় ভিত্তিক উপকরণ সমূহের চাহিদা নিচে দেওয়া হলো :

ব্যবহাপনার পর্যায়	উপকরণের চাহিদা
মজুদ পূর্ব বা পুরুর প্রস্তুতি	দা, কোলাল, মাছ মারার বিষ (ফেমল-রোটেল), চুন, সার (জৈব ও অজৈব), বালতি, ড্রাম, মাটির চাড়ি, মগ, সেক্রিডিজ্ঞ
মজুদকালীন	মাছের রেশ, হাড়ি বা পলিথিন ব্যাগ, খাবার লবণ, পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট, P^H কাগজ, ধার্মোমিটার
মজুদ পরবর্তী	জৈব ও অজৈব সার, মাটির চাড়ি, বাঁশের টুকরা, সেক্রিডিজ্ঞ, সম্পূরক খাদ্য, বালতি, মগ/বাঢ়ি, খাদ্যদানি, চুন/জিপসাম, দা/কাঁচি, ব্যালেন, পাহারা দেওয়ার জন্য টর্চ, জাল (ধর্ম জাল, ঘোকি জাল, বেড় জাল)

মাছের স্বাস্থ্য ব্যবহাপনা

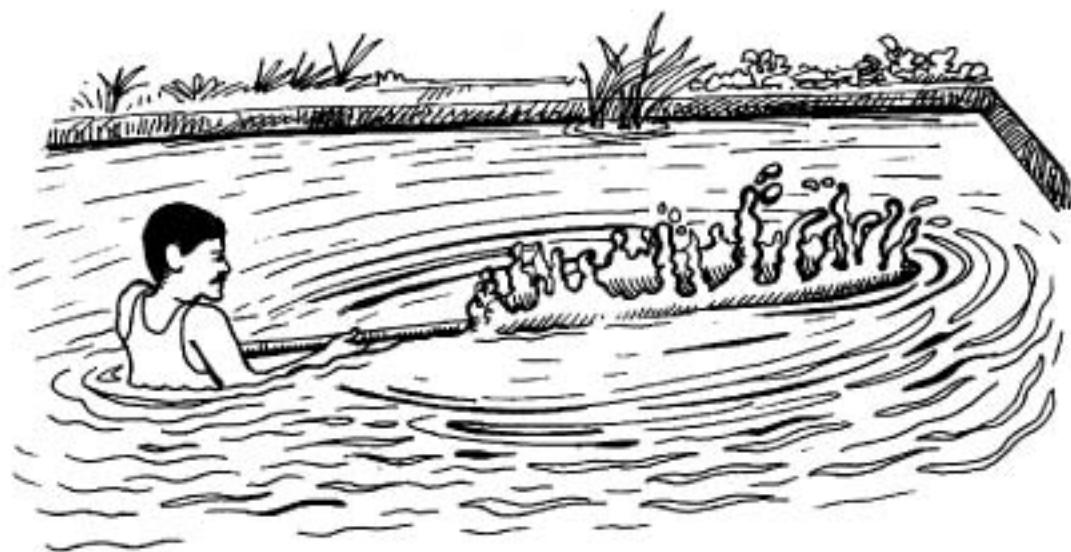
মাছ চাষকালীন সময়ে রোগাত্মক হতে পারে। তাই মাসে একবার জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাৎক্ষণিক ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। মাছের রোগের সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে মাছের স্বাভাবিক চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়, ফুলকার স্বাভাবিক রং নষ্ট হয়ে যায়, দেহের উপর লাল/কালো/সাদা দাগ পড়ে, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয় বা কম যায়, মাছের দেহ অতিরিক্ত খসখসে অনুভূত হয়। চাষকালীন মাছের কয়েকটি সাধারণ রোগ হচ্ছে ক্রতরোগ, লেজ ও পাখনা পচা রোগ, লাল ফুটকি রোগ, ফুলকা পচা রোগ এবং মাছের উকুল। খামারের পুরুরে মাছ রোগাত্মক হলে মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রাথমিক ভাবে পুরুরের অবস্থা ভেদে শতক প্রতি $0.5-1.0$ কেজি চুন প্রয়োগ করা যায়।

পুরুরের কিছু সাধারণ সমস্যা ও প্রতিকার

১। মাছ ভেসে উষ্ঠা ও খবি খাওয়া (পানিতে অঙ্গিজনের অভাব)

পুরুরের তলায় অতিরিক্ত কাদার উপস্থিতি, জৈব পদার্থের পচন, বেশি সার প্রয়োগ, ঘোলাত্ত, মেঘলা আবহাওয়া ও তাপমাত্রা বৃক্ষিতে পানিতে অঙ্গিজনের অভাব হয় এবং এ সমস্যা দেখা যায়। এর ফলে মাছ ও চিপ্তি মারা যায়। অঙ্গিজনের অভাবে মৃত মাছের মুখ “হা” করা থাকে।

প্রতিকার ব্যবস্থা: পানিতে সাঁতার কেটে বা পানির উপর বাঁশ পিটিয়ে পুরুরের পানি আন্দোলিত করে অথবা হররা টেনে পুরুরে অঙ্গিজেন সরবরাহ বাঢ়াতে হবে। বিপদজনক অবস্থায় পুরুরে পরিষ্কার নতুন পানি সরবরাহ করতে হবে অথবা পাম্প দিয়ে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।



চিত্র : বাংলা পিটিয়ে পুরুরের পানিতে অঙ্গীজেন মেশানো

২। পানির উপর সবুজ স্তর

অতিরিক্ত সবুজ শেওলা উৎপাদনের ফলে এ সমস্যা দেখা যায়। এর ফলে মাছের শ্বাস কষ্ট হয় ও মাছ পানির উপর থাবি থেতে থাকে। শেওলা পচে পরিবেশ নষ্ট হয়। মাছ ও চিহড়ির মৃত্যু হয়।

প্রতিকার ব্যবস্থা: পাতলা সুতি কাপড় দিয়ে তুলে ফেলা যায়। সার ও খাদ্য দেওয়া সাময়িক বক্ষ রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে কিছু পানি পরিবর্তন করতে হবে। কিছু বড় সিলভার কার্প ছেঁটে জৈবিক ভাবে নিরস্তুপ করা যেতে পারে।

৩। পানির উপর লাল স্তর

লাল শেওলা অথবা অতিরিক্ত আয়রনের জন্য এ সমস্যা দেখা যায়। এর প্রভাবে পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। মাছ ও চিহড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন করে যায়। আবার পানিতে অঙ্গীজেনের ঘাটতি হয়। শতাংশ প্রতি ১২-১৫ হাম কপার সালফেট বা তুঁতে ছোট ছোট পেটলায় বেঁধে পানির উপর থেকে ১০-১৫ সেমি নিচে বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে রাখলে বাতাসে পানিতে ঢেউয়ের ফলে তুঁতে পানিতে যিশে শেওলা দমন করে।

প্রতিকার ব্যবস্থা: খড়ের বিচালি বা কলাগাছের পাতা পেঁচিয়ে তৈরি করে পানির উপর টেনে বা পাতলা সুতি কাপড় দিয়ে তুলে ফেলা যায়।

৪। ঘোলা পানি

বৃষ্টি ধোয়া পানি পুরুরে প্রবেশ করে পানি ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে। পাড়ে শ্বাস না থাকলেও এমনটি দেখা যায়। এর ফলে পানিতে সূর্যের আলো চুকে না, ফুলকা নষ্ট হয়ে যায় ও প্রাকৃতিক খাদ্য করে যায়।

প্রতিকার ব্যবস্থা: পুকুরে চুন (১-২ কেজি/শতক), জিপসাম (১-২ কেজি/শতক) বা ফিটকারী (২৪০-২৪৫ গ্রাম/শতক) প্রয়োগ করা যায়।

৫। পুকুরের তলদেশের কাদায় গ্যাস জমা হওয়া

কারণ: পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদার উপস্থিতি এবং বেশি পরিমাণ লতাপাতা ও আবর্জনার পচনের ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এতে করে পানি বিষাক্ত হয়ে মাছ মারা যায়।

প্রতিকার ব্যবস্থা: পুকুর শুকনো হলে অতিরিক্ত কাদা তুলে ফেলতে হবে। হররা টেনে তলার গ্যাস দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে।



চিত্র : হররা

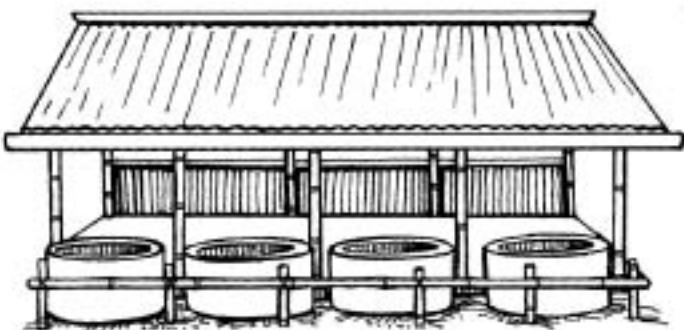
পারিবারিক মৎস্য খামার স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবারের মাছের চাহিদা মেটানো এবং সে সাথে সজ্বব হলে বাড়তি কিছু মাছ বাজারে বিক্রি করে পরিবারের সচলতা বৃদ্ধি করা। এছাড়াও পারিবারিক খামারের মাধ্যমে পরিবারের বেকার সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে।

নতুন শব্দ: হররা

দ্বিতীয় পরিচেন্দ পারিবারিক দুর্ঘ খামার

গাঁজি পালন একটি সামাজিক ব্যবসা। একজন মানুষের বছরে প্রায় ১০ লিটার দুধ পান করা দরকার। কিন্তু আমাদের দেশের একজন মানুষের বছরে গড়ে প্রায় ১০ লিটার দুধ পান করে থাকে। তাই দেশে দুধের উৎপাদন ও চাহিদার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। বিদেশ থেকে গুড়া দুধ আমদানি করে এই ঘাটতি আংশিক পূরণ করা হয়। দেশে দুধের ঘাটতি থাকায় বিগত দুই দশকে মধ্যে গাঁজি পালন ও দুর্ঘ খামার স্থাপনে বেশ অগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে গ্রাম থেকে শহর ও উপশহরে অনেকেই পারিবারিকভাবে গাঁজি পালন করছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গাঁজি পালনে গাঁজির বাসস্থান ও খাদ্যের প্রতি অধিক ভুল্বুল দিতে হবে। গাঁজি পালন করে স্বকর্মসংস্থান বাড়ানো যায়, ভূমিহীন ও প্রাণিক চাষিদের আয় বাড়ানো যায় এবং পরিবারের পুষ্টি ও বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করা যায়। সুতরাং আমরা নিজের বাড়িতে পারিবারিক খামার করে ২-৫টি গাঁজি পালনের মাধ্যমে আয়ের পথ সুগম করে দুধের চাহিদা মেটাতে পারি। উল্লেখ জাতের গাঁজির খামার স্থাপনের পরিকল্পনা করতে হবে। পারিবারিক পর্যায়ে ২-৫টি গাঁজি সমস্যে অন্তর্ভুক্ত খামার স্থাপন করা যায়। খণ্ডের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করলে ব্যাংক ক্ষম পরিশোধের ক্ষতিয়ান বিবেচনা করে খামার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। খামারের জন্য গাঁজি নির্বাচনের সময় থেয়াল রাখতে হবে, যাতে উল্লেখ জাতের অধিক দুর্ঘসম্পর্ক হয়। পারিবারিক দুর্ঘ খামার স্থাপনের জন্য বসতবাড়ির উচু স্থান নির্বাচন করতে হবে। খামারের স্থান নির্বাচনে যেসব বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে, সেগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

- অপেক্ষাকৃত উচু ও শুক ভূমি।
- খামারের ভূমি উন্নয়ন ও নির্মাণ।
- খামার সম্প্রসারণ করার সুযোগ।
- বসতঘর হতে একটু দূরে।
- ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা।
- পানি ও পশু খাদ্যের প্রাপ্যতা।
- পশ্চের চাহিদা ও বাজার ব্যবস্থা বিবেচনা।



চিত্র : একটি পারিবারিক গোশালা

পারিবারিক দুর্ঘ খামারের প্রয়োজনীয় উপকরণ

পারিবারিক দুর্ঘ খামার স্থাপন করতে বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হয়। খামার নির্বাচনের জন্য মূলধন থেকে ক্ষুণ্ক করে গাঁজির বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন হয়। উপকরণ নির্বাচন ও তায়ের সময় উদ্যাদের গুণগতমান সম্পর্কে থেয়াল রাখতে হবে। নিম্নে উপকরণসমূহের পরিচিতি দেওয়া হলো :

মূলধন, খামারের ভূমি বা জমি, ভালো জাতের গাড়ী, আদর্শ গোশালা, গোশালা নির্মাণ সামগ্রী, উন্নত খাদ্যের ও পানির পাত্র, খাদ্যের জমি, পানির লাইন, পরিবহনের জন্য পিক আপ/মটরভ্যাল বা রিকসা ভ্যাল, ঘাস কাটার চপিং মেশিন, ফিড ট্রলি ও খামারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, দুক্ষ দোহন ও বিতরণ সামগ্রী, পত্র প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি, পত্র জন্য প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাস ও দানাদার খাদ্য, টিকার সরবরাহ এবং পত্রকে কৃতিম প্রজননের ব্যবস্থা

কাজ : পরিবারিক দুক্ষ খামারের উপকরণের তালিকা তৈরি করবে।



চিত্র : ঘাস চপিং মেশিন

দুক্ষ দোহন

গাড়ীর ওলান থেকে দুখ সংঘাতের প্রতিক্রিয়াকে দুখ দোহন বলে। নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে একই গোয়ালা দ্বারা গাড়ী থেকে দুখ দোহন করতে হয়। এতে করে গাড়ী ছিরতাবোধ করে এবং উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

দুখ দোহনের ধাপ-

- ১। **দুখ দোহনের সময় :** প্রতিদিন দুইবার অথবা তিনবার দুখ দোহন করা যায়। নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে দোহন করলে দুখ উৎপাদন বাঢ়ে।
- ২। **গাড়ী প্রস্তুত করা :** দুখ দোহনের পূর্বে কখনোই গাড়ীকে উত্তেজিত বা বিরক্ত করা যাবে না। কোনো অবস্থাতেই গাড়ীকে মারধর করা যাবে না। দুখ দোহনের পূর্বে গাড়ীর ওলান ও বাঁট কুসুম গরম পানি দিয়ে খুঁয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর পরিষ্কার কাপড় বা তোয়ালে দিয়ে ওলান ও বাট মুছে নিতে হবে।
- ৩। **গোয়ালার প্রস্তুতি :** দোহনের পূর্বে গোয়ালাকে পরিষ্কার কাপড় পরিধান করতে হবে। গামছা বা কোনো কাপড় দিয়ে চুল ঢেকে রাখতে হবে। দোহনকারীর নখ কেটে নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। দুখ দোহনের সময় দোহনকারীর বদ্ব্যাস যেমন- ধূঁধু ফেলা, নাক বাড়া এমনকি কথা বলা ইত্যাদি ত্যাগ করতে হবে।
- ৪। **দোহনের জন্য পরিষ্কার পাত্র ব্যবহার করা :** ওলান থেকে দুখ দোহনের সময় বালতির পরিবর্তে গমুজ আকৃতির ঢাকলাসহ স্থায়সম্মত হাতাগোয়ালা বালতি ব্যবহার করা উচিত। দুখ দোহনের পর দুধের পাত্র প্রধানে গরম পানি দিয়ে এবং পরে ত্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার ঠাণ্ডা পানি দিয়ে খুঁয়ে ফেলতে হবে। পরবর্তি দোহনের পূর্ব পর্যন্ত তাকে পাত্রগুলো উপুড় করে রাখতে হবে।

৫। গাড়ীকে মশা মাছি মুক্তনাখা : দুধ দোহনের সময় মশা মাছি যেন গাড়ীকে বিরক্ত না করে দে দিকে থেওয়াল রাখতে হবে ।

৬। দুধ দোহনের জন্য গাড়ীকে উচ্চীপিত করা : বাচ্চুরের ধারা গাড়ীর বাঁট টুঁষিয়ে অথবা গোয়ালা কর্তৃক ওলান ম্যাসাজ করে গাড়ীকে দুধ দোহনের জন্য উচ্চীপিত করতে হবে ।

৭। দোহনের সময় গাড়ীকে খাওয়ানো : দুধ দোহনের সময় গাড়ীকে ব্যস্ত রাখার জন্য অঙ্গ পরিমাণ দানাদার খাদ্য বা সবুজ ঘাস গাড়ীর সামনে দেওয়া উচিত । এতে গাড়ী খাবার খেতে ব্যস্ত থাকে এবং দুধ দোহন সহজ হয় ।

দুর্ঘ দোহন পদ্ধতি : দুর্ঘ দোহন পদ্ধতি দুই প্রকার -

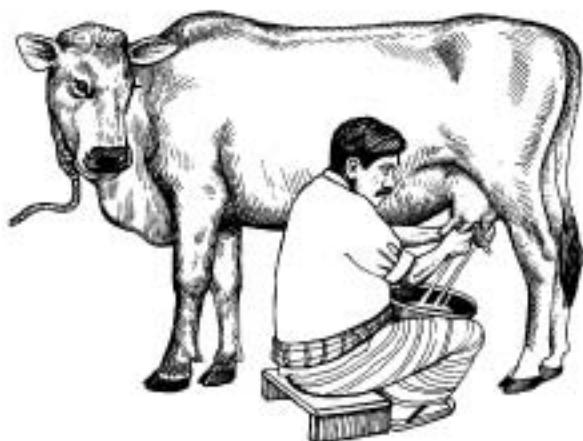
১। সন্তান পদ্ধতি : হাত দ্বারা দোহন

২। আধুনিক পদ্ধতি : যন্ত্রের সাহায্যে দোহন

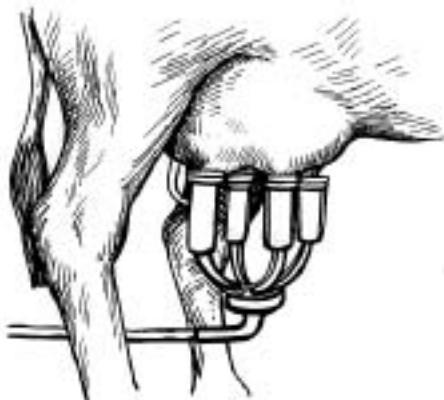
দুধ দোহনের সময় যে কোনো একটি পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে ।

১। হাত দিয়ে দুর্ঘ দোহন

দোহনের সময় ওলানের বাঁটের গোড়া বক্ষ রেখে বাঁটের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হয় । ফলে বাঁটের মধ্যে জমা হওয়া দুধ বের হয়ে আসে । আবার চাপ সরিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে ওলান থেকে বাঁটে দুধ এসে জমা হয় । এভাবেই প্রতিয়াটি বারবার চলতে থাকে । হাত দিয়ে দোহনের সময় গাড়ীর বামপাশ থেকে দোহন করতে হয় । দুধ দোহনের সময় প্রথমে সামনের দুই বাঁট একসাথে ও পরে পিছনের দুই বাঁট একসাথে দোহন করা হয় । আবার অনেকে গুণ (X) চিহ্নের মতো সামনের একটি ও পিছনের একটি বাঁট একসাথে অথবা যে বাঁটে দুধ বেশি আছে বলে মনে হয় সেগুলো আগে দোহন করে থাকে ।



চিত্র : সন্তান পদ্ধতি



চিত্র : আধুনিক পদ্ধতি

২। যজ্ঞের সাহায্যে দোহন

বড় বড় বাণিজ্যিক খামারে যেখানে গাভীর সংখ্যা অনেক বেশি সেখানে একসঙ্গে অনেকগুলো গাভীকে দোহনের জন্য দোহন যত্ন ব্যবহার করা হয়। দোহনের সময় হলে গাভীর বাঁটে টিটি কাপ লাগিয়ে দুধ দোহন যত্ন চালু করা হয়। এতে সহজে এবং স্বাস্থ্যসম্ভাবনারে দুধ দোহন করা সম্ভব হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দুধ দোহনের আধুনিক ও সনাতন পদ্ধতি সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করবে।

দুধ সংরক্ষণ

নির্দিষ্ট সময়-সীমা পর্যন্ত দুধকে খাদ্য হিসাবে উপযোগী রাখতে পচনমুক্ত রাখার প্রক্রিয়াকে দুধ সংরক্ষণ বলে। দোহনের পর পরই দুধকে ছাঁকতে ও ঠাণ্ডা করতে হয়। দুধের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তেমন সহজ নয়। কারণ দুধের রাসায়নিক পঠনের পরিবর্তন ঘূর সহজে ঘটে। বাংলাদেশের সর্বজ্ঞ সাধারণত কাঁচা দুধ বিক্রি করা হয়। দুধ অধিক সময় কাঁচা অবস্থার থাকলে গুণগত মান ক্ষুণ্ণ হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় বিভিন্ন জীবাণু দুধে ল্যাকটিক এসিড উৎপন্নের মাধ্যমে দুধকে টক স্বাদমুক্ত করে ফেলে। স্ট্রেপটোকক্সাই (Streptococci) নামক জীবাণু প্রধানত দুধে এসিড তৈরি করে। জীবাণু সাধারণ তাপমাত্রায় ত্রুট বংশবৃক্ষি করে দুধ নষ্ট করে ফেলে। নিম্নে দুধ সংরক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

ক) দুধ সংরক্ষণের সনাতন পদ্ধতি

দুধ তাপ দ্বারা ফুটিয়ে সংরক্ষণ করা : পারিবারিকভাবে এটি সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। একবার গরম করলে ৪ ঘণ্টা ভালো থাকে। তাই ৪ ঘণ্টা পর পর ২০ মিনিট করে ফুটালে প্রায় সবরকম রোগ উৎপন্নদানকারী জীবাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তবে, এতেও দুধের পুষ্টিমান কিছুটা কমে যায়। কেবল উচ্চ তাপ প্রক্রিয়ায় কিছু সংখ্যক তিটায়িন ও অ্যাহাইলো এসিড নষ্ট হয়ে যায়।

খ) দুধ সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি

- ১। রিফ্রিজারেটরে অল্প সময়ের জন্য ৪° সে. রেখে দুধ সংরক্ষণ করা যায়।
- ২। ডিপ ফ্রিজে দুধ সংরক্ষণ করা যায়। এখানে দুধে জীবাণুর বংশবৃক্ষি হয় না ঠিক, তবে দুধের রাসায়নিক বদল ভেঙে যায়। ফলে দুধের গুণগত মান কিছুটা হ্রাস পায়।

গ) দুধ পান্ত্রিকরণ

পৃথিবীতে দুধকে অন্যতম আদর্শ খাদ্য বলা হয়। এই দুধ বাচুর বা মানুষের জন্য আদর্শ খাবার, সাথে সাথে এটি অণুজীবের জন্যও সহানভাবে আদর্শ মাধ্যম। দুধ দোহনের পর সময়ের সাথে সাথে দুধের গুণগত নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে এবং দীর্ঘক্রিয় সাধারণ তাপমাত্রায় রাখলে এক সময় সম্পূর্ণরূপে এটি নষ্ট হয়ে যায়। এই নষ্ট হওয়ার কারণ হিসাবে প্রধানত অণুজীবকে দায়ি করা হয়। এই অণুজীব অতি উচ্চ তাপমাত্রায় ও নিম্ন মাত্রায় জন্মাতে ও বংশ বিস্তার করতে পারে না। এই তাপমাত্রা ব্যবহার করে দুধের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু নিয়ন্ত্রণ করার উপায় হলো পান্ত্রিকরণ। দুধ পান্ত্রিকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো রোগ উৎপন্নদানকারী

জীবাণু ধ্বংস করা। দুধ বেশি সময় সংরক্ষণ এর জন্য অবাঞ্ছিত জীবাণু ধ্বংস করা, দুধে উপহিত এনজাইম নিষিয়করণ।

লুই পান্টর (১৮৬০-১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ) একজন ফরাসি রসায়নবিদ প্রথম অনুধাবন করেন যে, পচন প্রণালি এক প্রকারের জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়। যদিও লুই পান্টরই পান্ত্রিকরণ প্রতিক্রিয়ার আবিক্ষারক, কিন্তু দুর্ভ প্রতিক্রিয়াজাতকরণে ড. সর্থসলেট নামক এক জার্মান বিজ্ঞানী প্রথম এর ব্যবহার করেন। দুধে উপহিত রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু ও এনজাইম ধ্বংস করে দুধের প্রত্যেক কণাতে 145° ফা. (62.8° সে.) তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট সময়কাল অথবা 162° ফা. (72.2° সে.) তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ড সময়কাল পর্যন্ত উত্তুন্ত করাকে পান্ত্রিকরণ বলে। পান্ত্রিকৃত দুধ সঙ্গে সঙ্গে 8° সে. তাপমাত্রার নিচে ঠাণ্ডা করতে হবে।

পান্ত্রিকরণ এর সুবিধা

- ১। পান্ত্রিকৃত দুধ নিরাপদ, কেননা এতে রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু ধ্বংস হয়।
- ২। পান্ত্রিকরণ দুধের সংরক্ষণকাল দীর্ঘয়িত করে, কেননা ইহা ল্যাকটিক এসিড প্রত্তকারী জীবাণুর সংখ্যা কমায়।
- ৩। পান্ত্রিকরণ এর ফলে দুধের এনজাইম নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে দুধ দীর্ঘক্ষণ ভালো থাকে।
- ৪। পান্ত্রিকরণের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্রতিকর জীবাণু বিনষ্ট হয়ে যায়।
- ৫। এই প্রতিক্রিয়া দুধের পুষ্টিমান ঠিক থাকে, কোনো বিশ্বাদের সৃষ্টি হয় না।

পান্ত্রিকরণের অসুবিধা

- ১। পান্ত্রিকরণ প্রতিক্রিয়া আদর্শ উপায়ে করতে না পারলে অতিরিক্ত আলোচ্ছলে দুধের চর্বিকণা পৃথক হতে পারে।
- ২। তাপ সংবেদনশীল ভিটামিন নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- ৩। উচ্চ তাপজনিত কিছুটা বিশ্বাদের সৃষ্টি করতে পারে।

পান্ত্রিতকরণের প্রকারভেদ:

- ১। নিম্নতাপ দীর্ঘ সময় পান্ত্রিকরণ 62.8° সে. তাপ ৩০ মিনিট সময়ের জন্য।
- ২। উচ্চতাপ কম সময় পান্ত্রিকরণ 72.2° সে. তাপ ১৫ সেকেন্ড সময়ের জন্য।
- ৩। অতিউচ্চতাপে পান্ত্রিকরণ 137.8° সে. তাপে ২ সেকেন্ড সময়ের জন্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পারিবারিক খামারের তথ্য লিপিবদ্ধ করা

পারিবারিক খামার একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এইরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো পারিবারিক কৃষি খামারের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ সম্পত্তির বিবরণ, ব্যায় বা বিনিয়োগের ঘাবতীয় তথ্য, আয়ের সকল তথ্য এবং মুনাফার তথ্য লিপিবদ্ধ বা নথিবদ্ধ করা প্রয়োজন। নিচে একটি নমুনা উপস্থাপন করা হলো :

পারিবারিক খামার : আলিফ পারিবারিক খামার

মালিকের নাম : আলিফ হিএলা

ঠিকানা : গ্রাম- বয়রা

মৌজা -বয়রা-ভালুকা

উপজেলা/থানা- ময়মনসিংহ সদর

ডাকঘর- ময়মনসিংহ ২২০২

পারিবারিক খামারে মোট জমির পরিমাণ : ১ বিষা (৩৩ শতক)।

উচু জমি	:	৩ শতক
---------	---	-------

মাঝারি নিচু জমি	:	১০ শতক
-----------------	---	--------

বসত বাড়ি	:	৭ শতক
-----------	---	-------

পুকুর	:	২০ শতক
-------	---	--------

খামার	:	৩ টি
-------	---	------

মৎস্য খামার	:	২০ শতক
-------------	---	--------

সবজি খামার	:	১০ শতক
------------	---	--------

ত্রয়লার মূরগির খামার	:	৩ শতক
-----------------------	---	-------

নিম্নে ত্রয়লার মূরগির খামারের আয় ব্যয়ের হিসাব বর্ণনা করা হলো।

খামারের উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

পারিবারিকভাবে ত্রয়লার ও লে়ার মূরগি পালন করলে নিজেদের খাবার যাংস ও ভিমের চাহিদা হেটে। তাছাড়া ত্রয়লার ও খাবার ভিম বাজারে বিক্রি করে বাড়তি আয় করা সম্ভব। নিচে ১০০টি ত্রয়লার মূরগি পালনের আয়-ব্যয় হিসাব করার একটি নমুনা দেওয়া হলো।

ত্রয়লার মূরগি পালনের ব্যয়ের খাত ২টি- ক। স্থায়ী খরচ, খ। চলমান খরচ

ক। স্থায়ী খরচ (Capital or Fixed Expenditure) : খামারে বাঢ়া তোলার আগে জমি, মূরগির ঘর, আসবাবপত্র, ব্রডার যন্ত্র, খাদ্যের পাতা, পানির পাতা, ছাই ও বালতি ইত্যাদি খাতসমূহে যে সমস্ত খরচ হয় তাকে মূলধন বা স্থায়ী খরচ বলে। নিচে ১০০টি ত্রয়লার মূরগি পালনের ব্যয় হিসাব করার একটি ছক দেওয়া হলো।

জমি	মূরগির ঘর তৈরি	ক্রত্তির যন্ত্র (হোভার, টিকা গার্জ, বাহ)	খাদ্যের ও পানির পাই	পানির বালতি ও ছাম	মোট স্থায়ী খরচ
নিজ	৮,০০০/-	২,০০০/-	১,০০০/-	১০০০/-	১২,০০০/-

৪. চলমান খরচ (Recurring Expenditure) : খামারে বাচ্চা ক্রয় থেকে শুরু করে দৈনন্দিন হে সব খরচ হয় তাকে চলমান খরচ বলে। বাচ্চা পালনকালে শেষ পর্যন্ত ১০০টির মধ্যে ২-৫ টির মৃত্যু হয়। চলমান খরচের মধ্যে বাচ্চার দাম, খাদ্য ক্রয়, চলতি বিদ্যুৎ খরচ, টিকা ও ঔষধ, লিটার (মূরগির বিছানা), শ্রমিক ও পরিবহন খরচ উল্লেখযোগ্য। ব্রয়লার মূরগি মোট ১ মাস খামারে থাকে। নিচে পারিবারিক খামারে ১০০টি ব্রয়লার মূরগি পালনের চলমান খরচ হিসাব করার একটি ছক উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হলো।

বাচ্চার দাম (প্রতিটি ৫০/-)	খাদ্য ক্রয় (প্রতিটির জন্য ৩ কেজি মোট ৩০০ কেজি খাদ্য, প্রতি কেজি ৩০/-)	বিদ্যুৎ খরচ (মাসিক ৩০০/-)	টিকা ও ঔষধ	লিটার	শ্রমিক	পরিবহন খরচ	মোট চলমান খরচ
৫,০০০/-	৯,৯০০/-	৩০০/-	১৫০০/-	২০০/-	নিজ	৫০০/-	১৭,৪০০/-

কাজ : শিক্ষার্থীরা এককভাবে ১৬০টি ব্রয়লার মূরগি পালনের আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখে ফ্লাসে জমা দিবে।

প্রকৃত ব্যয় হিসাবের জন্য মোট চলমান খরচের সাথে মূরগির ঘর, যন্ত্রপাতি, মূলধন ও চলমান খরচের উপর অপচয় খরচ (Depreciation Cost) হিসাব করতে হবে।

মোট বাসরিক অপচয় খরচ (Depreciation Cost)

$$১। \text{মূরগির ঘরের উপর } (৮,০০০/- \text{ টাকার উপর } ৫\%) = ৪০০/-$$

$$২। \text{যন্ত্রপাতির উপর } (৪,০০০/- \text{ টাকার উপর } ১০\%) = ৪০০/-$$

$$৩। \text{মোট স্থায়ী মূলধন ও মোট চলমান খরচ} = (১২,০০০ + ১৭,৪০০/-) \text{ উপর } ১৫\% = ৮,৮১০/-$$

$$\text{মোট বাসরিক অপচয় খরচ} = ৫,২১০/- \text{ টাকা}$$

এক বছরে যদি ১০টি ব্যাচ পালন করা যায় তবে একটি ব্যাচের মোট অপচয় খরচ হবে = টাঃ ৫২১/- টাকা

অতএব মোট ব্যয় = মোট চলমান খরচ + একটি ব্যাচের মোট অপচয় খরচ = টাঃ ১৭,৪০০/- + টাঃ ৫২১/- = টাঃ ১৭,৯২১/-

আয় (Income) : ব্রয়লার মূরগি, লিটার ও খাদ্যের বস্তা বিক্রি করে আয় করা যায়। তাছাড়া লিটার জৈব সার হিসাবে জমিতে এবং মাছের খাদ্য তৈরিতে পুরুরে ব্যবহার করা যায়। নিচে পারিবারিক খামারে ১০০টি ব্রয়লার মূরগি থেকে আয় হিসাব করার একটি ছক উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হলো।

ব্রহ্মলাল মুরগি বিক্রি ৯৫টি (৫% মৃত্যু) ১৫০/- কেজি (গড় ওজন ১.৪ কেজি)	লিটার বিক্রি	খাদ্যের বস্তা বিক্রি (বস্তা ৬টি, প্রতিটি ১০/-)	মোট আয়
১৯,৯৫০/-	১০০/-	৬০/-	২০,১১০/-

নিট লাভ = (মোট আয় - মোট ব্যয়)=টাঃ ২০,১১০/- - টাঃ ১৭,৯২১/- = টাঃ ২,১৮৯/- টাকা

কাজ : শিক্ষার্থীরা খামারের আয় ব্যয়ের ও লাভ অঙ্গিত হিসাব নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে লিখবে।

নতুন শব্দ: স্থায়ী খরচ, চলমান খরচ, লিটার

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পারিবারিক মিলি পুকুরে চাষ করা হয় কোন মাহ ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. মৃগেল | খ. গ্রাস কার্প |
| গ. সরপুঁটি | ঘ. পাঙ্গাশ |

২. দুধ পাস্তুরি করণের উদ্দেশ্য-

- i. জীবানু ধৰ্মস করা।
- ii. শুণাশুণ অক্ষুণ্ণ রাখা।
- iii. রাসায়নিক উপাদান নিয়ন্ত্রণ করা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

নিহন মিয়া তার বাড়ির সামনের ৬০ খতকের ১.৫ মিটার গভীরতার পুকুরে মাছের চাষ করেন। বর্ষার শেষে তিনি পুকুরে গিয়ে লক্ষ করেন তার পুকুরের মাছগুলো ঘাটে পুতে রাখা বাঁশের সাথে গা ঘষছে। তিনি এ বিষয়ে মৎস্য কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করলে মৎস্য কর্মকর্তা তাকে কিছু পরামর্শ দেন।

৩. নিহন মিয়ার পুকুরের মাছগুলো কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছিল?

ক. ক্ষত রোগ

খ. লেজ পচা রোগ

গ. মাছের উকুল রোগ

ঘ. লাল ফুটকি রোগ

৪. নিহন মিয়ার পুকুরের জন্য কমপক্ষে কত কেজি ডিপটারেজ প্রয়োজন?

ক. ১.৫ কেজি

খ. ১.৮ কেজি

গ. ২.৫ কেজি

ঘ. ২.৮ কেজি

সূজনশীল প্রশ্ন

১. আরিফ-হাসিফ দীর্ঘ দিন ধরে নিজ আঙিনায় দেশি জাতের মুরগি পালন করে আসছেন। এতে তেমন লাভবান না হওয়ায় তারা পোন্তি খামারের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে পারিবারিক পোন্তি খামার স্থাপন করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা সফলভাবে লাভ করেন। কিন্তু তারা লক্ষ করলেন তাদের খামারের বর্জ্যগুলো বাড়ির পরিবেশকে দূষিত করছে। এ অবস্থায় তারা খামারের বর্জ্যগুলো পরিয়ে ফসলের জমিতে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ক. পারিবারিক খামার কাকে বলে?

খ. বাণিজ্যিক খামারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. আরিফ-হাসিফের সফলতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আরিফ-হাসিফের উদ্যোগটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০১৭
শিক্ষাবর্ষ
৯-১০ কৃষিশিক্ষা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন – দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে
নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোল
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিশ্রম কখনও নিষ্ফল হয় না

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯২১ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য